ঢাকার ব্যবসা-বাণিজ্য ১৯২১-৭১

তত্ত্বাবধায়ক
ড. শরীফ উদ্দিন আহমেদ
সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
ও
প্রাক্তন পরিচালক
আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর

465967

গবেষক
চাঁদ সুলতানা কাওছার
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

GIFT

Dhaka University Library
465967

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

এম.ফিল. ডিগ্রি প্রাপ্তির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত অভিসন্দর্ভ
ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
২০১২ ইং

Dhaka University Institutional Repository

B
RB
650
KAD

465967
Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

অঙ্গীকারনামা

আমি চাঁদ সুলতানা কাওছার, এম.ফিল. রেজিঃ নং ৩৯/২০০৪-২০০৫, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, আমার এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য দাখিলকৃত 'ঢাকার ব্যবসা-বাণিজ্য ১৯২১-৭১' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি অথবা এর কোন অংশ কোন ডিগ্রি অথবা প্রকাশনার জন্য কোথাও দাখিল করিনি।

তারিখঃ ০৭.০৮.১২

গবেষক

চাঁদ সুলতানা কাওছার

চাঁদ সুলতানা কাওছার
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

465967

প্রত্যয়ন করছি যে, চাঁদ সুলতানা কাওছার আমার তত্ত্বাবধানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ থেকে এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য 'ঢাকার ব্যবসা-বাণিজ্য ১৯২১-৭১' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ প্রস্তুত করেছেন।

এই অভিসন্দর্ভটি তিনি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো ডিগ্রি/ডিপ্লোমার জন্য উপস্থাপন বা কোনো পুস্তক/জার্নালে প্রকাশ করেন নি। আমি এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটির চূড়ান্ত কপি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি এবং এম.ফিল. ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে দাখিল করার অনুমোদন করছি।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

তত্ত্বাবধায়ক

ড. শরীফ উদ্দিন আহমেদ
সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
ও
প্রাক্তন পরিচালক
আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর

তারিখ : ০১.০৮.৯২

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

কৃতজ্ঞতা

ভূমিকা ১

প্রথম অধ্যায়
ঢাকার ব্যবসা-বাণিজ্যের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট (মুঘল যুগ থেকে ১৯২১) ৮

দ্বিতীয় অধ্যায়
ঢাকার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কুটির শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রীর ব্যবসা-বাণিজ্য (১৯২১-৭১) ২৪

তৃতীয় অধ্যায়
ঢাকার শিল্প-কলকারখানা (১৯২১-৭১) ৯৯

চতুর্থ অধ্যায়
ঢাকার ব্যাংক ব্যবস্থা (১৯২১-৭১) ১৯৭

উপসংহার ২৫২

পরিশিষ্ট-১ ২৬১

পরিশিষ্ট-২ ২৭২

পরিশিষ্ট-৩ ২৭৪

গ্রন্থপঞ্জি ২৮০

ছবি ২৯২

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা

ঢাকার ব্যবসা-বাণিজ্য ১৯২১-৭১ শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য আমি (শিক্ষাবর্ষ : ২০০৪-২০০৫) ২০০৯ সালে গবেষণার কাজ শুরু করি।

আমার অভিসন্দর্ভের বিষয়টি নির্ধারণের জন্য আমাকে উৎসাহ ও সহযোগিতা করেছেন আমার তত্ত্বাবধায়ক শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. শরীফ উদ্দিন আহমেদ। বিষয়টির তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা কঠিন হবে জেনেও একমাত্র তাঁর সাহস ও অনুপ্রেরণায় আমি এ গবেষণা কর্মে নিয়োজিত হই। বর্তমান অভিসন্দর্ভটি সেই গবেষণার ফসল। আমার এই দীর্ঘ গবেষণা-কর্মে অফুরন্ত সময়, মূল্যবান পরামর্শ, প্রয়োজনীয় উপদেশ ও প্রবল উৎসাহ-সহ সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করে আমার শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক আমাকে অপরিমেয় ঋণে আবদ্ধ করেছেন। তাঁর কাছে আমার এ ঋণ অপরিশোধ্য।

আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক আহমেদ আব্দুল্লাহ জামাল ও শ্রদ্ধেয় শিক্ষক সহযোগী অধ্যাপক মো. গোলাম সাকলায়েন সাকী'র নিকট। তাঁরাই আমাকে ঢাকার উপর গবেষণা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। আমি আরো কৃতজ্ঞ শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক এ.এইচ আহমেদ কামাল-এর কাছে। তিনি আমাকে গবেষণা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য ও পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। এছাড়া আমি তারেক ওমর আলীর (পি.এইচ.ডি গবেষক, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়) কাছেও কৃতজ্ঞ। তিনি আমাকে গবেষণার কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতা ও উৎসাহ দিয়েছেন।

অভিসন্দর্ভটির পাণ্ডুলিপি থেকে কম্পিউটারে কম্পোজ করার জন্য আমি বাংলা একাডেমীর মোহাম্মদ মীর হোসেন-এর নিকট কৃতজ্ঞ। অভিসন্দর্ভের কিছু ছবি আমি নিজেই সংযোজিত করি এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ ছবি সংযোগ করার ব্যাপারে বাংলাদেশ লেদার টেকনোলজি কলেজের ছাত্র মহীউদ্দিন আলমগীর মুকুল সহযোগিতা করে। এজন্য আমি মুকুল এর কাছে কৃতজ্ঞ।

অভিসন্দর্ভের তথ্য সংগ্রহের জন্য আমি ঢাকার বিভিন্ন গ্রন্থাগারে পড়াশুনা করেছি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিসন্দর্ভ রচনায় বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস ও গ্রন্থাগার এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। এ গ্রন্থাগারগুলোর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর নিকট আমি কৃতজ্ঞ। এছাড়া বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ কলেজ অব লেদার টেকনোলজি গ্রন্থাগার এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স গ্রন্থাগার আমি ব্যবহার করেছি। এ সকল গ্রন্থাগারের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা সবসময় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। দুষ্প্রাপ্য দলিলপত্র ও বই পুস্তক ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে তাঁরা আমার গবেষণার কাজটি অনেকটাই সহজ করে দিয়েছেন। তাঁদের সহযোগিতা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি।

Dhaka University Institutional Repository

সবশেষে যাদের কাছে আমি সবচেয়ে বেশি ঋণী তারা আমার একান্ত আপনজন। আমার ছোট বোন ইসরাত জাহান, রওনক জাহান, ছোটভাই গোলাম কিবরিয়া। এই কঠিন কাজটি এগিয়ে নিতে তারা আমাকে উৎসাহ দিয়েছে। তবে যার সাহায্য সহযোগিতা না পেলে আমার গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করা কখনোই সম্পন্ন হতো না, তিনি হলেন আমার স্নেহময়ী মা জাহানারা খানম। যিনি দীর্ঘদিন ধরে ধৈর্যের সাথে আমার লেখাপড়া ও গবেষণা চালিয়ে যাবার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আমি আরো যার কাছে খুব বেশি কৃতজ্ঞ তিনি হলেন আমার বাবা মরহুম এম. এ কুদ্দুস। তিনি এ পৃথিবীতে না থাকলেও তাঁকে আমি সবসময় স্মরণ করি। কারণ তিনি আমাকে ভালো কিছু করার জন্য সাহস দিতেন। যে সাহস এবং উদ্দীপনা নিয়ে আমি এখনও চলছি।

চাঁদ সুলতানা কাওছার

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংক্ষেপ

ADBP—Agricultural Development Bank of Pakistan
NAB—National Archives of Bangladesh
DUL—Dhaka University Library
ABP—Agricultural Bank of Pakistan
ADFC—Agricultural Development Finance Corporation
EPIDC—East Pakistan Industrial Development Corporation
IDBP—Industrial Development Bank of Pakistan
IFC—International Finance Corporation
PIFCO—Pakistan Industrial Finance Corporation
PIDC—Pakistan Industrial Development Corporation
HBFC—House Building Finance Corporation
PICIC—Pakistan Industrial Credit and Investment Corporation
LC—Letter of Credit
US—United States
UK—United Kingdom
IDB—Islamic Development Bank (Jeddah)
IBRD—International Bank for Reconstruction and Development
EPIDC—East Pakistan Industrial Development Corporation
RDCCS—Rangpur District Consumers Co-operative Stores Ltd.

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির উপর তার সামগ্রিক সফলতা নির্ভর করে। যে দেশ যত বেশি অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ সে দেশ তত বেশি উন্নত। আর একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর নির্ভর করে। অর্থনৈতিক উন্নতিসহ একটি দেশ বা জাতির সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি সকল বিষয়ের উন্নতির মূলে রয়েছে উপযুক্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা।

পূর্ববাংলা যেহেতু ছিল নদীমাতৃক দেশ। তাই তার যোগাযোগের মাধ্যম ছিল নদীপথ। আর এই নদীপথেই ব্যবসা-বাণিজ্য হতো। ভৌগোলিকভাবে ঢাকার অবস্থান পূর্ববাংলার মাঝখানে। তাই চলাচলের সুবিধার্থে ঢাকার বাণিজ্য কেন্দ্রগুলো স্বভাবতই নদীর তীরে গড়ে ওঠে। ফলে দেখা যায় যে, পূর্ববাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এবং পূর্ব পাকিস্তানের বাইরে তথা ভারত ও বিভিন্ন দেশ থেকে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এবং (শঙ্খ, শিং) উৎপাদিত বিভিন্ন দ্রব্য নদীপথে ঢাকায় নিয়ে আসা হতো। পরবর্তীতে রেল লাইনের সম্প্রসারণ হলে রেলপথে নিয়ে আসা হতো।

১৮৮০-এর দশকে পূর্ববাংলার প্রধান শহর ঢাকাকে কেন্দ্র করে রেললাইন স্থাপন করা হয়।[১] আর রেলস্টেশনগুলি বিদ্যমান বাণিজ্য কেন্দ্র বা নদীবন্দরের আশেপাশেই প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে ঢাকার ব্যবসা-বাণিজ্য জল, স্থল ও রেলপথে সম্পন্ন হতো।

১৭১৩ সালে বাংলার রাজধানী স্থানান্তরিত হয় ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে। ঢাকা শাসিত হতে থাকে প্রথমে নায়েব নাজিম এবং তারপর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দ্বারা। মুঘল রাজধানী পরিবর্তনের পর ঢাকার ক্ষয় শুরু হয়েছিল এবং কোম্পানি আমলে তা হয়ে ওঠে দ্রুততর। শহর হয়ে ওঠে জঙ্গলময়, বায়ু হয় দূষিত, হ্রাস পায় জনসংখ্যা। লুপ্ত হয় ব্যবসা-বাণিজ্য। উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে আবার পুনরুজ্জীবনের চিহ্ন চোখে পড়ে। তখন বাংলার তথা পূর্ববঙ্গের প্রধান শহর হওয়া সত্ত্বেও ঢাকা ছিল নেহাতই মফস্বল শহর।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পর ঢাকা পরিণত হয় নতুন প্রদেশ পূর্ববঙ্গ ও আসামের রাজধানীতে। তখন শহরের কাঠামোতে কিছু পরিবর্তন হয়। বঙ্গভঙ্গ রদ হলে ঢাকা রাজধানীর মর্যাদা হারায় এবং শহর উন্নয়নও স্থগিত হয়ে পড়ে। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও মন্দাভাব দেখা দেয়। অপরদিকে স্বদেশি আন্দোলনের ছোঁয়া ঢাকার ব্যবসা বাণিজ্যেও লাগে। কেননা দেশীয় দ্রব্যের ব্যবহার শুরু হয় এবং বিদেশি দ্রব্যের প্রতিযোগী হিসেবে বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদন শুরু হয়। স্বদেশি আন্দোলনের প্রেরণাতেই বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ঢাকায় ট্যানারি শিল্প গড়ে ওঠে জনৈক শচীন্দ্রনাথ ঘোষের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়। এই চামড়া ট্যান করার ফলে জুতা প্রস্তুতের কারখানা চালু হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ঐ সব স্থানীয় শিল্প যথেষ্ট উৎসাহিত হয়। যদিও এই ট্যানারি বেশিদিন তথা ১৯১০ সাল পর্যন্ত টিকেছিল।[২] এভাবে দেখা যায় যে, ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর ঢাকা আবার পরিণত হয় পূর্ববাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানীতে। তখন শহরের খানিকটা শ্রীবৃদ্ধি

Dhaka University Institutional Repository

পায়। একইভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কিছু নতুন মাত্রা যোগ হয়; কিছুটা আধুনিকতার ছোঁয়া লাগে। তবে তা ছিল যৎসামান্য। তথাপি ট্যানারি শিল্প, ঔষধ শিল্প, কাচ শিল্প, ভারি ও মাঝারি শিল্প-কলকারখানা, নতুন নতুন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান (ব্যাংক) গড়ে ওঠে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতিতে এক নতুন মাত্রা যোগ করে। অর্থাৎ যা পূর্বে ছিল না। যদিও তা প্রয়োজনের তুলনায় সীমিত ছিল। অত্যাধুনিক ছিল না।

বর্তমান অভিসন্দর্ভে "ঢাকার ব্যবসা-বাণিজ্য"-এর উপর পর্যালোচনার জন্য যে সময়কাল নির্ধারণ করা হয়েছে তা হলো '১৯২১-৭১'। এই সময়কাল নির্ধারণে কিছুটা তাৎপর্য রয়েছে। ঢাকার ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে গবেষণা ও ইতিহাসভিত্তিক আলোচনা অত্যন্ত সীমিত, বিশেষ করে আলোচ্য সময়কাল সম্পর্কে নেই বললেই চলে। অথচ উপর্যুক্ত সময়ের মধ্যেই ঢাকায় আধুনিকভাবে বা নতুন নতুন ব্যবসা-বাণিজ্যের সূচনা হয়। বিশেষ করে বহুজাতিক কোম্পানির ব্যবসা প্রচলন হয়। এর ফলে পূর্ববাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানের জনজীবনে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন দেখা দেয় এবং ঢাকা শহর সত্যিকার অর্থে আধুনিক শহরে পরিণত হয়। তাহলেও এ সময়কালের ঢাকার অর্থনৈতিক ইতিহাস বিশদভাবে বিধৃত হয় নি। এই কারণেই ঢাকার ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রেক্ষাপট, ঐতিহ্যবাহী কুটির শিল্পের ব্যবসা, বিভিন্ন ধরনের ভারি ও মাঝারি শিল্প-কলকারখানার বিকাশ এবং ব্যাংক ব্যবসা নিয়ে বর্তমান অভিসন্দর্ভ রচনা করা হয়েছে। এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যেহেতু ঢাকা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী তাই সমস্ত দ্রব্য নিয়ে ঢাকায় ব্যবসা হতো। কিন্তু আমার গবেষণার সময়ের স্বল্পতার কারণে সববিষয় নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব নয়। তাই আমি উল্লেখযোগ্য কিছু বিষয়ে আলোচনা করেছি।

ঢাকার ইতিহাস নিয়ে বহু গবেষণামূলক কাজ ও অনেক গ্রন্থ লেখা হলেও ঢাকা শহরের ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য গবেষণামূলক কাজ হয় নি। অথচ আমার গবেষণাকালীন ঢাকায় নতুন নতুন ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্র আবির্ভূত হয়। বিশেষ করে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে। পাকিস্তান আমলে ঢাকায় আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার সূচনা হয় যা পূর্বে হয় নি। অথচ এবিষয়টি নিয়ে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য লেখা হয় নি।

ঢাকার ব্যবসার উপর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে দেলোয়ার হাসান সম্পাদিত *Commercial History of Dhaka*। এই গ্রন্থে বিভিন্ন লেখক ঢাকার ব্যবসা-বাণিজ্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু ঢাকার ব্যাংক ব্যবস্থা নিয়ে কোনো উল্লেখযোগ্য আলোচনা হয় নি। অথচ ব্যাংক হচ্ছে ব্যবসা-বাণিজ্যের একটি অপরিহার্য অংশ।

ঢাকা বিষয়ক আরেকটি গ্রন্থ হচ্ছে ড. শরীফ উদ্দিন আহমেদ রচিত *ঢাকা : ইতিহাস ও নগরজীবন ১৮৪০-১৯২১*। এটি একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ। গ্রন্থটিতে লেখক ঢাকার পতন ও উন্নয়ন দুটি দিকই অত্যন্ত বিশ্লেষণাত্মকভাবে আলোচনা করেছেন। উল্লেখ্য তিনি তার গ্রন্থের

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবসা-বাণিজ্যের অধ্যায়ে তার সময়ের ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর স্পষ্টভাবে আলোচনা করেছেন।

ঢাকা বিষয়ক আরেকটি গ্রন্থের কথা না বললেই নয় তাহলো ড. শরীফ উদ্দিন আহমেদ সম্পাদিত *Dhaka, Past Present Future*। ঢাকার বিভিন্ন বিষয় (নগরায়ন, যানবাহন, পরিবহন, চিত্র, বাণিজ্যিক এলাকা, প্রিন্টিং পাবলিশিং ইত্যাদি) নিয়ে আলোচনা করা হলেও ঢাকার ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর বিশেষ করে ১৯২১-৭১ সময়কালের উল্লেখযোগ্য আলোচনা হয় নি। এই গ্রন্থে রোজী মজীদ আহসান তার *Changing Pattern of Commercial Area of Dhaka* প্রবন্ধে ঢাকার বিভিন্ন যুগের বাণিজ্যিক এলাকা নিয়ে আলোচনা করেছেন। ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলের বাণিজ্যিক এলাকা নিয়ে স্বল্প আলোচনা করলেও বাংলাদেশ আমলের বাণিজ্যিক এলাকাগুলো নিয়ে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

ড. ইফতিখার-উল-আউয়াল সম্পাদিত *ঐতিহাসিক ঢাকা মহানগরী : বিবর্তন ও সম্ভাবনা* গ্রন্থেও ঢাকার ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা রয়েছে।

ঢাকার ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর গবেষণাকর্ম চালানো অত্যন্ত কঠিন জেনেও আমি এ নিয়ে গবেষণা করার ব্যাপারে আগ্রহী হয়েছিলাম। কেননা আলোচ্য সময়ের মধ্যে ঢাকার ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর পূর্বে কোনো গবেষণামূলক কাজ হয়নি। অথচ এই সময় আধুনিক উপায়ে ব্যবসা-বাণিজ্য বলতে যা বোঝাত তা গড়ে ওঠে। বিশেষ করে চামড়াকে কেন্দ্র করে ঢাকায় রমরমা ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে ওঠে এবং পূর্ববাংলার চামড়া যে অত্যন্ত উন্নতমানের তা প্রমাণিত হয়। এই সময় পূর্ব পাকিস্তান মূলত কাঁচামাল (চামড়া) রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে পরিচিত ছিল। অপরদিকে বিদেশি দ্রব্য (ওষুধ) আমদানিকারক হিসেবে পরিচিত ছিল। কেননা ১৯৪৯-৫০ সালে পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রেরণ করে চার কোটি রুপি মূল্যের দ্রব্য, আর পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসে এর ৫ গুণেরও অধিক মূল্যের দ্রব্য অর্থাৎ প্রায় ২৪ কোটি টাকার।[৩] এ সম্পর্কে অভিসন্দর্ভের বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে রয়েছে ঢাকার ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রেক্ষাপট। এ অধ্যায়ে আমার আলোচ্য সময়ের পূর্বের ঢাকার ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রকৃতি আলোচনা করা হয়েছে। মুঘল আমল, কোম্পানি আমল, ব্রিটিশ আমল তথা ১৯২১ সাল পর্যন্ত ঢাকার ব্যবসা-বাণিজ্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ ঐ সময় কী কী দ্রব্য নিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য হতো। কোন কোন দ্রব্যের ব্যবসার জন্য ঢাকা বিখ্যাত ছিল ইত্যাদি। মুঘল আমলে *মসলিন* কাপড়ের জন্য ঢাকা বিখ্যাত ছিল। এরপর আরো একটি কাপড় নিয়ে উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ব্যাপক ব্যবসা বাণিজ্য হতো। সেটি হলো *কাসিদা*। এই কাপড় বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হতো। এ অধ্যায়ে আরো আলোচনা করা হয়েছে ইংরেজ আগমনে এদেশীয় কুটির শিল্প—বিশেষ করে বস্ত্র শিল্প কিভাবে ধ্বংস হয় এবং স্বদেশি আন্দোলনের ফলে কিভাবে দেশীয় শিল্পের পুনরুত্থান ঘটে।

অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কুটির শিল্পজাত দ্রব্য নিয়ে ঢাকায় যেসব ব্যবসা হতো সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে ঢাকার ৫টি কুটির

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পজাত দ্রব্যকে বেছে নেয়া হয়েছে। কেননা ঢাকা শহরে কুটির শিল্পজাত অনেক দ্রব্য আছে যার সবগুলো নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব নয়। আমার আলোচ্য সময়ের শুরুতে চামড়া শিল্পের ব্যবসা-বাণিজ্য কেমন ছিল। দেশভাগের পরে চামড়া শিল্পের/ট্যানারি শিল্পের ব্যবসার সম্প্রসারণ, বিপণন, সমস্যা, চামড়ার মূল্য ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। পাকিস্তান আমলেই ঢাকায় প্রথম ট্যানারি গড়ে ওঠে। এবং চামড়া ট্যান করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। উল্লেখ্য বিশ্বে প্রথম ক্রোম ট্যানিং প্রক্রিয়া শুরু হয় ১৮৫৮ সালে। এক্ষেত্রে *D. Woodroffe* উল্লেখ করেন "The first experiments in chrome tanning were carried out in 1858 by Knapp, who described the tanning properties of iron, aluminium and chromium salt. He stated that chromium salts produced a greyish-blue leather which was too hard and tinny to be of commercial use."[৪]

আর ঢাকায় ওয়েট ব্লু প্রক্রিয়া শুরু হয় ১৯৬৫ সাল থেকে।[৫] যা chrome tanning-এর পূর্ব শর্ত। এছাড়া বিভিন্ন চামড়া ব্যবসায়ী বা আড়তদারদের নাম, ট্যানারির নাম ও মালিকের নাম উল্লেখ করা হয়। উল্লেখ্য ব্রিটিশ যুগে কাঁচা চামড়া কলকাতায় পাঠানো হতো এবং সেখান থেকে চামড়া ট্যানিং করে বা ফিনিসড চামড়া বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হতো। পাকিস্তান আমলেও কিছু কিছু ট্যানারিতে ফিনিসড চামড়া করা হলেও বেশিরভাগ ট্যানারিই আধা পাকা তথা ওয়েট ব্লু পর্যায় পর্যন্ত করে রোদে শুকিয়ে করাচিতে পাঠাত। এ অধ্যায়ে আমি সরকারি নথিপত্র ছাড়াও বিভিন্ন চামড়া ব্যবসায়ীর ও ট্যানারি মালিকের সাক্ষাৎকার নিয়েছি। এক্ষেত্রে আমাকে বাংলাদেশ কলেজ অব লেদার টেকনোলজির গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে হয়েছে। এখান থেকেও আমি অনেক মূল্যবান তথ্য পেয়েছি। এছাড়া বাংলাদেশ টেনার্স এসোসিয়েশনের সহায়তা নিতে হয়েছে।

পূর্ববাংলার মানুষ অতীতকাল থেকেই ধাতব পদার্থের গৃহসরঞ্জামাদি ব্যবহার করতো। বিশেষ করে কাঁসা ও পিতলের। ফলে ঢাকাসহ পূর্ববাংলার অনেক জায়গায় এ শিল্পের কারখানা গড়ে ওঠে। এ শিল্পের কাঁচামাল কিভাবে সংগ্রহ করা হতো, কী কী ধরনের জিনিস তৈরি করা হতো, ঢাকার কোন কোন জায়গা কাঁসা পিতলের জন্য বিখ্যাত ছিল, পরবর্তীতে এই শিল্পের সম্প্রসারিত না হওয়ার কারণ, এই শিল্পের সাথে যারা জড়িত ছিল তাদের এসোসিয়েশন ছিল কিনা ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। একইভাবে বোতাম ও শঙ্খ শিল্প সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। বোতাম শিল্পের কাঁচামাল যেসব জায়গা থেকে সংগ্রহ করা হতো বা আমদানি করা হতো, কোন কোন দ্রব্যের বোতাম এবং এগুলো কোন কোন দেশে রপ্তানি করা হতো সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই সম্পর্কে তৎকালীন সময়ের ইতিহাসভিত্তিক জরিপ, বই ও সরকারি বিবরণ থেকে বোতাম ব্যবসার স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। বোতাম ব্যবসাকে কেন্দ্র করে ঢাকায় যে রমরমা ব্যবসা হতো তা সরকারি দলিল দস্তাবেজে ও অন্যান্য উৎসে লক্ষ্য করা যায়। শিংয়ের বোতামের অবনতির কারণও এ অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়ে ঢাকায় যেসব মাঝারি ও ভারি শিল্প গড়ে উঠেছিল, সেসব শিল্পকারখানায় উৎপাদিত দ্রব্য নিয়ে ঢাকায় যে ব্যবসা হতো তা তুলে ধরা হয়েছে। দেশভাগের আগে ঢাকায় আধুনিক শিল্পকারখানা বলতে কিছু ছিল না। বেশিরভাগ ছিল কুটির শিল্প পর্যায়ের। বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে ঢাকায় আধুনিক বস্ত্র মিল গড়ে ওঠে। যা এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। তবে বস্ত্র কারখানা গড়ে উঠলেও ব্রিটিশ ও পরবর্তী যুগ তথা পাকিস্তান আমলে বিপুল পরিমাণে সুতা ও কাপড় আমদানি করা হতো। তখন ঢাকার বাজারে দেশি কাপড়ের তুলনায় আমদানিকৃত বিদেশি কাপড় বেশি বিক্রি হতো। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এবং বিভিন্ন পরিসংখ্যান দেয়া হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য শিল্প যেমন— ফার্মাসিউটিকল, সাবান, দিয়াশলাই, লোহা, তেল, চালের মিল ইত্যাদি বিভিন্ন শিল্প সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া ঢাকায় আলোচ্য সময়ের শুরুতে/ ব্রিটিশ যুগে কেন শিল্পপতি ছিল না ও পরবর্তীতে কেন হয় নি—সে বিষয়টি অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে এ বিষয়ে আমি অবিভক্ত বাংলার আলোকে ঢাকায় কেন শিল্পপতি শ্রেণি গড়ে ওঠে নি সে সম্পর্কে আলোচনা করেছি। কেননা উভয় বাংলায় একই প্রেক্ষাপটে শিল্পপতি শ্রেণি গড়ে ওঠেনি। এ অধ্যায় সম্পর্কে বেশিরভাগ তথ্য সরকারি দলিল-দস্তাবেজ, সরকারি কার্যবিবরণীতে উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়া বিভিন্ন শিল্পের পরিসংখ্যান দেয়া হয়েছে। এসব পরিসংখ্যানে ঐ শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা, মূলধনের পরিমাণ, উৎপাদনের পরিমাণ, শ্রমিক সংখ্যা, মজুরি ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে।

এ অধ্যায় বর্ণনা করার সময় আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থেরও সাহায্য নেয়া হয়েছে। এ অধ্যায়ে ঢাকায় আধুনিক শিল্পকারখানা গড়ে ওঠার ফলে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিকক্ষেত্রে কী ধরনের প্রভাব ফেলে সে সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় ঢাকার ব্যাংক ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আমার আলোচ্য সময়ের শুরুতে ঢাকায় তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য ব্যাংক ছিল না। বেশিরভাগ ব্যাংক কলকাতায় গড়ে উঠেছিল। ফলে সবকিছু কলকাতা থেকে নিয়ন্ত্রিত হতো। আবার যে কটি ব্যাংক ছিল তা কলকাতার ব্যাংকের শাখা অফিস হিসেবে কার্যকর ছিল। যেমন— হাবিব ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ছিল বোম্বে। সেখান থেকে শাখা অফিসের মাধ্যমে ব্যাংক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হতো। আবার ভারতীয় ব্যাংক ছাড়াও কিছু বিদেশি ব্যাংক ছিল। তবে এসব ব্যাংক সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণে তথ্য পাওয়া যায় নি। ১৯৪৭ সালের পরেও পূর্ব পাকিস্তানভিত্তিক কোনো ব্যাংক গড়ে ওঠে নি। পাকিস্তান আমলের মাঝামাঝি সময়ে বাঙালি মালিকানাধীন ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক (১৯৫৯) প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে এটি পুরোপুরি বাঙালি মালিকানাধীন ছিল না। এটি পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম তফসিলি ব্যাংক। সম্পূর্ণ বাঙালি মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত হয় ইস্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশন (১৯৬৫, ১৯ জানুয়ারি)। দুটি বাঙালি মালিকানাধীন ব্যাংক ছাড়া বেশির ভাগই পাকিস্তানি মালিকানাধীন। এসব ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় পশ্চিম পাকিস্তান বা করাচিতে অবস্থিত ছিল। সেখান থেকে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের অধীনে শাখা অফিসের মাধ্যমে ব্যাংক ব্যবসা পরিচালিত হতো। পাকিস্তান আমলেও

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালিরা ব্যাংক ব্যবসায় কেন অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে নি, ব্যাংকের বিভিন্ন পরিসংখ্যান, ব্যাংকের শাখা ঢাকার কোথায় কোথায় অবস্থিত চিহ্নিতকরণ, আমানত, মূলধনের পরিমাণ, ঢাকার ব্যবসায় এসব ব্যাংক কতটুকু ভূমিকা রাখত ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া বাণিজ্যিক ব্যাংক ছাড়াও কিছু আর্থিক প্রতিষ্ঠান ছিল যার মাধ্যমে এই অঞ্চলের জনগণকে আর্থিক সহায়তা দেয়া হতো। কী পরিমাণ দেয়া হতো, কতটুকু এই অঞ্চলের জন্য বরাদ্দ ছিল তা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারি প্রতিবেদন, কার্যবিবরণী, পরিসংখ্যান বিভাগ, জেলা গেজেটিয়ার থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে। এছাড়া ব্যাংক সম্পর্কিত বিভিন্ন গ্রন্থের সহায়তা নেয়া হয়েছে।

সবশেষে গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল এবং সুপারিশমালা উপসংহার শিরোনামে উপস্থাপন করা হয়েছে। বিভিন্ন অধ্যায়ে সন্নিবেশিত তথ্যের উপর ঢাকার সামাজিক, অর্থনৈতিকক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তনে ঢাকার ব্যবসা-বাণিজ্যের তাৎপর্য তুলে ধরা হয়েছে।

অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণভাবেই সমসাময়িককালের মূল দলিল দস্তাবেজের উপর ভিত্তি করে পুনর্গঠন করা হয়েছে। যেহেতু নির্দিষ্ট করে ঢাকার ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য দলিল দস্তাবেজ আলোচ্য সময়ের শুরুর দিকে পাওয়া যায় নি, তাই এ বিষয়ের উপর তথ্য বিভিন্ন ধরনের সরকারি-বেসরকারি উৎস থেকে সংগ্রহ করতে হয়েছে। এগুলির মধ্যে বিভিন্ন দপ্তরের অপ্রকাশিত সরকারি কার্যবিবরণী প্রতিবেদন, সংবাদপত্র ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গবেষণাকালে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও বহু গুরুত্বপূর্ণ দলিল দস্তাবেজ পাওয়া যায় নি। কেননা তখনকার ব্যবসায়ীরা ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত নথিপত্র সংরক্ষণ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করত না।

অভিসন্দর্ভের তথ্য সংগ্রহের জন্য আমাকে ঢাকা শহরের বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয়েছে। নানা জায়গা থেকে তথ্য একত্র করে যতদূর সম্ভব আমার গবেষণা পূর্ণাঙ্গ করার চেষ্টা করেছি। বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস-এ ঢাকার ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্য, ঢাকায় যেসব জিনিস বেচাকেনা-রপ্তানি-আমদানি হয়েছে সে সম্পর্কিত অনেক তথ্য আছে। যা আমার অভিসন্দর্ভ রচনায় ব্যাপকভাবে সাহায্য করেছে।

বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস-এ সংরক্ষিত সমকালীন সরকারি বিভিন্ন প্রতিবেদন, কার্যবিবরণী (proceedings), প্রকাশিত প্রতিবেদন, বেঙ্গল এ্যাডমিনিস্ট্রেশন রিপোর্ট ও ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত নানা তথ্য ও উৎস থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। উপর্যুক্ত সরকারি ও বেসরকারি উৎস ছাড়াও পূর্ববাংলা তথা ঢাকা নিয়ে ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় যে বিশাল সাহিত্য কর্ম রয়েছে তাতেও ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত বহু তথ্য পাওয়া যায়। যা সরকারি নথিপত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সম্পূরক হিসেবে অবদান রেখেছে। এছাড়া ঢাকার একটি অন্যতম বাণিজ্যিক সংগঠন, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এই সংগঠনের গ্রন্থাগার থেকেও অনেক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। বাংলাদেশ কলেজ অব লেদার টেকনোলোজির গ্রন্থাগার থেকেও ঢাকার চামড়া ব্যবসা সংক্রান্ত অনেক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার থেকে পুরানো আত্মকাহিনী, মাসিক পত্রিকা, জেলাভিত্তিক

Dhaka University Institutional Repository

বই ইত্যাদি থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত অনেক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার, এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগার থেকেও বিভিন্ন ধরনের উপাদান সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া পুরানো ঢাকার অনেকের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ঢাকা শহরের ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর আলাদা করে কোনো তথ্য পাওয়া যায় নি। সমগ্র পূর্ববাংলা পরবর্তীতে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলা অনুসারে তথ্য দেয়া হয়েছে।

আমার গবেষণার সময়কাল অবিভক্ত বাংলা ছিল। তাই প্রাসঙ্গিক কারণে কোনো কোনো বিষয় দুই বাংলার প্রেক্ষাপটে আলোচনা করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভটি যথাসাধ্যভাবে বস্তুনিষ্ঠ করার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। অভিসন্দর্ভে যে সকল রেফারেন্স দেয়া হয়েছে সেগুলির প্রাপ্তি স্থান যথাযথভাবে উল্লেখ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

এই অভিসন্দর্ভে যেসকল পরিসংখ্যান ব্যবহার করা হয়েছে সে সম্পর্কেও সামান্য মন্তব্য রাখা প্রয়োজন। বিভিন্ন উৎস থেকে যে সকল পরিসংখ্যান ব্যবহৃত তা থেকে যে ধরনের তথ্য পাওয়া যায় তা অন্যকোনো সূত্র থেকে অনির্ভরশীল বিবেচিত প্রেক্ষিতে এই পরিসংখ্যানগুলি গ্রহণ করা যায়। তবে এরকম মন্তব্য রাখা যেতে পারে যে, পরিসংখ্যানগুলি শতভাগ নির্ভুল হবে তা বলা যাবে না। ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে আমাদের দেশের প্রচলিত মুদ্রাকে রুপি বলা হতো এবং সমকালীন সব দলিলপত্র ও পরিসংখ্যানগুলিতে মুদ্রা রুপি নামে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাই অভিসন্দর্ভে রুপি ব্যবহার করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে প্রমিত বাংলা বানান নীতি অনুসারে বাংলা একাডেমীর বাংলা বানান অভিধানকে অনুসরণ করা হয়েছে।

তথ্যনির্দেশ

১. দিনাক সোহানী কবির, 'পূর্ববাংলার রেলওয়ের আগমন এবং এই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক জীবনের উপর-এর প্রভাব ১৮৬২-১৯৪৭' (পি.এইচ. ডি অভিসন্দর্ভ), পৃ. ভূমিকা ১।

২. ড. শেখ মাকসুদ আলী (সম্পাদিত), *বাংলাদেশ জেলা গেজিটিয়ার, বৃহত্তর ঢাকা*, ১৯৯৩, পৃ. ৪৪৭।

৩. ইফতিখার-উল-আউয়াল (সম্পাদিত), *ঐতিহাসিক ঢাকা মহানগরী : বিবর্তন ও সম্ভাবনা*, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ২০০৩, পৃ. ২৮২।

৪. D. Woodroffe, *Hand Book on Chrome Tanning, Quality Books*, 1956, p. IX.

৫. M. M. Huq and K. M. Nabiul Islam—*Choice of Technology, Leather Manufacturing* in Bangladesh, University Press Limited, 1990, pp. 17-18

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ঢাকার ব্যবসা-বাণিজ্যের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট
(মুঘল যুগ থেকে ১৯২১)

যেকোনো জাতির ব্যবসা-বাণিজ্য তথা অর্থনীতির বিবেচ্য বিষয় মূলত ইতিহাসের উপর নির্ভরশীল।[১] সে কারণেই ঢাকার ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করতে হলে তার ইতিহাস জানা দরকার। তাই ১৬১০ সালে ঢাকা প্রাদেশিক রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি পেলে তার জীবন ধারার কাল-বিন্যাসকে অবলম্বন করে ঢাকার ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মুঘল আমল থেকে ঢাকা ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ; সেই সাথে এটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ শিল্প নগরী।[২] নদীপথে চারদিকের সকল অঞ্চলের সাথে সংযুক্ত একটি কেন্দ্র হিসেবে ঢাকার অবস্থান সমগ্র দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য অত্যন্ত সুবিধাজনক। এই শহরের প্রসার এবং এর ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি—শহরে জনগণের চাহিদা পূরণের জন্য বিভিন্ন দ্রব্য সরবরাহ এবং বাণিজ্যিক এলাকা ও হাট-বাজারের উন্নয়ন অপরিহার্য করে তোলে। যে কোনো শহরের প্রসারের কারণে শহরে কারিগর, পণ্য প্রস্তুতকারক, শিল্পী ও বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেণির বসতি স্থাপন জরুরি হয়ে পড়ে—যাতে তারা এখানে অবস্থান করে কাঁচামাল ক্রয় এবং তৈরি, মালামাল বিক্রি করতে পারে। ঢাকা মুঘল আমলে বাংলার রাজধানী এবং সামরিক ও বেসামরিক সদর দফতরে যখন পরিণত হয়, তখন বণিক ও ব্যবসায়ীগণ সরকার থেকে পরোয়ানা ও লাইসেন্স গ্রহণ করার জন্য এবং কর সুবিধা ও অন্যান্য বাণিজ্যিক সুযোগ লাভ করার জন্য অথবা শুল্ক বিভাগের কর্মকর্তাদের শোষণ এবং অন্যান্য অবিচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করার জন্য এখানে আগমন করত। কিন্তু বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে ঢাকার বিকাশের পিছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে মুঘল সরকার কর্তৃক ঢাকায় শাহ বন্দর প্রতিষ্ঠা। এই বন্দর থেকে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে শুল্ক আদায় করে এবং ব্যবসায়ীদের জন্য পরোয়ানা ইস্যু করে সকল ব্যবসা-বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ করা হতো। এই বন্দরের মাধ্যমে সকল ব্যবসায়ী বাংলার পূর্বাঞ্চলীয় জেলাসমূহের সঙ্গে বাণিজ্য পরিচালনা করত।

ঢাকা শহর মূলত মুঘল আমল থেকেই দ্রুত সম্প্রসারিত হয়। এই সময় (১৬১০) বিদেশি বণিকদের আগমন ঘটে। তখন পর্যন্ত পূর্ববাংলার বাণিজ্যিক কেন্দ্র ছিল সোনারগাঁও। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ নাগাদ যেসব পরিব্রাজক বাংলায় এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ইবনে বতুতা, চীনা পরিব্রাজকগণ, পর্তুগিজ লেখক বারবোসা, ইটালীয় লেখক ভার্থেমা এবং এই শতাব্দীর সর্বশেষ পরিব্রাজক রলফ ফিচ। তারা সকলেই সোনারগাঁয়ের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির প্রশংসা করেন। কিন্তু ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরের সাথে সাথে ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবসায়ী ও বণিক শ্রেণির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে শুরু করে। ড. আব্দুল করিম উল্লেখ করেন যে, এই সময় ঢাকার গুরুত্ব এতই বৃদ্ধি পায় যে, শুধু ব্যবসায়ী ও ব্যাংকারগণই ঢাকায় আসেন নি বরং সংগঠিত ইউরোপীয় কোম্পানিসমূহও ঢাকায় কারখানা স্থাপন করেন এবং এই রাজধানীর সাথে খুবই জমজমাট ও লাভজনক ব্যবসা চালিয়ে যায়।[৩]

সেবাস্টিয়ান ম্যানরিক (পর্তুগিজ ধর্মযাজক) ১৬৪০ সালে ঢাকায় আসেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, ঢাকা শহরে বিভিন্ন পণ্যের ব্যাপক ব্যবসা ও বাণিজ্যের সুবিধা থাকার কারণে বহু বিচিত্র জাতির ব্যবসায়ীরা এখানে এসে ভিড় জমাত। এই সকল লোকের মধ্যে খত্রী ও দিনমজুরের কথা উল্লেখ করেন। খত্রীদের সম্পর্কে তিনি বলেন, তাদের কাছে টাকায় ভর্তি থলি থাকত এবং তারা টাকা গণনার পরিবর্তে ওজন করত। এ বর্ণনা থেকে মনে করা হয় যে, খত্রীরা ব্যাংকার ছিলেন। ম্যানরিক আরো বলেন, ঢাকাই মসলিন খোরাসানের মতো দূরবর্তী স্থানেও রপ্তানি হতো। এছাড়া তিনি ঢাকা শহরের বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্যও উল্লেখ করেছেন—একটি মুরগির দাম ছিল এক চায়তাল, ১৫টি পাখির দাম ছিল ৮ চায়তাল, একটি ছাগলের দাম ছিল ২ টংকা, ৩০ গজ সুন্দর লম্বা কাপড়ের দাম ছিল মাত্র ২ টংকা ৩২ চায়তাল, অপরিশোধিত চিনির দাম ছিল প্রতিমণ ১৬ চায়তাল এবং একজন ক্রীতদাসের দাম ছিল ৮ টংকা।

ইংরেজ কোম্পানির দলিলপত্র থেকেও জানা যায় যে, ঢাকা শহরে মূর, মুঘল, পাঠান, তুরানি প্রভৃতি বহু বণিকগোষ্ঠীরা আসে। এছাড়া আর্মেনিয়ার বণিকগণও ঢাকায় আসে এবং তারা রপ্তানি বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। এসব বণিক সংগঠিত ছিল না, তারা পৃথক পৃথক ব্যক্তি ব্যবসায়ী হিসেবে আসে। টেলর উল্লেখ করেন যে, আর্মেনিয়ানদের অনেকে বস্ত্র, লবণ ও সুপারির ব্যাপক ব্যবসা চালিয়ে জমিদারির মালিক হয়েছিলেন।[৪]

সপ্তদশ শতাব্দীর কোনো এক সময়ে পর্তুগিজরা ঢাকায় একটি বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। কিন্তু নিপীড়নমূলক স্বভাবের কারণে এবং ওলন্দাজ ও ইংরেজদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তারা টিকে থাকতে না পারায় ঢাকায় পর্তুগিজদের বাণিজ্য প্রসার লাভ করে নি।

অপরদিকে ওলন্দাজরা ১৬৬৩ সালে ঢাকায় কুঠি স্থাপন করে। তাদের মূলকুঠি ছিল তেজগাঁওতে। কিন্তু ড. করিম উল্লেখ করেছেন, পরবর্তীকালে তারা বুড়িগঙ্গার তীরে (আজকের সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতাল এলাকায়) আরও একটি কুঠি স্থাপন করে। ঢাকায় তাদের ব্যবসা খুব ব্যাপক ছিল না। থমাস বৌরীর মতে, ঢাকায় ওলন্দাজদের ও ইংরেজদের বিনিয়োগকৃত মূলধন ছিল খুবই সামান্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ভারতে ওলন্দাজদের বাণিজ্যের অবনতি ঘটে। যার ফলে ঢাকায় তাদের কর্মকাণ্ডে ভাটা পড়ে। ওলন্দাজরা দেশি প্রতিনিধিদের মাধ্যমে ঢাকায় পণ্য সংগ্রহ করত। ১৭৪৭ সালে এক হিসাবে দেখা যায় যে, ইংরেজ ও ফরাসি কোম্পানির তুলনায় ওলন্দাজদের রপ্তানিকৃত পণ্যসামগ্রীর পরিমাণ ছিল খুবই নগণ্য। ১৭৮১ সালে ঢাকাস্থ ওলন্দাজ সম্পত্তি ইংরেজদের কাছে সমর্পিত হয় এবং ১৮৩৪ সালে তা ইংরেজদের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করে।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষেরদিকে ফরাসিরা ঢাকায় আগমন করে। ফরাসিরা তেজগাঁও এবং বুড়িগঙ্গার তীরে কুঠি স্থাপন করে। পরবর্তীতে তাদের বাণিজ্যে গতি সঞ্চারিত হয় এবং তারা শুধু লাভজনক বাণিজ্যই করে নি বরং ইংরেজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানির সাথে প্রতিযোগিতা করতেও সক্ষম হয়। ১৭৪৭ সালের এক হিসেবে দেখা যায় যে, ফরাসি কোম্পানি ও ফরাসি সাধারণ ব্যবসায়ীরা ঢাকা থেকে তিন লাখ টাকার বস্ত্রসামগ্রী রপ্তানি করে। এই কোম্পানি ঢাকা শহরের পূর্বসীমানায় ফরাশগঞ্জে বহু সম্পদও অর্জন করে। পলাশী যুদ্ধের পরে ঢাকায় ফরাসি বাণিজ্যের পতন ঘনিয়ে আসে এবং ১৭৭৪ সালে ফরাসি কুঠি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়।

১৬৬৯ সালে স্থাপিত হয় ইংরেজ কুঠি এবং তা ১৬৯০ সাল পর্যন্ত চালু ছিল। একজন চিফ বা প্রধানের নেতৃত্বে এক অথবা দুইজন প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত একটি পরিষদ তাদের বাণিজ্য পরিচালনার জন্য ঢাকায় বসবাস করত। ১৬৯০ সালে যখন বাংলায় ইংরেজগণ জব চার্নকের নেতৃত্বে মুঘল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তখনই ঢাকা কুঠি বন্ধ হয়ে যায়। ১৭২৩ সালে মুর্শিদকুলি খানের সময়ে এই কুঠি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। তখন থেকে ইংরেজ কুঠি ঢাকার বাণিজ্যের সঙ্গে নিয়োজিত ছিল। ইংরেজরা এই প্রদেশের প্রভুতে পরিণত হওয়া পর্যন্ত এই বাণিজ্য অব্যাহত ছিল।

সুতরাং দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, বিদেশি বণিকগণ ঢাকা শহরের ব্যবসা-বাণিজ্যে বিশেষত সুতিবস্ত্রের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। কিন্তু ঢাকার বিকাশমান ব্যবসা-বাণিজ্যে স্থানীয় জনসাধারণ কতটুকু অংশগ্রহণ করেছিল তা জানা দরকার। দেশের বাণিজ্যে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে এমন কিছু লোকের নাম পাওয়া যায়। ড. আব্দুল করিম এসব ব্যবসায়ীকে দুই শ্রেণিতে ভাগ করেছেন (১) ব্যাংকার বা ব্যাংকিং ব্যবসায়ী শ্রেণি, (২) কোম্পানির পক্ষে ব্যবসারত ব্যবসায়ী শ্রেণি, যারা বিভিন্নভাবে কোম্পানির সেবা করত এবং এজন্য তাদের অগ্রিম অর্থ প্রদান করা হতো।[৫] এই সময় নিম্নোক্ত ব্যাংকার ও ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান ঢাকায় ব্যবসায়ে নিয়োজিত ছিল —

১. শেঠ মাহতাব রায়
২. শেঠ স্বরূপচাঁদ
৩. শিব রায় নয়নচাঁদ
৪. জগৎ শেঠের গোমস্তা
৫. ধনরাম
৬. খোশাল চাঁদ মতিচাঁদ
৭. আলমচাঁদ নিমচাঁদ
৮. অনুপচাঁদ কিষেণ চাঁদ বা কৃষ্ণ চন্দ্র
৯. বিঙ্কর দাস
১০. মতিরাম সেন
১১. শান্তিরাম

Dhaka University Institutional Repository

১২. বলরাম
১৩. হরি কিষেণ বা হরিকৃষ্ণ
১৪. আনন্দ রাম।

উল্লিখিত নাম থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, তালিকাভুক্ত ব্যক্তিদের অধিকাংশই রাজপুতানা বা বাংলার বাইরে থেকে ব্যবসা পরিচালনার জন্য আসে।

সাধারণ রীতি ছিল দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহের জন্য স্থানীয় ব্যবসায়ীদের নিয়োজিত করা। এসব ব্যবসায়ীকে তাদের সংগৃহীত দ্রব্যের ৭৫% পরিমাণ অর্থ অগ্রিম প্রদান করা হতো। দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ করে কোম্পানির কাছে সরবরাহ করার পর অবশিষ্ট টাকা পরিশোধ করা হতো। অগ্রিম প্রদানকে দাদন বলা হতো এবং অগ্রিম গ্রহণকারী দাদনি ব্যবসায়ী / পত্তনদার বলে পরিচিত হতো। ঢাকাতেও একই রীতি প্রচলিত ছিল।

উদাহরণস্বরূপ ১৭৩৬ সালে নিম্নোক্ত ব্যবসায়ীগণ পণ্য সামগ্রীর জন্য চুক্তিবদ্ধ হয় :

ক্রমিক নং	নাম	চুক্তিবদ্ধ টাকার পরিমাণ	অগ্রিম হিসেবে গৃহীত টাকার পরিমাণ
১.	রাম নারায়ণ দালাল	২১,০০৭-৪-০	১৮,৯০৬-৮-০
২.	নেটু দালাল	৮,৭২৫-০-০	৭,৮২৭-৮-০
৩.	সোনামণি দালাল	৮,০১০-৪-০	৭,১৮৬-১২-০
৪.	মুক্তাগোলাব পাইকার	১৩,২৫৭-৪-০	১১,৮৮১-৮-০
৫.	হাফিজুল্লাহ পাইকার	১,৯১৫-০-০	১,৭৩৮-৮-০
৬.	বিষ্ণুদাস পাইকার	১,৩২৮-০-০	১,২০২-১২-০
৭.	জয়কৃষ্ণ পাইকার	১০,০৫৭-৪-০	১,০২৬-৮-০
৮.	চনুল নান্দেজাম	১,৩১১-০-০	১,১৮৫-৯-০

উৎস : ড. আব্দুল করিম, *মুঘল রাজধানী ঢাকা*, পৃ. ৬১।

উপর্যুক্ত ব্যবসায়ীগণ প্রায় সকলেই বাঙালি বংশোদ্ভূত ছিল। ড. করিম উল্লেখ করেছেন যে, তারা সকলে বাঙালি হলেও দেশের বাণিজ্যে বিদেশি কোম্পানি অথবা বহিরাগত মুসলমান অথবা আর্মেনিয় ব্যবসায়ীদের চাইতে স্থানীয় জনগণের ভূমিকা ছিল নগণ্য।

দেশের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ঢাকা দ্বৈত ভূমিকা পালন করত। এ পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা ছিল (ক) পণ্য উৎপাদনকেন্দ্র ও বিপণনকেন্দ্র হিসেবে বিকাশমান একটি শহর (খ) দেশি ও বিদেশি দ্রব্যের আমদানি-রপ্তানিস্থল হিসেবে গড়ে ওঠা একটি বন্দর। ঢাকা বন্দর দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত পণ্য ও ঢাকায় উৎপাদিত পণ্য গ্রহণ করে বহির্বিশ্বে এবং মুঘল সাম্রাজ্যের অন্যান্য প্রদেশে রপ্তানির জন্য উপকূলীয় বন্দর বা অভ্যন্তরীণ বন্দরে প্রেরণ

Dhaka University Institutional Repository

করত। একইভাবে ঢাকা বন্দর বিদেশ থেকে ঢাকায় আমদানিকৃত পণ্য গ্রহণ করে দেশের অভ্যন্তরে প্রেরণ করত।

এ সময় সোনারগাঁও সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উৎপাদন ও দ্রব্য তৈরির কেন্দ্র ছিল। ঢাকা শহর ও তার আশেপাশের অঞ্চলে কিছুসংখ্যক শিল্পী ও কারিগর বসবাস করত। ঢাকা শহরের বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদন থেকে এলাকার পরিচয় স্পষ্টভাবে ছিল। যা মুঘল আমল থেকে আলোচ্য সময় পর্যন্ত ছিল এবং এখনও তা অব্যাহত আছে। এ পর্যায়ে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় যে, তাঁতিবাজার ও জুগিনগর ছিল তাঁতিদের, কামারনগর ও বানিয়ানগর ছিল স্বর্ণকার, রৌপ্যকার ও কামারদের, পাটুয়াটুলী ছিল চিত্রশিল্পীদের, সুত্রাপুর ছিল ছুতার মিস্ত্রিদের, কামারটুলী ছিল কামারদের এবং শাঁখারিবাজার ছিল শাঁখারিদের (শঙ্খের কাজ) এলাকা। এসকল এলাকার শিল্পীকুশলী ও পেশাজীবী শ্রেণির লোকদের অস্তিত্ব প্রমাণ করে যে, তারা শহরে দলবদ্ধভাবে বসতি স্থাপন করে এবং তাদের তৈরি সামগ্রী বিদেশে রপ্তানি করার জন্য সংগ্রহ করা হতো। যাতে স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করা যায়। বন্দর হিসেবে ঢাকাকে বিভিন্ন ধরনের প্রচুর দ্রব্য সামগ্রী দেশের অভ্যন্তরে ও দূরবর্তী দেশে প্রেরণ ও রপ্তানি করতে হতো। বিদেশ থেকে আমদানিকৃত জিনিসপত্রের সঙ্গে দেশীয় উৎপাদিত জিনিসপত্রের তুলনা করা হতো। সুতরাং অধিক বাজার ও গঞ্জের নাম হতে প্রতীয়মান হয় যে, এগুলো স্থানীয়ভাবে তৈরি সামগ্রী এবং বিদেশ থেকে আমদানিকৃত দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয়ের বাজার ছিল।

মুঘল ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আমলে ঢাকার ব্যবসা-বাণিজ্যের (আমদানি ও রপ্তানি) মূল সুতিবস্ত্র পণ্য হলেও অন্যান্য পণ্য সামগ্রী ছিল। সেগুলো হলো— চাটি, (এক ধরনের গৃহনির্মিত প্রদীপ), চটের থলে, কালোজিরার দানা, তৈল, হাতির দাঁত, সুপারি, পান, তামাক, মাদুর, সুতা, তুলা, চাল, খেসারি, মুগ, মসুর, কলাই, বুট, মটর, সরিষা, বীজ, পিয়াজ, চিনি, গুড়, ঘি, লবণ, আদা, মরিচ, চিড়া, নারিকেল, মাছ, কাঠ, নৌকা, কাঠের আসবাবপত্র, কালি, কাগজ, মাটির পাত্র, সোনা-রূপা, লোহা ও তামার তৈরি জিনিসপত্র, মধু, পাথর, বাঁশ, ঝুড়ি, আফিম, শাকসব্জি, নলখাগড়া ও ফল।

ড. আব্দুল করিম পণ্যসামগ্রীর তালিকা পরীক্ষা করে এগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন— (১) বিদেশ থেকে আমদানিকৃত পণ্য; (২) দেশে উৎপাদিত পণ্য; (৩) দেশের নদী, বন ও কৃষিজমি থেকে উৎপাদিত পণ্য।

বিদেশি কোম্পানিসমূহের আমদানিকৃত দ্রব্য প্রধানত লোহা, তামা, পিতল, টিন ইত্যাদি ধাতব পদার্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এগুলো আমদানির পরিমাণ ঢাকা থেকে রপ্তানিকৃত দ্রব্যের চাইতে এতই কম ছিল যে, বিদেশি কোম্পানিসমূহ সব সময় আমদানিকৃত দ্রব্যের মূল্য পরিশোধ করার জন্য রূপার পাত আমদানি করত। উৎপাদিত দ্রব্যের একটি অংশ শহরের অভ্যন্তরে উৎপন্ন হতো। যেমন— তাঁতিবাজার, শাঁখারিবাজার ইত্যাদি। কিন্তু উৎপাদিত দ্রব্য, বিশেষত সুতিবস্ত্র ঢাকার চারপাশের স্থান থেকে এবং তাঁতের কেন্দ্র থেকে আসত।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু কৃষিজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে অবস্থা ছিল ভিন্ন। কৃষিজাত দ্রব্যের বেশিরভাগ ঢাকার আশেপাশের জেলা থেকে আসত। খুব সামান্য অংশ বিশেষত তরিতরকারি ঢাকা শহরের আনাচে-কানাচে উৎপন্ন হতো।

ঢাকার ব্যবসা-বাণিজ্যের সত্যিকারভাবে পতন শুরু হয় ১৭৬৫ সালের পর থেকে যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রকৃত অর্থে বাংলার শাসনকর্তা হয়ে ওঠে। কোম্পানি কর্তৃক নতুন শাসন কাঠামো প্রবর্তনের কারণে পুরানো মুঘল কর্মকর্তারা ক্ষমতা ও চাকরি দুই-ই হারায়। এই মুঘল কর্মকর্তা ও অভিজাতরা ঢাকার ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের বড় ধরনের পৃষ্ঠপোষক ছিল। এদের ভাগ্য পরিবর্তনের সাথে সাথে ঢাকা ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষকদের হারায়। একই সাথে দেশের নতুন রাজধানী হিসেবে কলকাতার উদ্ভবের সাথে সাথে সেই শহরে ও তার আশে পাশে সকল ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্রীভূতীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। তবে সবচেয়ে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হয় দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার বিস্তারের ফলে। সবকিছু কোম্পানি ও তার কর্মচারীদের একচেটিয়া দখলে চলে যাওয়ার সাথে সাথে ঢাকার ব্যবসা-বাণিজ্য নিস্তেজ হয়ে পড়ে। বাংলায় মুঘল শাসনের অবসানের সাথে সাথে ঢাকার ব্যবসা ও শিল্প যে বাজার হারায় তা আরো সংকটাপন্ন হয়ে ওঠে, যখন উত্তর ভারতেও মুঘলদের ক্ষমতা হ্রাস পায়। ব্রিটেনের শিল্প বিপ্লবের সাথে সাথে ঢাকার ব্যবসা ও শিল্পের এই বিপজ্জনক অবস্থা চরমে ওঠে। যার ফলে ঢাকার শিল্পকর্ম বিশেষ করে সুতিবস্ত্র সম্পূর্ণভাবে বাজার হারিয়ে ফেলে।

ঢাকার বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির মূল উপকরণ বিভিন্ন ধরনের সুতিবস্ত্র পোশাক ও কাটা কাপড়ের উৎপাদন ও রপ্তানি এই সময়ে আশঙ্কাজনকভাবে কমে যায়। টেলর মন্তব্য করেন, '১৭৮৭ সাল থেকে যে পরিমাণ মসলিন ইংল্যান্ডে রপ্তানি করা হয়েছিল তার মূল্য ছিল ত্রিশ লাখ টাকা, ১৮০৭ সালে এই রপ্তানির মূল্য এসে দাঁড়ায় আট লাখ টাকায়। ১৮১৭ সালে এই রপ্তানি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায় এবং সেই সাথে ঢাকায় কোম্পানির বাণিজ্য অফিস বিলুপ্ত করে দেয়া হয়'।[৬]

ব্রিটিশ সুতা ১৮২১ সালে প্রথম আমদানি করা হয়। এটা অল্প দিনের মধ্যে হাতে তৈরি সুতাকে বিতাড়িত করে। এই সুতার প্রধান আকর্ষণ ছিল এর আয়তন একরকম এবং যে কোনো সময়, যে কোনো পরিমাণ সুতা বের করা যেত। যার ফলে প্রচুর সময় ও শ্রম বেঁচে যেত। মসলিন কাপড়ের সুতা তৈরিতে যে সময় লাগত তার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ সময়ও বেঁচে যেত। দামের ক্ষেত্রেও দুই শ্রেণির সুতার মধ্যে চড়া রকমের পার্থক্য ছিল, দেশীয় আমদানিকৃত সবচেয়ে উন্নত সুতার দাম যেখানে ছিল ১৩ (তের) আনা, বিপরীতে বিদেশি সুতার (নং ২০০) দাম ছিল মাত্র ৩ (তিন) আনা। আবার নিম্নমানের দেশীয় সুতার দাম যেখানে ছিল ২ (দুই) আনা, সেখানে বিদেশি সুতার দাম ছিল মাত্র ১ (এক) আনা ১০ গণ্ডামাত্র।[৭]

Dhaka University Institutional Repository

দেশীয় *কাসিদা*ও (কাজ করা মসলিন কাপড়) মন্দার শিকার হয়। তুর্কি সৈন্যদের পোশাক পরিবর্তন হওয়ায় কলকাতার বিক্রি ১৮৩৫ সালে যেখানে ৪০,০০,০০০ রুপি ছিল, ১৮৩৮ সালে তা হ্রাস পেয়ে ১,০০,০০০ রুপি হয়ে যায়।[৮]

এখানে *কাসিদা* সম্পর্কে সংক্ষেপে উল্লেখ করা প্রয়োজন। *কাসিদা* হলো ফার্সি শব্দ। যার অর্থ হলো সূচিকর্ম। সাধারণত নকশা করা মসলিনকে *কাসিদা* বলা হতো। জেমস টেলর উল্লেখ করেন যে, মুগা ও তসর সিল্কের সুতার বিভিন্ন প্রকার কাপড়ের গায়ে ফুল বা বুটিতোলা হতো। বিলেতি সুতায় তৈরি এসব বস্ত্রের নাম *কাসিদা*।[৯] আবার অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন উল্লেখ করেন যে, *কাসিদার* কাপড় তৈরি হতো *কার্পাস* ও রেশমি সুতা দিয়ে। আর কাপড়ের উপর যখন কাজ করা হতো তখন তা *কাসিদায়* পরিণত হতো।[১০] সাধারণত শাল, স্কার্ফ, গলাবন্ধ প্রভৃতি বস্ত্র কলকাতা থেকে আমদানি করা হতো এবং বিলেতে পাঠাবার জন্য এখানে বুটি তোলা, ফুল তোলা ইত্যাদি কারুকার্য করার জন্য ব্যবস্থা করা হতো। ইউরোপে এ সমস্ত কাপড়ের যথেষ্ট চাহিদা ছিল। আরব, পারস্য, তুরস্কের সৈন্যদের শিরস্ত্রান হিসেবে *কাসিদা* ব্যবহৃত হতো। এছাড়া ফতুয়া ও ঘাগরা হিসেবেও *কাসিদা* ব্যবহৃত হতো।

সাধারণত তিন ধরনের লোক *কাসিদা* ব্যবসার সাথে জড়িত ছিল। ১. মহাজন, ২. দালাল, ৩. কারিগর। মহাজনদের কাছ থেকে দালাল বা ওস্তাগাররা ছাপ মারা কাপড়, সুতা, টাকা কারিগরদের মাঝে বন্টন করে দিত এবং কাজ শেষ হলে তা মহাজনদের কাছে ফেরত নিয়ে আসা হতো। কাজের গুণাগুণ অনুসারে কারিগরদের পারিশ্রমিক দেয়া হতো।

সাধারণত ৫০ থেকে ৬০ ধরনের *কাসিদা* কাপড় তৈরি হতো। তার মধ্যে কাটা উরমি নৌবস্তি, আজিজ উল্যা এবং দোছাক ছিল প্রধান। প্রকারভেদে কাপড়ের মূল্য ৫০ থেকে ৮০ রুপির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।[১১]

উনিশ শতকের মাঝামাঝিতে *কাসিদা* কাপড় নিয়ে ঢাকায় ব্যাপক ব্যবসা হতো। এই কাপড় বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হতো। সাধারণত মহাজনরা *কাসিদা* কাপড় তুরস্ক, আরব, আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া, আমেরিকা এবং প্যারিসে রপ্তানি করত। এছাড়া বসরা, জেদ্দা, পিনাং, রেঙ্গুন রপ্তানি করা হতো।

ড. শরীফ উদ্দিন আহমেদ উল্লেখ করেন যে, ১৮৫০-এর দশক পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যে *কাসিদার* কাপড়ের ব্যাপক চাহিদা ছিল। ১৮৫৮ সালে মধ্যপ্রাচ্যে রপ্তানিকৃত এই কাপড়ের মূল্য ছিল ৬ লক্ষ টাকা।[১২] ১৮৯৬ সালে কেবল আরবদেশে ২,৫০,০০০ টাকার মূল্যের *কাসিদা* রপ্তানি হয়।[১৩] ১৯১২ সালে ২ লক্ষ টাকার *কাসিদা* রপ্তানি করা হয়।[১৪] সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বিশ শতকের শুরু পর্যন্ত এ শিল্প টিকে থাকলেও আলোচ্য সময়ে (১৯২১-৭১) প্রায় মৃত। সরকারি রিপোর্টেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, "বিশ শতকের বিশের দশক থেকে ৫০ বছর আগে যেখানে ১০০ থেকে ১৫০ জন মহাজন এ ব্যবসার সাথে জড়িত ছিল। সেখানে বিশ শতকের বিশের দশকে (১৯২৮) এক ডজনেরও অর্ধেক ব্যবসায়ী এ ব্যবসায় নিয়োজিত ছিল এবং সীমিত আকারে এই ব্যবসা করত"।[১৫]

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন কারণে *কাসিদা* ব্যবসা ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে মানুষের রুচি বা ফ্যাশনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এসব কাপড়ের চাহিদা কমতে থাকে এবং কাপড়ে সূক্ষ্ম কাজও ক্রমশ বন্ধ হয়ে যায়। চাহিদা কমার ফলে একদিকে যেমন লাভ কম হতো অন্যদিকে নকশি সুতার মূল্য বেড়ে যাওয়ায় ঢাকার ডজন খানেক ব্যবসায়ী *কাসিদা* ব্যবসা থেকে সরে দাঁড়িয়েছিল।

সরকারি রিপোর্টে *কাসিদা* শিল্পের ধ্বংসের কয়েকটি কারণ উল্লেখ করে। এগুলো হলো[১৬] —

1. The *kasida* turban was in great demand in Turkey some years ago and was the head-gear of the people. Since the introduction of fur caps which have replaced the *kasida* pugrees, the export to Turkey has declined to a very considerable extent.
2. The people of Bagdad have established the industry in their own country and the turbans are now being made there.
3. The participation of Turkey in the last war and her joining hands with the Germans had the effect of practically stopping the trade with Turkey in these cloths.
4. The Luxury Bill passed by France prohibits the import of all articles of Luxury from foreign countries and their chicon and *kasida* works have been included in the list of Luxuries.

সুতরাং দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, *কাসিদা* ছিল ঢাকার সর্বপ্রধান সূচিশিল্প। অন্যান্য সূচিশিল্প থাকলেও এটি অনেকবেশি সমৃদ্ধ ছিল। মধ্য উনিশ শতক পর্যন্ত এ শিল্পকে কেন্দ্র করে ঢাকায় রমরমা ব্যবসা-বাণিজ্য হতো। বিভিন্ন কারণে এ শিল্প ধ্বংস হলেও বিশ শতকের বিশের দশক পর্যন্ত টিকে ছিল।

ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পকর্মের সার্বিক মন্দার দরুণ ঢাকার বড় বড় আরমেনিয়, গ্রিক, কাশ্মীরি ও স্থানীয় ব্যবসায়ীদের অনেকেই ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে দিয়ে তাদের মূলধন অন্যত্র যেমন— জমি, জমিদারি ও অন্যান্য বিষয় সম্পত্তি কেনায় বিনিয়োগ করে। একই সময়ে সরকারের মুদ্রা সংস্কার, সর্বোচ্চহারে সুদ নির্ধারণ এবং সরকারি এজেন্সির মাধ্যমে রাজস্ব প্রেরণের নীতিমালা স্থানীয় শ্রফ, ব্যাংকার এবং মহাজনদের টাকা লগ্নি ও টাকা ভাঙানোর ব্যবসায় মারাত্মক আঘাত হানে। ফলে অনেকেই তাদের ব্যবসা গুটিয়ে শহর ছেড়ে চলে যায়।

১৮৪০ সালে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পে মারাত্মক অবনতি সত্ত্বেও ব্যবসা ও শিল্পের একটি আঞ্চলিক কেন্দ্র ও বন্দর হিসাবে ঢাকা তার গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান বজায় রাখে। বিশ্ববাজারে এই পশ্চাদভূমির কৃষিজাত পণ্য ও শিল্পের এক বিরাট চাহিদা ছিল। একই সাথে এখানকার বিপুল জনগোষ্ঠীর জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নানা ধরনের সামগ্রী আমদানিও করতে হতো।

Dhaka University Institutional Repository

এ সময় (১৮৪০) ঢাকা শহর ছিল বাংলার অন্যতম প্রধান জনাকীর্ণ শহর। স্থায়ী বাসিন্দা ছাড়াও শহরে বিদেশি ব্যবসায়ী, আশেপাশের গ্রামবাসী ও শ্রমিকদের একটি বড় অংশের অস্থায়ী বাস ছিল, যারা চাকরি, প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কারণে স্বল্প সময়ের জন্য ঢাকায় অবস্থান করত। এসব মিলিয়ে উপভোগ ও ব্যয়ের স্থান হিসেবে ঢাকার গুরুত্ব কম ছিল না। ঢাকার বিভিন্ন বাজার ও বিপণীকেন্দ্র যেমন— বাংলাবাজার, নবাবপুর, ইসলামপুর ও উর্দু বাজারের গুরুত্ব তাই থেকে যায়। এই সময়ে ঢাকায় নতুন নতুন দ্রব্য সামগ্রীরও আবির্ভাব ঘটতে থাকে।

১৮৪০ সাল পর্যন্ত চকবাজারই ছিল ঢাকার ব্যবসার মূল কেন্দ্র। মুঘল আমলের এই প্রধান বিপণীস্থান তখনও হাজার হাজার পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায়ীদের আড়ত ও দোকানে ভরপুর ছিল। ছোট ছোট দোকানদারদেরও হরেক রকম ব্যবসা ছিল। মূল বাজারে স্থান না পেয়ে যে রাস্তা চক থেকে বুড়িগঙ্গার দিকে চলে গিয়েছিল সেই রাস্তার উপরেও অনেক দোকান বসত।

আশেপাশের গ্রামবাসীরা ঢাকার বাজারে বিক্রির জন্য নিয়ে আসত নানা ধরনের চাল, ডাল, তেল, ঘি, শাকসব্জি আর মাছ। এসব গ্রামবাসী তাদের পণ্য বিক্রি করে সেই পয়সা দিয়ে ঢাকা থেকে কিনে নিয়ে যেত লবণ, মসলা, কাপড় আর এই ধরনের অন্যান্য দ্রব্য। শহরবাসীর জন্য দুধ ও মিষ্টি আসত বেশিরভাগই মিরপুর গ্রাম থেকে। যেখানে ঢাকা থেকে ব্যবসায়ীরা প্রতিদিনই যেত গ্রামবাসীদের কাছ থেকে এই সামগ্রী কেনার জন্য।

ড. শরীফ উদ্দিন আহমেদ উল্লেখ করেছেন যে, এই সময় ঢাকার অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনে জনসংখ্যার বৃদ্ধিও এক ইতিবাচক প্রভাব বয়ে আনে। গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসাবে ঢাকার পুনরুত্থান আর সেই সাথে সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্রমবিকাশ নগরে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটায়। ১৮৮১ সালের মধ্যেই এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৮০,২১০।[১৭] এই বৃদ্ধির ফলে ঢাকার বাজারগুলি আবারো চাঙ্গা হয়ে ওঠে। পুরানো বাজারগুলি প্রাণ ফিরে পায়; নতুন নতুন দোকান খোলা হয় আর ব্যবসার প্রকৃতিও বহুমাত্রিক হয়ে ওঠে। বিলেতি প্রতিযোগিতায় একদিকে যেমন স্থানীয় লোকজ শিল্প ক্ষতিগ্রস্থ হয় তেমনি আবার ইংল্যান্ড থেকে বিপুলভাবে সুতা আমদানি করার ফলে তাঁতিদের জন্য তা সংগ্রহ করা সহজলভ্য এবং সুলভ হয়। একইভাবে দেশে পশ্চিমা সংস্কৃতিতে প্রভাবিত এক নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণির আবির্ভাব ঘটে, যারা বিলেতি সামগ্রী সংগ্রহে উৎসাহিত হয়ে ওঠে। আর দেশের বিত্তবান জমিদাররাও ইংরেজদের জীবনযাত্রা অনুকরণে মেতে ওঠে। ফলে সামগ্রিকভাবে দেশে বিলেতি জিনিসপত্রের চাহিদা বেড়ে যায়। ঢাকা হয়ে ওঠে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ববাংলার সকল বিলেতি জিনিসপত্রের প্রধান সরবরাহকারী এক বাণিজ্য কেন্দ্র যা নগরটির জন্য এক বিশেষ গুরুত্ব সংযোগ করে।

বিলেতি সুতি বস্ত্র বিশেষ করে ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড়, বিলেতি ছাতা, জুতা, সাবান, বিস্কুট, চকলেট ও এমনি ধরনের নানা দ্রব্য এমনকি বেলজিয়ামের কাচের জিনিসপত্র দিয়েও ঢাকার দোকানগুলি ভরে ওঠে। ১৮২৪ সালে বিশব হেবার যখন ঢাকায় আসেন তখন ঢাকার

Dhaka University Institutional Repository

ভাঙাচোরা দোকান আর পড়ন্ত বাজারে বিলেতি জিনিসপত্রের আধিক্য লক্ষ্য করে বিস্ময় প্রকাশ করেন।

তিনি লিখেছিলেন, "এইসব বাজার আর ছোট ছোট দোকান যা আমি কখনই আশা করি নি, বিলেতি প্রসাধনী, লেখবার ডেস্ক, টেবিল, খাবার ছুরি, কাটা চামচ, নানাবর্ণের সুতির ছিট কাপড়, পিস্তল, পাখি শিকারের হালকা বন্দুক, কাঠ ইত্যাদি খোদাই কাজ এবং এমনি ধরনের নানা বিলেতি জিনিস বা তার অনুকরণে প্রস্তুত করা সামগ্রী দিয়ে ভর্তি। এ থেকে বোঝা যায় যে, স্থানীয় মধ্যবিত্ত এমনকি সাধারণ মানুষও কিভাবে বিলেতি জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ওঠে।"[১৮]

এসব বিলেতি পণ্য আমদানি ও বিক্রির ব্যাপারে ঢাকার আরমেনিয় ব্যবসায়ীরা পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে। ১৮৫৭ সালের দিকে আরমেনিয় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান জি. এম. সিরকোর এন্ড সন্স ছিল ঢাকার বিলেতি জিনিসপত্রের এক বিপণীকেন্দ্র। এদিকে আরমেনিয়দের দেখাদেখি অন্যান্য স্থানীয় ব্যবসায়ীরাও ইউরোপীয় সামগ্রীর দোকান দেয়। ১৮৬০ সালে এই ধরনের নামকরা দোকান ছিল পাটুয়াটুলী, বাবুবাজার আর নলগোলায় যথাক্রমে রূপ চান্দ এন্ড কোম্পানি, গঙ্গা চরণ দাস এন্ড কোম্পানি ও ডস কোম্পানি এবং ১৮৭০-এর দশকে বাবুবাজার এলাকায় এন. কে. চট্টোপাধ্যায় এন্ড কোম্পানি। এই দোকানগুলিতে ইউরোপীয় সামগ্রী যেমন— জুতা, ছেলেমেয়েদের পোশাক, হোল্ড-অল, বোতাম, মোজা, পাদুকা, পারফিউম, বিছানার চাদর, কম্বল, বিভিন্ন ঔষধ ও ছাতা ছাড়াও অনেক মূল্যবান দেশীয় সামগ্রীও বিক্রি হতো।[১৯]

বিলেতি বা ইউরোপীয় পণ্য বিক্রি সম্পদ আহরণের এক নতুন উৎস হিসেবে আবির্ভূত হয়। ঢাকার অনেক ব্যবসায়ীই এই বিদেশি পণ্য বিক্রি করে ধনী হয়ে ওঠে।

এই সময় ঢাকায় সোনা রূপার সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে তৈরি হতো। ঢাকার স্বর্ণকার ও রৌপ্যকার তাদের নকশা ও ফিলিগ্রি কাজের জন্য বিখ্যাত ছিল। সোনা-রূপার হাতবালা, কানের দুল আর আতর ও গোলাপদানি তৈরির কাজে ঢাকার কারিগররা ছিল পারদর্শী। এই সময়ে ঢাকায় প্রায় তিনশ স্বর্ণকার ও রৌপ্যকার ছিল। এছাড়া এই সময় শাঁখার কাজ যেমন— হাতের বালা, আংটি আর চুড়ি ছিল ঢাকার অন্যতম প্রধান শিল্পকর্ম সামগ্রী। এগুলো ঢাকায় প্রচুর পরিমাণে বিক্রি হতো। ড. শরীফ উদ্দিন আহমেদ উল্লেখ করেন যে, ঢাকায় ১৮৪০ সালে প্রায় ৫০০ শাঁখারি ছিল। উল্লেখ্য এগুলি ছিল এই সময়ের ঢাকার অন্যতম প্রধান রপ্তানি সামগ্রী।[২০]

এছাড়া বিভিন্ন জন্তুর শিং ও হাতির দাঁতের কাজ, সাবান ও কাগজ তৈরি এবং সর্বোপরি নৌকা তৈরি ছিল ঢাকার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদন সামগ্রী। ১৮৪০ সাল পর্যন্ত সুতিবস্ত্র শিল্পই ছিল ঢাকার অর্থনীতির মূল শক্তি এবং নগরীর প্রধান শিল্পকর্ম। শতশত তাঁতি সূচিশিল্পী, রিফুকার, রঞ্জক, ধোপা এবং অন্যান্য শ্রমিক এই বস্ত্রশিল্পে নিয়োজিত ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

এ সময় ঢাকায় মোটা সুতার কাপড়ও তৈরি হতো। ঢাকার ডিভিশনাল কমিশনার ডানবার মন্তব্য করেন যে, এগুলি মূলত ব্রিটেন থেকে আমদানি করা সুতা দিয়েই তৈরি হতো আর স্থানীয় আঞ্চলিক বাজারের জন্য বানানো হতো। বিলেতি সুতা আর সিলেট ও আসাম থেকে আনা রেশম দিয়ে তৈরি এক মিশ্র কাপড় তখনও মধ্যপ্রাচ্যে সামান্য পরিমাণে রপ্তানি করা হতো। তাছাড়া ঢাকা শহর এই সময়ে ফরিদপুর, ত্রিপুরা এবং নোয়াখালি থেকে আমদানি করা মোটা সুতিবস্ত্রের বিপণী কেন্দ্র ছিল।

১৮৪৪ সালে ডানবার ঢাকার বস্ত্রশিল্পের উপর একটি রিপোর্টে উল্লেখ করেন যে, সে বছর ঢাকা থেকে রপ্তানিকৃত সুতিবস্ত্রের মোট মূল্য ছিল ৯,৩৬,০০০ টাকা; যা ১৭৪৭ সালের রপ্তানি মূল্যের এক তৃতীয়াংশ। ডানবার এও মন্তব্য করেন যে, এখন আর কোনো সুতি বস্ত্র ঢাকা থেকে ইউরোপে রপ্তানি করা হয় না। সুতাকাটা যদিও এখনও শিল্প হিসেবে টিকে আছে তবে তা বিলেত থেকে আমদানিকৃত সুতার কাছে ভীষণভাবে মার খাচ্ছে। ফলে সুতাকাটা—যা এক সময়ে বহু লোকের কর্মসংস্থান যোগাত, বিলেত থেকে আমদানিকৃত সুতার জন্য তা এখন প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেছে। কেননা বিলেত থেকে আনা সুতা অনুরূপ মানের স্থানীয়ভাবে তৈরি সুতা থেকে অনেক সস্তায় পাওয়া যায়।[২১]

ঢাকার বিখ্যাত সুতিবস্ত্রের পুনরুত্থান ঘটাতে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে এ বিষয়ে সরকার তার কাছে এক প্রতিবেদন চাইলে তিনি সরাসরি উত্তর দেন যে, "যেহেতু বিলেত থেকে আমদানি করা সকল সুতিবস্ত্রের উপর অত্যন্ত চড়া হারে শুল্ক বসানো সম্ভব নয়, কেননা এটি আমদানি নিষিদ্ধকরণেরই সামিল হবে, আর তাই এই শিল্প পুনরুদ্ধারের বৃথা চেষ্টা না করাই ভালো। বরঞ্চ ঢাকা এবং তার পশ্চাদভূমি থেকে ব্রিটেনের কারখানার জন্য যে ধরনের কাঁচামাল সরবরাহ করা যেতে পারে সেই সমস্ত কাঁচামালের উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে সরকারি উৎসাহ প্রদান করা হবে। তিনি আরো মন্তব্য করেন যে, সমগ্র ঢাকা জেলার কৃষকদের উপযুক্ত ও লাভজনক কৃষিপণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত করে এবং কাঁচামাল রপ্তানির পরিমাণ আরো অনেক বেশি বাড়িয়ে ঢাকা শহরের শিল্পকর্মের অতীতের হারানো সমৃদ্ধি ক্ষতিপূরণ করা অতি সহজেই সম্ভব।"[২২]

এদিকে বিশ শতকের গোড়ার দিকে তথা ১৯০৬ সালে নিম্নগামী দেশীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্বদেশি আন্দোলনের ফলে নিজেদের রক্ষার জন্য তৎপর হয় এবং চারদিকে ধীরগতিতে উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। স্বদেশি আন্দোলনের দ্বারা হাতে কাপড় বুনোনের সাড়া জাগে এবং ঢাকার তাঁতশিল্প কেন্দ্রগুলো আবার উৎপাদন শুরু করে। ১৯০৫-১৯০৬ সালে ইউরোপ থেকে পণ্যসামগ্রী ৯৪,৭১৮ মণে নেমে আসে। যেখানে পূর্ববর্তী বছর ছিল ১,২৩,৫৭৩ মণ। ইউরোপীয় সুতা আমদানি আগের বছরের ২১,১২৫ মণের পরিবর্তে পরের বছর ১৪,৩৮৫ মণে নেমে যায়। স্বদেশি আন্দোলন বিদেশি কাপড়ের ও সুতা আমদানির ক্ষেত্রে ক্রমাগত নিম্নগামী লক্ষ্য করা যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন মাল পরিবহনযোগ্য জাহাজের অপ্রতুলতার কারণেও দেশীয় তাঁতশিল্প ক্রমান্বয়ে উন্নতি করতে লাগল। ১৯১৯ সালে স্বদেশি

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলন চরকা ও হাতেকাটা সুতার একটা নতুন অর্থ এনেছিল কিন্তু ভারতের বোম্বে ও অন্যান্য জায়গায় কারখানায় নির্মিত সুতা ও কাপড়ও খুব ব্যবহৃত হতো।

ঢাকার চামড়া শিল্প ছিল সুপ্রাচীন শিল্প। বিশ শতকের আগে থেকেই ঢাকা পশুর চামড়া ব্যবসার একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র বলে পরিচিত ছিল। এ বিষয়ে জেমস ওয়াইজ উল্লেখ করেন যে, "ঢাকা হলো চামড়া ব্যবসার জমজমাট কেন্দ্র। চামড়া ব্যবসায়ীরা গোঁড়া সম্প্রদায়ের মুসলমান। সাধারণত এরা কুট্টি শ্রেণির। কুট্টিরা আবার হয় ফরাজি কিংবা ওহাবি। বাজার যখন মন্দা থাকে তখন এরা রাজমিস্ত্রির কাজ করে অথবা ভিস্তির কাজ।

অভিযোগ শোনা যায় যে, এ অপবিত্র ব্যবসায়ে হিন্দু বেনিয়ারা টাকা অগ্রিম দিতে চায় না। কিন্তু সাহা মহাজনদের কাছে থেকে চামড়া ফরোশদের টাকা পেতে কোনো অসুবিধাই হয় না। চামড়া ফরোশরা ওদের সঙ্গে মুনাফা ভাগাভাগি করে নেয়। সুদ জিনিসটাকে ফরাজিরা বড়ই অপবিত্র মনে করে; কিন্তু মুনাফায় তাদের আপত্তি নেই। অন্যের সাধুতা ও ন্যায়পরায়ণতায় পূর্ববঙ্গের বাসিন্দাদের অগাধ বিশ্বাস। কোনো রকম জামানত অথবা বন্ধক ছাড়া শুধু ঋণ গ্রহীতার প্রমিসরি নোটের উপর আস্থা রেখে ঋণ দেয়া হয়। প্রতারণার ঘটনার কথা বিশেষ শোনা যায় না।

টাকা অগ্রীম পাবার পর চামড়া ব্যবসায়ীরা অসুস্থ ও বয়োবৃদ্ধ গবাদি পশু কিনে জবাই করার জন্য দেশের সবখানে তাদের লোক পাঠায়। গ্রাম্য ঋষিরা যেসব গবাধিপশুর চামড়া ছিলে আগে থেকেই শুকিয়ে রেখেছে সেগুলোও কেনা হয়। বাজারে পাঠাবার আগে চামড়া ফরোশরা চামড়াগুলো প্রথমে পানিতে ভিজিয়ে রেখে ঝামা দিয়ে ঘষে। তারপর খারি-নুনের পানিতে সেগুলো ধোয়। রোগে মরা গবাদি পশুর (মুরদারি) চামড়ার চেয়ে জবাই করা পশুর (হালালি) চামড়াব দাম বেশি। মৃত পশুর চামড়ার দাম গ্রামেগঞ্জে চুয়াল্লিশ আনা; আর ঢাকায় সেগুলো আটচল্লিশ আনা, বায়ান্ন আনায় বিক্রি করা হতো। হালালি পশুর চামড়ায় কোনো দাগ থাকে না। গ্রামে মৃত পশুকে টেনে হিচড়ে আনা হয় এবং আনার সময় আঁচড় লেগে পিঠের চামড়ার পশম ওঠে যায়। এতে চামড়া হয়ে যায় খারাপ। দাম হয় সস্তা।

গত শতাব্দীতে (আঠার) চামড়ার বাজার হিসাবে ঢাকা ছিল বিখ্যাত। বাংলার পূর্ব-উত্তরের পর্বতবেষ্টিত এলাকায় অনেক লোক পাঠানো হতো চামড়া কিনতে। কিন্তু সে ব্যবসা বিলুপ্তপ্রায়। চীন ও তিব্বতে সুতি ও পশমি কাপড় প্রচলিত হওয়ায় সে সব দেশে চামড়ার চাহিদা কমে গেছে। হয়ত রুচির পরিবর্তন হয়েছে।"[২৩]

ড. শরীফ উদ্দিন আহমেদ উল্লেখ করেন যে, অতীতে এটি ছিল মূলত নিম্নবর্ণের হিন্দুদের অর্থাৎ চামার ও মুচিদের বংশগত পেশা। আঠার শতকের শেষের দিকে ঢাকার আরমেনিয়, ইরানি ও মুসলমান কাশ্মীরি ব্যবসায়ীরা এই ব্যবসা শুরু করে। চামড়া ব্যবসা যতই বাড়তে থাকে ততই ঢাকা শহর কাঁচা চামড়া শিল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়। উনিশ শতকে সারা পূর্ববাংলায় চামাররা ব্যস্ত হয়ে ওঠে। কাঁচা চামড়া পরিষ্কার ও শুকানো থেকে পাকা করা এবং জুতা তৈরির কারখানা স্থাপনের ব্যাপরটি ছিল কয়েকটি ধাপের বিষয়। ফলে ঢাকায় ব্রিটেনের লেস্টার নগরীর মত জুতা তৈরির বিখ্যাত স্থান হিসাবে

Dhaka University Institutional Repository

গড়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকলেও দুর্ভাগ্যবশত তা বাস্তবায়িত হয় নি। কারণ ঢাকার পথিকৃত চামড়া ব্যবসায়ীরা প্রচুর পরিমাণে অর্থ আয় করে, যা তারা জমিদারি ও অন্যান্য বিষয় সম্পত্তি কেনায় বিনিয়োগ করে। কেননা সেখান থেকে মুনাফা লাভ ছিল অনেকটাই নিশ্চিত এবং অতি দ্রুতভাবে সামাজিক সম্ভ্রান্ত হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া ছিল সম্ভব।[২৪] ১৮৫০-এর দশকের মধ্যেই ঢাকার সকল সফল আরমেনিয়, ইরানি ও কাশ্মীরি চামড়া ব্যবসায়ী বড় বড় ডাকসাইটে জমিদার বনে যায়। ফলে দেখা যায় যে, চামড়া পাকাকরণের জন্য ঢাকায় কোনো আধুনিক ট্যানারি গড়ে ওঠে নি।

ব্যবসার এই খাতটি মুসলমানদের পুরো নিয়ন্ত্রণে ছিল। কারণ পয়সাওয়ালা কোনো উচ্চবর্ণের হিন্দুই চামড়ার ব্যবসা করত না।

নীলকর ব্যতীত অন্যান্য ব্রিটিশ নাগরিকরাও স্থানীয় পণ্যের রপ্তানি ব্যবসা করত। এ সকল পণ্য তারা কেবল কলকাতা নয় ভরতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও পাঠাত। এদের মধ্যে ছিলেন উইলিয়াম ফলি (William Foley), টি. এফ. রিকেটস (T. F. Rickets) এবং জে. জে. বেট (J. J. Bett)।

উনিশ শতকের চল্লিশের দশকে ইউরোপীয় কায়দায় ঢাকায় শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। এই প্রচেষ্টার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হচ্ছে ১৮৪০-এর দশকের দিকে ঢাকায় একটি চিনির কল স্থাপন। এটি পরিচালিত হতো ঢাকা সুগার ওয়ার্কস কোম্পানি (Dacca Sugar Works Company) নামে একটি জয়েন্ট স্টক কোম্পানির মাধ্যমে। ১৮৫০-এর দশকে এটি বন্ধ হয়ে যায়।

আবার এ সময়ই ঢাকায় ইউরোপীয় কায়দায় ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ইতিহাস শুরু হয়। যদিও মুঘলযুগ থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত শ্রফ, পোদ্দার, মহাজনরা ঢাকার ব্যাংকার ছিলেন।

ড. শরীফ উদ্দিন আহমেদ উল্লেখ করেন যে, উনিশ শতকের মাঝামাঝি স্থানীয় শিল্পকর্ম বিশেষ করে হস্তশিল্পের পুনরুজ্জীবন ঘটে। এই সময় এর ব্যাপ্তি খুব একটা ছিল না বলে অতি সূক্ষ্ম ও সুন্দর মসলিন কাপড় ; যার উৎপাদন ১৮৪০ দশক পর্যন্ত বজায় ছিল—তা পরবর্তী সময়ে বিলেতের লাঙ্কাশায়ার থেকে আমদানিকৃত সস্তা সুতি কাপড়ের সাথে (যা শার্ট, ধুতি, শাড়ি এবং চাদর তৈরির কাজে ব্যবহৃত হতো) প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারে নি। তবে তাঁতে বোনা মোটা কাপড়ের উৎপাদন অনেকদিন টিকে থাকে। এ ধরনের কাপড় দেশি তাঁতে বিলেতি সুতা দিয়ে তৈরি করা হতো। এই কাপড় ১৮৭০-এর দশক থেকে বাংলায় আমদানিকৃত বোম্বের মিলের তৈরি বস্ত্রের তীব্র প্রতিযোগিতায়ও টিকে থাকে।[২৫]

অপরদিকে মূল্যবান জামদানি বা নকশা করা মসলিন (তাঁতে নকশা করা মসলিনকে জামদানি বলা হতো) যাকে উপমহাদেশের Chef-d-oeuvre বা উৎকৃষ্ট শিল্পবস্তু বলে বিদেশি রসওগন অভিহিত করেছেন। এ সম্পর্কে ওয়ার্টের উক্তি লক্ষণীয়—

Dhaka University Institutional Repository

"The Zamdanis as figured muslins have been spoken of us the chef-d-oeuvre of the Indian weaves and certainly they are the most artistic articles produced in Bengal."[২৬]

অন্যান্য মসলিনের মত বিদেশে জামদানির বেশ চাহিদা ছিল। সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিলেতে এ বস্ত্রের রপ্তানি চলেছিল। এখানকার উৎকৃষ্ট বস্ত্রের তীব্র প্রতিযোগিতায় শঙ্কিত হয়ে ইংল্যান্ডের বয়নশিল্পীগণ সেখানকার বস্ত্রশিল্প সংরক্ষণের জন্য আন্দোলন চালায়। ফলে ১৭০০ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট একটি আইন পাশ করে ইংল্যান্ডে যে কয়েকটি কাপড়ের আমদানি নিষিদ্ধ করে দেয়, জামদানি তারমধ্যে অন্যতম বলে টেলর উল্লেখ করেন। তবে বিদেশে রপ্তানি বন্ধ হলেও পরবর্তীতে-এর উৎপাদন কিন্তু যতই দিন যেতে থাকে ততই বাড়ে। কারণ দেশে এক নতুন ধনী ও অভিজাত শ্রেণির আবির্ভাব ঘটেছিল, যারা পুরানো মুঘল ও হিন্দু অভিজাতদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে তাদের মতই দেশীয় বিলাসী সামগ্রীর পৃষ্ঠপোষকতা করে।[২৭]

ঢাকায় জামদানিনগর ছিল জামদানি তাঁতিদের মহল্লা। অতিসূক্ষ্ম সোনা-রূপার সুতা দিয়ে তাঁতি এবং সূচিশিল্পীদের তৈরি করা জামদানি ঢাকার কারিগরদের এক বিশেষত্ব হয়ে ওঠে। এ ধরনের সুতা কেবল *কাসিদা* কাপড় বা জামদানি শাড়িতেই ব্যবহৃত হতো তাই নয়, টুপির উপর সূচিকর্মের জন্যেও ব্যবহৃত হতো। ১৮৮৭ সালে ঢাকা থেকে প্রায় ২,৮৭,০০০ টাকার জামদানি কাপড় রপ্তানি করা হয়েছিল।[২৮] উল্লেখ্য আলোচ্য সময় থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত জামদানি শাড়ির জনপ্রিয়তা অব্যাহত রয়েছে।

অপর একটি হস্তশিল্প—যা সবসময়ই সনাতনী কারিগরদের হাতেই ছিল এবং উনিশ শতকের শেষার্ধে যার উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়, সেটি হল শাঁখার কাজ। ঢাকার শাঁখারিরা নিজেরাই সম্পূর্ণভাবে শঙ্খ শিল্পের উৎপাদন ও ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করত। সেই আদিকাল থেকেই ঢাকার শাঁখারিরা শাঁখারিবাজারে বাস করত। আর তাদের সৌখিন শাঁখের কাজ কুটির শিল্প হিসেবেই পরিচিতি পায়।

ব্যবসা বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবনের সাথে সাথে আরেকটি সনাতনী শিল্পের পুনর্বিকাশ ঘটে, আর সেটি হল নৌকা তৈরি। ১৮৫০-এর দশকের পর থেকে কলকাতা ও অন্যান্য জায়গায় বর্ধিত পরিমাণে নানাবিধ পণ্য রপ্তানির জন্য অধিক সংখ্যক দেশি নৌকার দরকার হয়ে পড়ে। বিশেষ করে পাটের রপ্তানি বাড়ার সাথে সাথে নৌকার চাহিদাও বেড়ে যায়। এ কারণে নৌকা তৈরি বৃদ্ধি পায়—যা স্টিমার ও রেলওয়ের আগমন ও পূর্ণাঙ্গ বিকাশের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

নৌকা তৈরির বিশেষ শিল্পের গুরুত্ব কমতে থাকলেও ঢাকায় সাধারণ কাঠ মিস্ত্রিদের কাজ বৃদ্ধি পায়—যা শহরের সমৃদ্ধি ও অধিকহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ক্রমবর্ধমান হতে থাকে। কাঠের চাহিদা বাড়ার সাথে ফরাসগঞ্জের সাহা ব্যবসায়ীরা কাঠ ও কাঠের তৈরি আসবাবপত্রের ব্যবসার দিকে ঝুঁকে পড়ে। তারা কাঠের গোলা প্রতিষ্ঠা করে আর এসব গোলায় পর্যাপ্ত পরিমাণে শাল, সেগুন, মেহগিনি ইত্যাদি মূল্যবান কাঠ মজুত রাখে। একই

Dhaka University Institutional Repository

সাথে কাঠ মিস্ত্রিদের নিয়োগ করে চাহিদা মাফিক কাঠ চেরাই ও আসবাবপত্র প্রস্তুত করে শহর ও মফস্বলে সরবরাহ করে। কাঠের ব্যবসা দারুণভাবে বেড়ে ওঠে এবং গোটা ফরাসগঞ্জ এলাকাই কাঠের আসবাবপত্রের প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। সাহাদের অনুকরণে ঢাকার অন্যান্য পয়সাওয়ালা ব্যবসায়ীরাও এই ব্যবসায় নেমে পড়ে। অচিরেই কাঠের কাজ আর কুটির শিল্প থাকে না বরং কারখানা শিল্পে রূপান্তরিত হয়।

কাঠ ও কাঠের আসবাবপত্রের ব্যবসা যেমন রমরমা হয়ে ওঠে, তেমনি উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে গৃহনির্মাণও একটি বড় শিল্প হিসাবে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। গৃহস্বামীরা ব্যক্তিগত বাড়ি, ব্যবসায়ীরা মিলকারখানা বানাতে শুরু করে। সেই সাথে শুরু হয় সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য গৃহ আর রেলওয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কলোনি নির্মাণ। এ সকল নির্মাণ কাজ শহরের নতুন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সূচনা করে; এনে দেয় ঠিকাদার ও সরবরাহকারীদের জন্য নতুন সুযোগ আর শ্রমিকদের জন্য কর্মক্ষেত্র।

পরিশেষে বলা যায় যে, সুতিবস্ত্রসহ আনুষঙ্গিক শিল্প যা মুঘল আমলে রাজধানী ঢাকার সমৃদ্ধির মূল চাবিকাঠি ছিল তা উনিশ শতকের মাঝামাঝিতে একেবারে গৌণ হয়ে পড়ে। পুরানো শিল্পের কিছু কিছু যেমন হাঁতির দাঁতের কাজ চাহিদার অভাবে প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। অন্যান্যগুলি যেমন— কাগজ, রং, সুগন্ধী, বন্ধা, কাঁসার জিনিসপত্র, বোতাম এবং সূচি শিল্প বিলেত থেকে আমদানিকৃত মেশিনের তৈরি অনুরূপ সস্তা জিনিসপত্রের প্রতিযোগিতায় টিকতে পারে নি। টিকতে না পারলেও একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায় নি। আলোচ্য সময়ে এসব শিল্পের ব্যবসা অব্যাহত ছিল এবং এখনও অল্প পরিসরে অব্যাহত আছে। যা কুটিরশিল্পজাত দ্রব্যের অধ্যায়ে কাঁসা-পিতল, বোতাম, শঙ্খ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য বর্তমান গবেষণার অভিসন্দর্ভে ১৯২১ সালের ঢাকার ব্যবসা-বাণিজ্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা, পুরানো শিল্পের পাশাপাশি নতুন নতুন শিল্পও নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষ করে ঢাকার শিল্প-কলকারখানা ও ব্যাংক ব্যবসা। কেননা আলোচ্য সময়ের শুরুতে ঢাকার নতুন নতুন ভারি ও মাঝারি ধরনের কারখানা (যেমন— বস্ত্র মিল) গড়ে ওঠে। আবার কিছু কিছু শিল্পকারখানা দেশভাগের পর গড়ে ওঠে (যেমন— ট্যানারি)। যা ছিল ঢাকার জন্য একেবারে নতুন অভিজ্ঞতা। ফলে নতুন ও পুরানো উভয় শিল্প নিয়েই ঢাকার ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর অভিসন্দর্ভ রচনা করা হয়েছে।

তথ্যনির্দেশ

১. Joseph. A. Schumpeter, *History of Economic Analysis*, George Allen & Unwin Ltd. London, New York, 1955, P. 12, (*DUL*).

২. *Imperial Gazetteer of india, Eastern Bengal and Assam*, p. 312 (*DUL*).

৩. ড. আব্দুল করিম, *মুঘল রাজধানী ঢাকা*, অনুবাদ, ড. মোহাম্মদ মুহিবউল্লাহ ছিদ্দিকী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ২০০৩, পৃ. ১।

৪. জেমস টেলর, *কোম্পানি আমলে ঢাকা*, মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮, পৃ. ১৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

৫. *Bengal, past and Present,* Vol. 42, 1931, pp. 48-54, উদ্ধৃত, ড. আব্দুল করিম, *মুঘল রাজধানী ঢাকা*, পৃ. ৫৮-৫৯

৬. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *ঢাকা ইতিহাস ও নগরজীবন*, একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবলিশার্স লাইব্রেরি, ঢাকা, জুন ২০০৬, পৃ. ১০৪ ।

৭. B. C. Allen, *Eastern Bengal District Gazetteers, Dacca*, Allahabad, The Pioneer Press 1912, p.107 (*NAB*).

৮. *ঐ*, পৃ. ১০৭ ।

৯. জেমস টেলর, *কোম্পানি আমলে ঢাকা*, পৃ. ১২৩ ।

১০. মুনতাসীর মামুন, *ঢাকা স্মৃতি-বিস্মৃতির নগরী*, ১ম খণ্ড, অনন্যা প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃ. ৪৪ ।

১১. S. N. H. Rizvi, *East Pakistan District Gazetteers, Dacca*, 1969, p. 195 (*DUL*).

১২. *Dacca News,* 12 June 1958 উদ্ধৃত, শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *ঢাকা ইতিহাস ও নগরজীবন*, পৃ. ১৩১ ।

১৩. তোফায়েল আহমেদ, *আমাদের প্রাচীন শিল্প*, নওরোজ কিতাবিস্তান, বাংলাবাজার, ১৯৬৪, পৃ. ৫৭ ।

১৪. S.N.H. Rizvi : *East Pakistan District Gazetteers, Dacca* p. 195.

১৫. *Report on the Survey of Cottage Industries in Bengal*, Calcutta 1929, pp. 63-64.

১৬. *ঐ* pp. 63-64.

১৭. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *ঢাকা ইতিহাস ও নগরজীবন*, পৃ. ১০৪ ।

১৮. Bishop R. Heber, *Narrative of a Journey,* p. 342.

১৯. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *ঢাকা*, পৃ. ১০৭ ।

২০. *ঐ*, পৃ. ১০৭ ।

২১. বোর্ড অব রেভিনিউ-এর নিকট থেকে ১৮৪৪ তারিখের চিঠি Sadr Board of Revenue, Proceceding LXXXVI 15, উদ্ধৃত, শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *ঢাকা*, পৃ. ১০৮ ।

২২. *ঐ* আরো Trade of Dacca Halifax Papers MSS, Eur. p. 78. 44. উদ্ধৃত, শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *ঢাকা*, পৃ. ১১০ ।

২৩. জেমস ওয়াইজ, *পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও পেশার বিবরণ*, ১ম খণ্ড, শেখ ফজলুল করিম অনূদিত, আইসিবিএস, ১৯৯৯, পৃ. ৬৩-৬৪ ।

২৪. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *ঢাকা*, পৃ. ১০৯ ।

২৫. N. N. Banerjee, *Monograph on the Cotton Fabrics of Bengal*, pp. 3-4.

২৬. তোফায়েল আহমেদ, *আমাদের প্রাচীন শিল্প*, ১৯৬৪, পৃ. ৩৮ ।

২৭. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *ঢাকা*, পৃ. ১৩১ ।

২৮. কেদার নাথ মজুমদার, *ঢাকার বিবরণ*, পৃ. ১১১ ।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঢাকার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কুটিরশিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রীর ব্যবসা-বাণিজ্য (১৯২১-৭১)

ঢাকার বেশিরভাগ শিল্পই কুটির শিল্প পর্যায়ে ছিল। ব্রিটিশ যুগের পর থেকে বিশেষ করে পাকিস্তান আমলে কিছু কুটির শিল্প মাঝারি বা বড় ধরনের শিল্পে পরিণত হয়েছে। এই অধ্যায়ে ঢাকার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কুটির শিল্পজাত দ্রব্য সামগ্রীর ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণত বিপণনের জন্য উৎপন্ন কারুশিল্প কুটির শিল্প নামে পরিচিত। যে শিল্প কারিগরদের দ্বারা হাতে তৈরি তাকে কুটির শিল্প বলা হয়।[১] বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা (বিসিক) কুটির শিল্পের সংজ্ঞা দিয়েছে এভাবে, "যে শিল্প কারখানা একই পরিবারের সদস্য দ্বারা বা আংশিকভাবে পরিচালিত এবং পারিবারিক কারিগরগণ খণ্ডকালীন বা পূর্ণ সময়ের জন্য উৎপাদন কার্যে নিয়োজিত থাকেন এবং যে শিল্পে শক্তিচালিত যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হলে ১০ জনের বেশি এবং শক্তিচালিত যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত না হলে ২০ জনের বেশি কারিগর উৎপাদন কার্যে নিয়োজিত থাকে না তাকে কুটির শিল্প বলা হয়"।[২] কুটির শিল্পে মূলধন সামান্য, কাঁচামাল প্রায়শ স্থানীয়, কারখানার অবস্থান মালিকের স্বগৃহে বা ভাড়া করা ঘরে, মালিকানা ব্যক্তিগত, পারিবারিক বা দলীয় অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে, অজৈবিক শক্তির ব্যবহার ন্যূনতম এবং প্রযুক্তি সহজ এবং স্থানীয় নৈপুণ্য ভিত্তিক।[৩]

আবার ১৯৬০ সালের একটি রিপোর্টে বলা হয় "The cottage industry is purely an individual production process carried on mostly in the rural areas by agricultural workers during their leisure hours and off agricultural seasons, in their homes, as a part-time employment. Certain cottage industries are also carried on by full timers on professional basis. Cottage industries are also carried on a large scale in factories occassionally. Such cottage industrial factories are generally located in cities and towns. Nearly one hundred types of industrial goods are being produced in East Pakistan by such part-time and whole-time rural workers."[৪]

সুতরাং উপরের সংজ্ঞার আলোকে ঢাকার যেসব কুটির শিল্পজাত দ্রব্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তার সাথে মিল রয়েছে। কেননা প্রত্যেকটি কুটির শিল্পই ক্ষুদ্র পরিসরে, সীমিত মূলধন, অল্প শ্রমিক ও দেশীয় কাঁচামাল এবং কৃষির পাশাপাশি বিকল্প পেশা হিসেবে গড়ে ওঠে। ঢাকার যেসব কুটির শিল্পজাত দ্রব্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সেগুলো হলো :

ক. চামড়া;
খ. জুতা;
গ. কাঁসা-পিতল;
ঘ. শঙ্খ;
ঙ. বোতাম।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকার চামড়া ব্যবসা (১৯২১-৭১)

উপমহাদেশের অন্যান্য স্থানের মত পূর্ববাংলার তথা বাংলাদেশের চর্ম শিল্পের ঐতিহ্য হাজার বছরের। প্রাচীনকাল থেকে এদেশে সবজি শোধিত (vegetable tanned) চামড়ার ব্যবহার চলে আসছে। জুতার তলি এবং কারখানায় ব্যবহৃত চামড়া এখনো এ প্রাচীন পদ্ধতিতে ট্যান করা হয়। এদেশের আর্দ্র আবহাওয়ার দরুন চর্ম শিল্পের প্রাচীন কোনো নিদর্শন রক্ষিত হয় নি বলে এ শিল্পের ইতিহাসের সুনির্দিষ্ট কাল নির্ণয় সম্ভব নয়। তবে প্রাচীন দলিল দস্তাবেজ ও পাণ্ডুলিপি থেকে ষোড়শ শতাব্দীকে এ শিল্পের সৌকর্যের কালরূপে নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত করা যায়। এ কালের ব্যাপ্তি অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত। সেকালে রাজা বাদশাহদের জন্য হাতি, হাউদা, ঘোড়ার জিন, যুদ্ধের ঢাল, অসির খাপ প্রভৃতি তৈরি করতেন কুবদকার নামক মুসলমান চর্ম শিল্পীরা। তপ্ত লৌহ দণ্ড দিয়ে চামড়ার গায়ে কুবদকাররা নকশা দাগাতেন। তাঁরা স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত রং দিয়ে জ্যামিতিক ছক ও চিত্র কল্পে চামড়া সজ্জিত করতেন।

এখানে একটি বিষয় তুলে ধরা প্রয়োজন যে, চামড়া (hide and skin) ও প্রস্তুতকৃত ফিনিসড চামড়া ও Tanning সম্পর্কে মৌলিক ধারণা থাকা প্রয়োজন। চামড়া হলো কোনো প্রাণীর দেহ আবরণকারী অঙ্গ। প্রাণীর দেহের আকার ও আকৃতি অনুযায়ী চামড়াকে দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে–

১. Hide : যা হলো বড় প্রাণীর দেহ আবরণকারী অঙ্গ বা চামড়া। যেমন—গরু, মহিষ ইত্যাদি।

২. Skin : যা হলো ছোট প্রাণীর দেহ আবরণকারী অঙ্গ বা চামড়া। যেমন—ছাগল, বাছুর, ভেড়া ইত্যাদি।

এক্ষেত্রে John Arthur Wilson বলেন, "A skin is simply a small hide. In the case of cattle, a hide weighing less than 15 Ibs. in the green, salted state is called a calf skin. When it weighs from 15 to 25 Ibs. it is called a kip. When it weighs from 25 to 30 Ibs. it is called an over weight kip. When it weighs more than 30 Ibs. it is called a hide. A cow hide weighing less than 53 Ibs. is called a light cow and one weighing more than 53 Ibs. a heavy cow."[৪ক]

অপরদিকে Leather-এর সংজ্ঞা হলো : "Leather is animal hide or skin so treated chemically as to make it permanently more resistant to decomposition, particularly when wet. Any animal hide or skin may be converted into leather, but many are not used commercially for this purpose because of their small size, scarcity or lack of demand for the kind of leather they would make."[৪খ]

অর্থাৎ যখন চামড়াকে প্রক্রিয়াকরণ করে পাকা করা হয় এবং ফিনিসড চামড়ায় রূপান্তরিত করার ফলে কোনো দ্রব্য তৈরির জন্য প্রস্তুত করা হয় তখন তাকে Leather বলে।

Dhaka University Institutional Repository

আবার J. H. Sharphouse উল্লেখ করেন, Hides and Skins are turned into leather by 'tanning'. There are many ways of tanning, but all of them cause the following changes in the raw hide or skin :

1. The tanned skin does not putrefy, even after drying and wetting.
2. On drying the tanned skin does not become a hard, brittle material, but remains flexible and workable. The method of tannage chosen is largely concerned with how soft or hard, tight or stretchy, the resultant leather should be.[৪৭]

উল্লেখ্য এ অধ্যায়ে যেহেতু ঢাকার সমগ্র চামড়া ব্যবসা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সেহেতু কাঁচা চামড়া, ফিনিসড চামড়া তথা প্রক্রিয়াকৃত চামড়া এবং চামড়া দিয়ে যেসব দ্রব্য তৈরি হতো সেসব বিষয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। আলোচ্য সময়ের শুরুতে ঢাকায় মূলত কাঁচা চামড়া নিয়ে ব্যাপক ব্যবসা হতো।

আলোচ্য সময়ে কাঁচা চামড়াকে পাকা চামড়ায় প্রক্রিয়াজাত করতে যে সকল রাসায়নিক ও যান্ত্রিক প্রণালি ব্যবহার হতো তা নিম্নরূপ—

১. Curing : এই ধাপে কাঁচা চামড়াকে সাময়িকভাবে সংরক্ষণ করা হয়। এই ধাপের উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ—

* কাঁচা চামড়াকে সাময়িকভাবে সংরক্ষণ করা।
* কাঁচা চামড়াকে ব্যাকটেরিয়া মুক্ত করা।
* কাঁচা চামড়া হতে ব্যসন প্রক্রিয়ায় অতিরিক্ত পানি অপসারণ করা
* কাঁচা চামড়ার পচনরোধ করা।

ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে সংরক্ষণ করতে শুষ্ককরণ পদ্ধতি এবং লবণীকরণ পদ্ধতিতে খারি লবণ ব্যবহার করা হতো।

২. Soaking : এই ধাপটি ট্যানারিতে করা হয়। এই ধাপের উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ—

* চামড়াকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা ;
* চামড়া হতে ময়লা দূর করা ;
* সাবানের মাধ্যমে চর্বি দূর করা;
* চামড়ার তন্তু (Fibre) নমনীয় করা ;
* চামড়া হতে Cementing Material দূর করা।

পাকিস্তান আমলে চৌবাচ্চায় Soaking করা হতো এবং চামড়াকে আলোড়িত রাখার জন্য তা শ্রমিকদের মাধ্যমে পা দিয়ে পাড়ানো হতো, যা ছিল তাদের জন্য খুবই ক্ষতিকর। এই সময় Simple Soaking করা হতো কিন্তু বর্তমানে Enzymatic Soaking বেশি জনপ্রিয়। Simple Soaking-এর চেয়ে Enzymatic Soaking -এ কম সময় লাগে।

Dhaka University Institutional Repository

Liming : এটি চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণের একটি প্রধান প্রক্রিয়া। এই ধাপটিও ট্যানারিতে করা হতো। এই ধাপের উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ—

* চামড়া হতে কেরোটিন জাতীয় (লোম, ক্ষুর, নখ ইত্যাদি) পদার্থ অপসারণ করা ;
* চামড়া হতে ময়লা দূর করা ;
* সাবানের মাধ্যমে চর্বি দূর করা ;
* চামড়া হতে Cementing Material দূর করা ;
* চামড়ার তন্তু (Fibre) নমনীয় করা ;
* To open up the fibre from fibrebundle ;
* To swelling and plumping.

এই প্রক্রিয়াটিও সাধারণত চৌবাচ্চায় করা হতো এবং চামড়াকে আলোড়িত রাখার জন্য তা শ্রমিকদের মাধ্যমে পা দিয়ে পাড়ানো হতো। তবে তারা কখনো কখনো লাঠি বা চিমটা ব্যবহার করত।

Liming-এ যে সমস্ত পদার্থ ব্যবহার করা হতো তা নিম্নরূপ—

পানি, Wetting Agent (সাবানের ফেনা), টলোসাইড (Preservative), চুন, সোডিয়াম সালফাইড, Sharpening Agent.

Fleshing : এটিও পাকিস্তান আমলে শ্রমিকেরা ছুরির (Hand Knife) মাধ্যমে করত। যা ছিল খুবই কষ্টকর। ফলে Fleshing-এ অনেক সময় লাগত এবং উৎপাদন কম হতো।

Deliming : এ প্রক্রিয়াটিও ট্যানারিতে করা হতো। এই ধাপের উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ—

* চামড়া হতে চুন দূর করা ;
* চামড়া হতে কেরোটিন জাতীয় (লোম, ক্ষুর, নখ ইত্যাদি) পদার্থ অপসারণ করা ;
* চামড়ার তন্তু (fibre) নমনীয় করা ;
* To open up the fibre from fibrebundle.

এই প্রক্রিয়াটিও চৌবাচ্চার মধ্যে অনেক পানি রেখে করা হতো—যাতে সহজে চুন বের হতে পারে এবং চামড়াকে পা দিয়ে পাড়ানো হতো। এই প্রক্রিয়ায় কোনো রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হতো না। শুধু অনেক পানিতে ভালোভাবে পরিষ্কার করা হতো।

Drenching : এটি Bating-এর আগে করা হতো। কারণ Bating এ চামড়াতে যুক্ত Fibre গুলো Open Up করা হয়। এই ধাপটি আগে করলে Bating ভালো ও তাড়াতাড়ি হয়। এই ধাপে চামড়াকে Fermentation প্রক্রিয়ায় কিছুটা গাঁজানো হয়, ফলে সহজে Fibre গুলো Open Up হয়। কিন্তু বর্তমানে এই ধাপটি করা হয় না।

Bating : এই ধাপের উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ—

* চামড়ার তন্তু (fibre) নমনীয় করা ;
* চামড়া হতে সম্পূর্ণভাবে চুন দূর করা ;

Dhaka University Institutional Repository

* চামড়ার Grain মসৃণ করা ;
* চামড়া হতে সম্পূর্ণভাবে কেরোটিন জাতীয় পদার্থ অপসারণ করা ;
* Completely open up the fibre ;
* চামড়া হতে সম্পূর্ণভাবে Cementing Material দূর করা ।

এই প্রক্রিয়াটিও চৌবাচ্চায় করা হতো এবং চামড়াকে আলোড়িত রাখার জন্য শ্রমিকদের পা দিয়ে পাড়ানো হতো। এটিও তাদের ত্বকের জন্য খুবই ক্ষতিকর ছিল। তবে তারা কখনো কখনো লাঠি বা চিমটা ব্যবহার করত। এই সময় কোনো রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হতো না। তবে কবুতরের মল দিয়ে অথবা Fleshing Dust-কে পচিয়ে Bating করা হতো।

Pickling : এই ধাপে চামড়াকে স্থানীয়ভাবে অপচনশীল করা হয়। এই ধাপের উদ্দেশ্য নিম্নরূপ—

* চামড়াকে স্থানীয়ভাবে অপচনশীল করা ;
* ট্যানিং-এর জন্য P^H নির্ধারণ করা ;
* চামড়ার মধ্যে ফাঁকা জায়গা সৃষ্টি করা ;
* চামড়ার মধ্যে বিক্রিয়া করার জন্য Reactive Side সৃষ্টি করা ।

এটিও চৌবাচ্চায় করা হতো এবং চামড়াকে আলোড়িত রাখার জন্য শ্রমিকদের মাধ্যমে পা দিয়ে পাড়ানো হতো। এটিও তাদের ত্বকের জন্য খুবই ক্ষতিকর ছিল। কারণ Pickling দ্রবণ হচ্ছে এসিডিও। রাসায়নিক পদার্থ হিসেবে ফরমিক এসিড, সালফিউরিক এসিড, সাধারণ লবণ, হাইপো ব্যবহার করা হতো।

Skin Degreasing : এই ধাপে চামড়া হতে অতিরিক্ত চর্বি দূর করার জন্য Skin Degreasing করা হতো। সাধারণত ভেড়ার চামড়ায় অনেক চর্বি থাকে বলে Skin Degreasing করা হয়। কিন্তু বর্তমানে এই ধাপটি করা হয় না। এই ধাপের রাসায়নিক পদার্থ হলো পানি ও কেরোসিন তেল।

Tanning : এই ধাপে চামড়াকে বিভিন্ন প্রত্যাশিত বৈশিষ্ট্য দেওয়া হয়। এই ধাপের উদ্দেশ্য নিম্নরূপ—

* চামড়াকে বিভিন্ন প্রত্যাশিত বৈশিষ্ট্য দেওয়া ;
* চামড়ার স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করা ;
* চামড়ার grain মসৃণ করা ;
* চামড়ার স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি করা ।

চামড়ার ট্যানিং প্রক্রিয়া বিভিন্ন ধরনের ; এগুলো হলো :

১. আনটেন্ড (Untanned);
২. অয়েল (Oil);
৩. ফরমাডি-হাইড (Formaldehyde);
৪. ভেজিটেবল (Vegetable);

Dhaka University Institutional Repository

৫. ক্রোম আনমাস্কড (Chrome masked);
৬. বেসিক এলুমিনিয়াম (Basic Aluminium);
৭. জিরকোনাইল সালফেট (Zirconyl Sulphat);
৮. সিনথেটিক টেনিনস (Synthetic Tannins);
৯. এলুমিনিয়াম সালফেট (Aluminium Sulphat (not basic));
১০. মাস্কড ক্রোম (Masked Chrome) ।[৪(ঘ)]

উপরে উল্লিখিত ট্যানিংয়ের মধ্যে পূর্ববাংলায় কেবল ভেজিটেবল ট্যানিং এবং ক্রোম ট্যানিং প্রচলিত ছিল। কেননা দেশভাগের আগে ঢাকা থেকে কেবল খারি লবণ দিয়ে চামড়া কলকাতায় পাঠানো হতো। পরবর্তীতে গাছগাছালি বা গাছের বাকল, পাতা, রস দিয়ে চামড়া ট্যান করা হতো। এটি পূর্ববাংলায় অনেক বেশি প্রচলিত ছিল।

Vegetable Tanning : এই Tanning-এ ব্যবহৃত উপাদানসমূহ সাধারণত বিভিন্ন গাছপালা (ওয়্যাতেল, বাবুল, মাইরোবালান, কোনান, ভারান, গরান, কাটচ, ওক, চেস্ট নাট, ভেলনিয়া, দিভি-দিভি, সামাক, গম্ভির, গেওয়া ইত্যাদি) হতে নিষ্কাশন করা হতো বলে একে Vegetable Tanning বলা হতো। Vegetable Tanning-এর উপাদানসমূহ গাছের বিভিন্ন অংশ হতে নেওয়া হতো। যেমন—বাকল, পাতা, মূল, কাণ্ড, কাঠ, ফল ইত্যাদি। পাকিস্তান আমলে Vegetable Tanning-এর উপাদানসমূহ পানিতে ভিজিয়ে রেখে ঐ পানি দিয়ে Tanning করা হতো। পূর্ববাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানে এই Tanning প্রক্রিয়াটি অনেক জনপ্রিয় ছিল। সাধারণত আর্মি বুট তৈরির জন্য Vegetable Tanning করা হতো।

Vegetable Tanning-এ যে সকল গাছ ও গাছের যে অংশ ব্যবহার করা হতো তা নিম্নে দেয়া হলো —

গাছের নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	ব্যবহৃত অংশ
Babul	*Acacia arabica*	Bark
Avaran	*Cassia auriculata*	Bark
Konan	*Cassia fistula*	Bark
Goran	*Ceriops roxbughiana*	Bark
Myrobalan	*Terminalia chebula*	Fruits
Wattle	*Acacia mollissina*	Bark
Cutch	*Acacia catechu*	Bark
Sumac	*Rhus coriaria*	Leaves; Twigs
Canaigre	—	Roots
Ashan	*Terminalia tomentosa*	Bark
Arjun	*Acacia arjuna*	Bark
Divi-divi	*Caesalpinia lorentzii*	Fruits
Chestnut	*Castanea Vesca*	Wood
Gambier	*Uncaria gambir*	Leaves; Twigs

উৎস : S. S. Dutta, *An Introduction to Physical Testing of Leather*, 4th Edition, 1999, p. 361 and K. P. Sarkar, *Theory and Practice of Leather Manufacture*, 1997, p. 336.

Dhaka University Institutional Repository

অপরদিকে পাকিস্তান আমলে Chrome Tanning চৌবাচ্চায় করা হতো এবং Double Bath প্রক্রিয়ার মাধ্যমে করা হতো। সে সময় Chrome-এর দ্রবণ হাতে তৈরি করে নিতে হতো যা ছিল বিপদজনক এবং চামড়া আলোড়নের জন্য শ্রমিকদের পা দিয়ে পাড়ানো হতো। যা তাদের ত্বকের জন্য ছিল ক্ষতিকর।

Basification : এটি Chrome Tanning-এর একটি অপরিহার্য প্রক্রিয়া। এটি আগে চৌবাচ্চায় করা হতো, কিন্তু এখন industrial drum-এর মাধ্যমে করা হয়। এই ধাপের উদ্দেশ্য নিম্নরূপ —

* চামড়ায় Chrome-কে স্থায়ী করা।
* চামড়ার পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য pH নির্ধারণ করা।

Shaving & Shamming : Shamming-এর মাধ্যমে চামড়া হতে অতিরিক্ত পানি বের করে প্রয়োজনীয় পানি দেওয়া হয়। পাকিস্তান আমলে এই প্রক্রিয়াটি রোদে শুকিয়ে করা হতো, কিন্তু এখন এটা মেশিনের মাধ্যমে করা হয়। Shamming করা শেষ হলে, চামড়ার মধ্যে সমান পরিমাণ পুরুত্ব দেওয়ার জন্য Shaving করা হয়। এটি আগে হাতে করা হতো, এখন এটা মেশিনের মাধ্যমে করা হয়।

Retanning : Shamming, Shaving করা শেষ হলে চামড়াকে আবার Tanning করনো হয় বিধায় এটাকে Retanning বলা হয়। এই ধাপের উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ—

* চামড়াতে Chrome প্রবেশে সহায়তা করা ;
* চামড়াতে Chrome-এর পরিমাণ বাড়ানো ;
* চামড়াতে মুক্ত Reactive Side-এর সাথে বিক্রিয়া করা।

Dying : এই সময় সাধারণ মানের Dye (কালো) ব্যবহার করা হতো, তখন সাধারণত প্রাকৃতিকভাবে লব্ধ অথবা জৈব Dye ব্যবহার করা হতো।

Fat Liquoring : এই ধাপে চামড়াকে নরম বৈশিষ্ট্য দেওয়া হয়। আগে এটিতে সাধারণ মানের তেল ব্যবহার করা হতো, কিন্তু এখন অনেক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয়।

Shamming & Setting, Drying : চামড়ার Dying এবং Fat Liquoring অপারেশন শেষ হলে, চামড়াতে Dye অণু স্থায়ী করতে এবং চামড়া হতে অতিরিক্ত পানি বের করে দিতে Shamming & Setting করা হয়। পাকিস্তান আমলে Drying রোদে শুকিয়ে করত, ফলে অনেক সময় লাগত।

Dhaka University Institutional Repository

Finishing : এটি চামড়ার জন্য খুবই প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া। এই ধাপের উদ্দেশ্য নিম্নরূপ —

* এটি চামড়ার Grain চকচকে করে ;
* এটি চামড়ার ত্রুটি ঢেকে রাখে ;
* এটি চামড়ার Grain মসৃণ করে ;
* এটি চামড়াতে Water Proofness বৈশিষ্ট্য দেয়।

পাকিস্তান আমলে সাধারণত হাতে Finishing করা হতো। যাকে Padding Finishing বলা হয়। এই সময় যে সকল রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার হতো সেগুলো হচ্ছে— Dye, Pigment, Casin, রক্ত, ডিম এবং Filler & Binder।

উপরের আলোচনায় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, পাকিস্তান আমলে সাধারণ প্রক্রিয়ায় চামড়া ট্যান করা হতো। উল্লেখ্য এ অধ্যায়ে ঢাকার সমগ্র চামড়া ব্যবসা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাই কাঁচা চামড়া, ফিনিসড চামড়া তথা পাকা চামড়ার ব্যবসা তুলে ধরা হয়েছে।

ঢাকার একমাত্র ব্যবসা ও শিল্প যা নাকি উনিশ শতকে দারুণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল তাহলো চামড়া। অতীতে এটি ছিল মূলত নিম্নবর্ণের হিন্দুদের অর্থাৎ চামার আর মুচিদের বংশগত পেশা। কিন্তু আঠার শতকের শেষের দিকে ঢাকার আরমেনিয়া, ইরানি ও মুসলমান, কাশ্মীরি ব্যবসায়ীরা এই ব্যবসা শুরু করে।[৫] প্রথমে তারা বরিশাল থেকে, পরে ঢাকা থেকে এ ব্যবসা চালায়। যার ফলে ঢাকা চামড়া ব্যবসার একটি বড় কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে। এই ব্যবসায়ীরা পূর্ববাংলার বিভিন্ন স্থান থেকে কাঁচা চামড়া কিনে ঢাকায় নিয়ে আসত এবং এখানেই সেগুলি পরিষ্কার ও শুকিয়ে কলকাতায় রপ্তানি করত। পরে সেখান থেকে সেগুলি বিলেতে পাঠানো হতো। চামড়া ব্যবসা যতই বাড়তে থাকে ততই ঢাকা শহর কাঁচা চামড়া শিল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে ওঠে। ঢাকার চামড়ার বাণিজ্যের চাহিদা মেটাতে এ সময় সারা পূর্ববাংলার গ্রামাঞ্চলে চামাররা এই সামগ্রী সংগ্রহে দারুণ ব্যস্ত হয়ে ওঠে। উনিশ শতকে চামড়া ব্যবসা করে ঢাকার অনেকেই বিত্তবান হয়ে ওঠে। দৃষ্টান্ত হিসেবে যার নাম উল্লেখ করতে হয় তিনি হলেন খাজা আলিমুল্লাহ। খাজা আলিমুল্লাহ, খাজা আব্দুল গনির পিতা। তিনি চামড়া ব্যবসা করে বিপুল পরিমাণ টাকা আয় করেন এবং এই টাকা দিয়ে তিনি মস্ত বড় এক জমিদারির মালিক হন। তবে ঢাকার চামড়া ব্যবসা উনিশ শতকে বৃদ্ধি পেলেও বর্তমান অভিসন্দর্ভের আলোচ্য সময় (১৯২১-৭১) পর্যন্ত চলতে থাকে এমনকি এখনো তা অব্যাহত আছে।

আলোচ্য সময়ের (১৯২১-৭১) চামড়া ব্যবসা নিয়ে আলোচনা করার আগে বিশ শতকের প্রথম দিকে ঢাকার চামড়া ব্যবসার অবস্থা কেমন ছিল তা প্রাসঙ্গিক কারণে তুলে ধরা হলো। মূলত বিশ শতকের শুরুতে স্বদেশি আন্দোলনের ফলে পূর্ববাংলা তথা ঢাকার বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। তার মধ্যে চামড়া শিল্প অন্যতম। এই সময়ও যে ব্যাপকভাবে চামড়া ব্যবসা হতো তা একটি পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায়। এই পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, ১৯০৮ সালে ৪২ লক্ষ রুপির চামড়া ঢাকা থেকে বিদেশে রপ্তানি করা হয়।[৬] গরুর চামড়া উপমহাদেশে, ষাঁড়ের চামড়া তুরস্কে এবং ছাগলের চামড়া আমেরিকায় পাঠানো হতো।

Dhaka University Institutional Repository

স্বদেশি আন্দোলনের প্রেরণাতেই ঢাকায় ট্যানারি শিল্প গড়ে ওঠে। বাবু শচীন্দ্রনাথ ঘোষ মাদ্রাজ থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ৫০,০০০ রুপি মূলধন নিয়ে ট্যানারি শিল্প স্থাপন করেন।[৭] এই কারখানায় ক্রোমিয়াম দ্বারা চামড়া ট্যান করা হতো। কিন্তু এই কারখানা বেশিদিন টেকে নি। চামড়া ট্যান করার ফলে ক্রমে লক্ষ্মীবাজার, মালিটোলা, নবাবপুর অঞ্চলে বহু জুতা প্রস্তুতের ছোট কারখানা গড়ে ওঠে। এই সময় ১০০ জন জুতা প্রস্তুতকারীর একটি আবাসস্থল বা কলোনিও এসব এলাকায় ছিল। এরা একদিকে যেমন নতুন জুতা তৈরি করত, অন্যদিকে পুরানো জুতা মেরামতও করত। জুতা তৈরির দোকান ছাড়াও পাঁচটি চামড়ার দোকানও ছিল। বাবু শচীন্দ্রনাথ ঘোষ যে ট্যানারি আরম্ভ করেছিলেন তার উৎপাদিত চামড়া এই সমস্ত দোকানে পাওয়া যেত।

১৯০৬-১১ সালে স্বদেশি আন্দোলন দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রচুর প্রেরণা জুগিয়েছিল। 'ওহাইট ম্যান এন্ড সন্স' নামে একটি স্থানীয় প্রতিষ্ঠান পূর্বে যেখানে বার্ষিক ২৫,০০০ রুপির ইংলিশ বুট জুতা আমদানি করত, সেখানে স্বদেশি আন্দোলন চলাকালীন ১০০ রুপির অর্ধেক মূল্যের এই সামগ্রী বিক্রি করতে পারে নি।[৮]

১৯১০ সাল পর্যন্ত ট্যানারি শিল্প টিকে থাকলেও এরপর স্বাধীনতা পর্যন্ত (১৯৪৭) এই শিল্পে আর কোনো পরিবর্তন সাধিত হয় নি। কলকাতা ট্যানারি কলেজের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ছাত্ররা ট্যানারি স্থাপনের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছিল, কিন্তু কেউ সার্থকতা লাভ করতে পারে নি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর অসহযোগ আন্দোলনের (১৯২০-২২) ফলে তৎকালীন সরকারের প্রচেষ্টা ছিল যাতে স্থানীয় জনগণ ব্যবসা-বাণিজ্যে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারে। এর ফলে চামড়া শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে।

এই সময় (বিশ শতকের বিশের দশক) ঢাকা শহরের ১৯ হাটখোলা রোডের টাকাতলীতে (takatooli) নিজ বাসভবনে প্রমোদরঞ্জন বোস চামড়ার দ্রব্য তৈরি করতেন। তিনি বিশ শতকের বিশ দশকের শেষের দিকে এই শিল্পে প্রায় ৩০০০ টাকা বিনিয়োগ করেন। তার প্রতিষ্ঠানে ৭ জন লোক কাজ করত। এর মধ্যে ৩ জন ছিল মুচি, ২জন মুসলমান এবং ২ জন হিন্দু। এরা চামড়াকে ঘষে এর উজ্জ্বলতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করত। তাদের গড়ে প্রতিমাসে ৩৫ রুপি প্রদান করা হতো।[৯] প্রতিমাসে চামড়াজাত দ্রব্যের গড় উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৫০ থেকে ৬০ বাক্স।[১০] তার এই প্রতিষ্ঠানের চামড়া থেকে বিভিন্ন ধরনের দ্রব্য তৈরি করা হতো। যেমন — চামড়ার ট্র্যাঙ্ক, স্যুটকেস, মহিলাদের ব্যাগ, পকেট কেস, বাক্স ইত্যাদি। এই দ্রব্যের মান এত ভালো ছিল যে, ইউরোপ ও ভারতে এর ব্যাপক চাহিদা ছিল। ফলে এসব দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। প্রমোদরঞ্জন বোস তার চামড়াজাত দ্রব্যগুলো সাধারণত বন্ধু ও পরিচিতজনদের মাধ্যমে বিক্রি করতেন।

আলোচ্য সময়েও ঋষি ও মুসলিম কসাইরা গ্রাম থেকে গরু ও ছাগলের চামড়া কিনত। এরপর এগুলোকে লবণ ও কাদা দিয়ে সংরক্ষণ করত[১১] এবং ঢাকা শহরের চামড়া ব্যবসায়ীদের কাছে এগুলো বিক্রি করত। কখনো কখনো উদ্ভিজ্জ উপাদান দিয়ে চামড়া পাকা করা হতো অর্থাৎ সবজি শোধিত চামড়া করা হতো। চামড়া পাকা করা ছাড়াও ঋষিরা নিম্নমানের স্যান্ডেল (চটি) এবং চপ্পল তৈরি করত এবং তা স্থানীয় বাজারে বিক্রি করত। বিশ শতকের বিশের দশকে ঢাকা শহরে প্রায় ১৬ জন ঋষি পরিবার ছিল।[১২] এরা ভালো মানের বুট জুতা ও চপ্পল তৈরি করত। এগুলো আমদানিকৃত দ্রব্যের চেয়ে দামে সস্তা ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা শহরের লক্ষ্মীবাজারের মুচিরা কলকাতা থেকে ক্রোমিয়াম চামড়া (ক্রোমিয়াম ঘটিত লবণ দিয়ে যে চামড়া পাকা করা হয়) কিনে তা দিয়ে ভালো মানের ও ভালো নকশার টেকসই জুতা তৈরি করত।

১৯৩৯ সালে আমেরিকা ব্রিটিশ ইন্ডিয়া থেকে বিভিন্ন ধরনের গবাদিপশুর চামড়া (cattle hide), ক্যাটেল কিপস (Cattle Kips), বাছুরের চামড়া (Calf Skins), ছাগল ও ছাগল ছানার চামড়া (Goat and kid Skins), মহিষের চামড়া (Baffalo Hide) আমদানি করত। তার পরিমাণ নিম্নের সারণিতে দেয়া হলো —

সারণি-১

চামড়ার নাম	শুকনা চামড়া (Dry hide, kips and skins)			ভেজা চামড়া (wet hide, kips and skins)		
	টুকরো (Pieces)	পাউন্ড (lbs)	ডলার (Dollar)	টুকরো (Pieces)	পাউন্ড (lbs)	ডলার (Dollar)
গবাদি পশুর চামড়া (cattle hide)	৯৩,৪৮৮	১৩,৪৬,৭১৯	১,৩২,৪৭০	-	-	-
ক্যাটেল কিপস (cattle kips)	৫৩,৪০০	৫,১৪,৯২১	৬৫,৩৬০	-	-	-
বাছুরের চামড়া (calf skin)	৩১,৫৫০	৯৮,৮৩৭	১১,৫৪৮	-	-	-
ছাগল ও ছাগল ছানার চামড়া (Goat and kid skin)	১,০৮,৮৮,৪৬১	২,২৮,২৩,০৩০	৪১,২১,৭১৬	১০,১৩,৯৪০	২৮,০৬,৪৩৩	৩,৬২,৬৬১
মহিষের চামড়া শুকনা ও ভেজা (Dry and wet Buffalo hides)	৫৭,০৫০	৬,৭৭,৯১৯	৭৭,৬৩০	-	-	-

উৎস : John Arthur Wilson, *Modern Practice in Leather Manufacture*, Reinhold Publishing Corporation, 1941, pp. 77-82 *(BCLTL)*.

উপরে সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের পরিসংখ্যান দেয়া হয়েছে। আলাদা করে ভারত ও পূর্ববাংলা বা ঢাকার হিসাব দেয়া নেই। ত্রিশের দশকে পূর্ববাংলা তথা ঢাকা থেকে কেবল কাঁচা চামড়া কলকাতায় পাঠানো হতো এবং পরে কলকাতা থেকে বিভিন্ন দেশে চামড়া রপ্তানি করা হতো। তবে ১৯৪৩ সালের একটি রিপোর্টে ১৯৩০-এর দশকের ঢাকায় যে বিপুল পরিমাণ ছাগল জবাই করা হতো তার একটি পরিসংখ্যান পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-২

ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ কসাইখানার ছাগল জবাইয়ের সংখ্যা

সাল	সংখ্যা/টুকরো (লক্ষ)
১৯৩২-১৯৩৩	০.৪৩
১৯৩৩-১৯৩৪	০.৫২
১৯৩৪-১৯৩৫	০.৫২
১৯৩৫-১৯৩৬	০.৫৩
১৯৩৬-১৯৩৭	০.৪৮
১৯৩৭-১৯৩৮	০.৫০
১৯৩৮-১৯৩৯	০.৫২

উৎস: *Report on the Marketing of Skins in India And Burma*, the Manager Publication, Government of India, Delhi, 1943, p. 12

উপরের পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায় যে, ঢাকায় ১৯৩২-৩৩ সালের চেয়ে অন্যান্য বছরগুলোতে চামড়া বেশি উৎপাদিত হয়। এ থেকে ধারণা করা হয় ঢাকা শহরে মাংস খাওয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কেননা মাংসের চাহিদার সাথে সাথে চামড়ার উৎপাদনের পরিমাণ জড়িত। ***(পরবর্তী পৃষ্ঠায় আনুপাতিক পর্যায়ক্রমিক চিত্রটি দেখুন)***

আরেকটি রিপোর্টে দেখা যায় যে, অতীতে 'ফিনিসড' চামড়ার ব্যবসা মুসলমানদের হাতে ছিল।[১৩] যদিও ড. শরীফ উদ্দিন আহমেদ উল্লেখ করেছেন অতীতে এটি ছিল নিম্নবর্ণের হিন্দুদের অর্থাৎ চামার ও মুচির বংশগত পেশা।[১৪] সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মুসলমানরা ফিনিসড চামড়া ব্যবসা অর্থাৎ চামড়াকে প্রক্রিয়াজাতকরণের পর চূড়ান্ত পর্যায়ে যে ভালো বা নিখুঁত চামড়া পাওয়া যেত তার ব্যবসা করত মুসলমানরা। আর নিম্নবর্ণের হিন্দুরা করত চামার মুচির কাজ। যেহেতু ঢাকা শহর ছিল চামড়া ব্যবসার প্রধান কেন্দ্রগুলোর মধ্যে একটি অন্যতম, সেহেতু এটি চামড়া শিল্পেরও সবচেয়ে ভালো জায়গার মধ্যে একটি। যদিও ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত কলকাতা ও কানপুরের ট্যানারিগুলোতে কাঁচা চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য পাঠান হতো। কারণ দেশভাগের আগ পর্যন্ত এ অঞ্চলে চামড়া শোধনের কোনো কারখানা বা ট্যানারি ছিল না। ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান সৃষ্টির পর ভারতীয় ট্যানারিসমূহের প্রত্যাবাসিত জনশক্তির উদ্যোগে এখানে তথা ঢাকায় চামড়া শিল্প গড়ে ওঠে। যা সরকারি রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, চল্লিশের দশকে দুটি ট্যানারি কাজ করত-এর একটি হলো নারায়ণগঞ্জে, যা ঢাকা ট্যানারিজ লিমিটেড (Dacca Tanneries Ltd.) নামে পরিচিত। অন্যটি হলো ঢাকার হাজারিবাগ রোডে অবস্থিত যা H. B. Tannery নামে পরিচিত। এছাড়া অনেক চামার আছে যারা চামড়া পাকা করত। এই পাকা চামড়ার উৎপাদনের পরিমাণের একটি হিসাব পাওয়া যায়।[১৫]

Dhaka University Institutional Repository

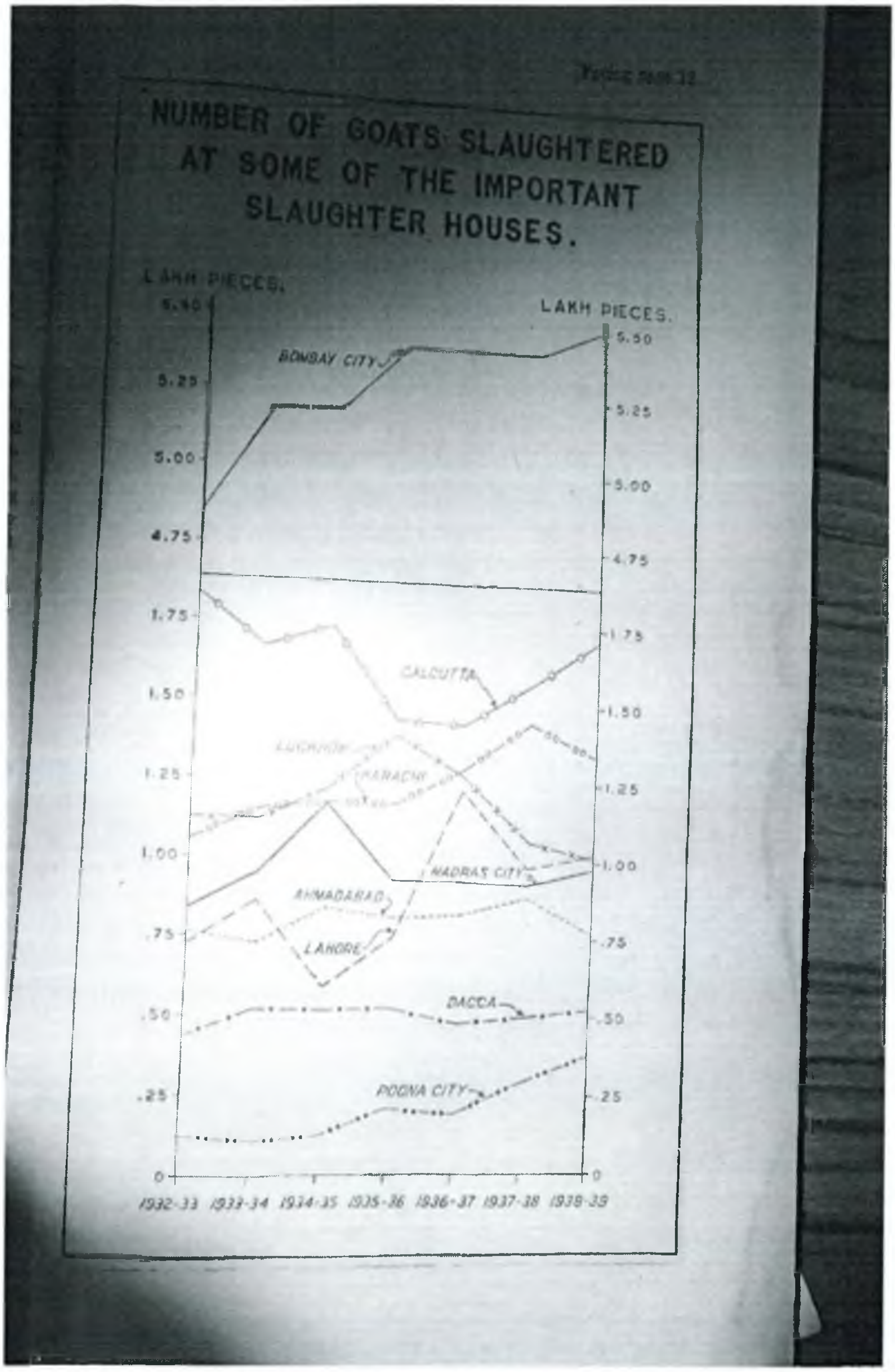

১৯৩০-এর দশকে ঢাকা শহরে ছাগল জবাইয়ের আনুপাতিক পর্যায়ক্রমিক চিত্র।

উৎস : *Report on the Marketing of Skins in India & Burma*, The Manager Publication, Government of India, Delhi, 1943, p. 13.

Dhaka University Institutional Repository

1. Present estimated requirment of tanned hides 13,25,451 Pcs
15,80,813 Pcs
29,06,264 Pcs

2. Present estimated quantity
tanned hides 1,80,200 Pcs
Skins 29,200 Pcs
2,09,400 Pcs

3. Present estimated balance to be
Manufactured hides 11,45,251 Pcs
Skins 15,51,613 Pcs
26,96,864 Pcs

উপরের হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে, দুটি ট্যানারিতে পাকা চামড়া উৎপাদনের পরিমাণ চাহিদা অনুযায়ী কম ছিল।

পাকা চামড়ার পাশাপাশি কাঁচা চামড়ার হিসাবও পাওয়া যায়। যেহেতু পূর্ববাংলার জেলাগুলোতে প্রচুর পরিমাণে কাঁচা চামড়া উৎপাদিত হতো সেহেতু এটি কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হতো। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে এই শিল্পের প্রচুর সুনাম ছিল। চল্লিশের দশকে ভারতের প্রায় সব প্রদেশেই কাঁচা চামড়া রপ্তানি করা হতো। ১৯৪৮ সালের সরকারি একটি নথিপত্রে কাঁচা চামড়ার উৎপাদন, ভোগ ও রপ্তানির একটি তালিকা পাওয়া যায়।[১৬]

i. Present estimated production

Hides	30,13,700 Pcs
Skins	16,83,500 Pcs
Total	46,97,200 Pcs

ii. Present estimated consumtion

Hides	1,80,200 Pcs
Skins	29,200 Pcs
Total	2,09,400 Pcs

iii. Present estimated export out of East Bengal

Hides	28,33,500 Pcs
Skins	16,54,300 Pcs
Total	44,87,800 Pcs

iv. Present estimated imports :

i. from adjoining countries - Nil

ii. from other countries - Nil

Dhaka University Institutional Repository

এই নথিতে দেশ ভাগের ফলে পূর্ববাংলায় চামড়া ট্যান করার ভালো উপাদান না থাকায় কাঁচা চামড়া নিয়ে যে সমস্যা ছিল তাও উল্লেখ করা হয়। এখানে বলা হয় যে,[১৭]

i. East Bengal has been deprived of a well-equipped Tanning Institute which has fallen in West Bengal.

ii. Almost all the modern well-equipped tanneries have fallen in West Bengal, with the result that the raw hides and skins produced in this province cannot be tanned.

iii. Large quantities of hides and skins are being smuggled to the Indian Dominion from the boarder districts, causing heavy loss in customs duty.

এই নথিতে চামড়া ব্যবসাকে কিভাবে পরিচালনা করা উচিত তাও উল্লেখ করা হয়, তাতে বলা হয় যে, "It should, therefore, be the aim of the state to sell them as finished products, not as raw materials which would bring in more money to the country and would also give employment to many thousands of people."[১৮]

সুতরাং সরকারি নথির রিপোর্টের ভিত্তিতে বলা যায় যে, চল্লিশের দশকে যে পরিমাণ কাঁচা চামড়া উৎপাদিত হতো তার বেশিরভাগ রপ্তানি হয়ে যেত। এই সময় কোনো পার্শ্ববর্তী দেশ ও অন্যান্য দেশ থেকে চামড়া আমদানি করা হতো না। এটি চামড়া ব্যবসার একটি ইতিবাচক দিক হলেও নেতিবাচক। কারণ দেশের চাহিদা পুরোপুরি না মিটিয়ে পুরোটা রপ্তানি করা দেশের অর্থনীতির জন্য অমঙ্গলজনক। তাছাড়া আরো দেখতে পাওয়া যায় যে, দেশভাগের ফলে চামড়া ব্যবসা শিল্পের উন্নতি হলেও ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। কেননা পূর্ববাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তান তথা ঢাকায় ট্যানারি গড়ে উঠলেও তা আধুনিক ও যথেষ্ট সংখ্যক ছিল না। ঢাকার ট্যানারি মূলত কুটির শিল্প পর্যায়ে ছিল। তাই চামড়া পাকাকরণের জন্য পশ্চিম বাংলার ট্যানারিতে পাঠানো হতো। অন্যদিকে বিপুল পরিমাণ চামড়া সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে চোরাচালান হয়ে যেত। আবার কাঁচা চামড়া বেশি রপ্তানি করা হতো বলে একদিকে যেমন দেশ অধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন থেকে বঞ্চিত হতো; তেমনি অন্যদিকে চামড়া শিল্পকে কেন্দ্র করে আরো আধুনিক ট্যানারি গড়ে উঠতে পারতো, এর ফলে যে সব লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হতো তা থেকেও বঞ্চিত হয়। মোটকথা এসময় চামড়া শিল্প বা ব্যবসা ক্ষেত্রে একটি নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পূর্ববাংলার আড়তদাররা অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে চামড়ার গুণাগুণ নির্ণয় করত না বা গ্রেডিং সিস্টেম অনুসরণ করত না। কিন্তু চল্লিশের দশকে (১৯৪৮) রপ্তানিকারকরা চামড়ার গুণাগুণ নির্ণয় করতে শুরু করে।

এ সময় যেসব চামড়াজাত দ্রব্য সামগ্রী পূর্ববাংলায় তৈরি হতো সেগুলো বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে নিম্নে দেখানো হলো —

১. চামড়ার ট্রাঙ্ক, সুটকেস এবং অ্যাটাসি কেস (দলিলপত্র ও কাগজপত্র রাখার ব্যাগ)।

Dhaka University Institutional Repository

২. ব্রিফকেস (নথি বা কাগজপত্র বহনের ব্যাগ), পোর্ট ফোলিও (আলগা কাগজপত্র, দলিল, চিত্র ইত্যাদি রাখার জন্য সমতল আধার বিশেষ), টাইপরাইটার রাখার ব্যাগ, ক্যামেরা রাখার ব্যাগ, কলার, টাই এবং রুমাল রাখার বাক্স, টুপি রাখার ব্যাগ (হ্যাট কেস), জুতা রাখার ব্যাগ (সু কেস), থার্মোফ্লাস্ক কেস, গ্রামোফোন রেকর্ড কেস, Bletters, স্টেশনারি রেক (লেখার বস্তু বা জিনিসপত্র রাখার বাক্স), রাইটিং কেস (লেখার সাজসরঞ্জাম রাখার জন্য ছোট বাক্স বিশেষ), মেডিকেল কেস ইত্যাদি।

৩. ফেন্সি লেদার গুডস (শখের চামড়াজাত দ্রব্য) : মানিব্যাগ (Purses), নোট কেস, তাস রাখার ব্যাগ (Card Cases for Railway Passes), চশমা রাখার ব্যাগ (Spectale Cases), চুরট এবং সিগারেট রাখার ব্যাগ (Cigar and Cigarette Cases) ইত্যাদি।

৪. মেয়েদের হাত ব্যাগ (Lady's Hand Bags)।

৫. কোমরবন্ধ (Waist Belt), হাতঘড়ির ফিতা (Wrist Watch), এবং চামড়া ফিতা (Straps)।

৬. চামড়াজাত খেলার দ্রব্য : ফুটবল।

৭. শিল্পজাত দ্রব্য : চামড়ার চাবুক (Leather Belting). চামড়ার ফিতা (Leather Straps), ওয়াসার বা চামড়ার ছোট চ্যাপটা আংটি (Washer), ঢালাই কাজের জন্য চামড়ার দস্তানা (Welder's Gloves), চামড়ার পাম্প বালতি।

৮. চামড়াজাত রেলওয়ে দ্রব্য : অক্ষদণ্ড (Axle Box), যন্ত্রপাতিতে সংরক্ষণমূলক চামড়ার ফলক (Dust Shields), ক্যাশ ব্যাগ (Cash Bags), চামড়ার ফিতা (Leather straps required for making pouches ford line clear tokens)।

৯. পোস্ট অফিসের দ্রব্য : পোস্টাল পিয়ন ব্যাগ (Postal Peon Bags), ক্যাশ ব্যাগ।

১০. হার্নিস (Harnese) ঘোড়াকে গাড়ির সঙ্গে জুড়ে দেয়া এবং তাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যাবতীয় চামড়ার সরঞ্জাম এবং পর্যাণকার কর্তৃক প্রস্তুত সামগ্রী (Saddlery)।

১১. কর্মকারের হাপর (Smith's Bellows), Bnisties Mushaks ইত্যাদি।

উপরের এই চামড়াজাত দ্রব্যের শ্রেণিবিন্যাস থেকে বুঝা যায় যে, পূর্ববাংলায় তখন চামড়ার ব্যাপক চাহিদা ছিল।

১৯৫০ সালে চামড়ার বার্ষিক উৎপাদন ছিল ৪৬ লক্ষ টুকরো। এরমধ্যে ১৬ লক্ষ ছিল ছাগলের চামড়া।[১৯] এই সময় ঢাকার বাজারে প্রতিটি নিকৃষ্ট শ্রেণির ছাগলের চামড়ার মূল্য ছিল পিসপ্রতি ১ টাকা সাড়ে ১৫ আনা হতে ২ টাকা সাড়ে ১৫ আনার মধ্যে। আর উৎকৃষ্ট শ্রেণির মূল্য ছিল পিসপ্রতি ৩ টাকা ৫ পয়সা হতে ৩ টাকা ৫ আনার মধ্যে। অন্যদিকে গো-মহিষের চামড়ার মূল্য ছিল, মাদ্রাজ কোয়ালিটির পিসপ্রতি ১ টাকা ১৪ আনা থেকে ৩ টাকা ৪ আনা। আর উৎকৃষ্ট শ্রেণির চামড়ার মূল্য ছিল ৩ টাকা ৮ আনা থেকে ৪ টাকা ৫ আনার মধ্যে।[২০] *(১৯৫৩ সালের চামড়ার প্রতিদিনের দাম পরিশিষ্ট-১ এ দেখুন)।*

এই সময় (১৯৫০) ট্যানারি ও জুতা কারখানার যে মাসিক উৎপাদন ছিল তা হলো[২১]—

- জুতার উপরের চামড়া (Shoe Upper Leather) – ৩৭০০ গরুর চামড়া;
- জুতার তলি (Shoe Leather) – ২০০ মহিষের চামড়া;
- লবণ চামড়া (East Bengal Kips) – ৫০০ গরুর চামড়া;
- জুতা (Shoe) ৫০০০ জোড়া।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫০ সালে ট্যানারি ও জুতা তৈরি কারখানা ছিল অপর্যাপ্ত। ফলে এদেশের ও পশ্চিম পাকিস্তানের অবাঙালি কিছু শিল্পপতি এ সময় এগিয়ে আসে। ঢাকার পশ্চিম প্রান্তে হাজারিবাগ এলাকায় প্রায় ৫০ একর জমির উপর ট্যানারি ও জুতা তৈরির কারখানার উদ্যোগ নেয়া হয়। এর মধ্যে ট্যানারির জন্য প্রায় ২০ একর। তৎকালীন সরকার ট্যানার, জুতা প্রস্তুতকারকদের প্রশিক্ষণ ও ছাত্রদের গবেষণার সুযোগ সুবিধা দিয়ে দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য ১৯৫০ সালের জুন মাসে ট্যানিং ইনস্টিটিউটের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।[২২] এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল—

১. চামড়া ট্যানিংয়ের জন্য পূর্ব পাকিস্তানে পাওয়া যায় এমন দেশীয় উপাদান দিয়ে চামড়া ট্যান করা যায় তার উপরে গবেষণা করা এবং চামড়া ব্যবসায় এগুলো ব্যবহার করা (To carry on research with the indigenous tanning materials available in East Pakistan and their uses in the leather trade)

২. বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে ব্যবসাকে কার্যকর করা। (To act as consultant to the trade)

৩. ট্যানারি শিল্পের উন্নয়নের জন্য টেকনিশিয়ান তৈরি করা (To produce the technicians for the growing tanning industries)।[২২ক]

১৯৫৪ সালে ঢাকা শহরে যে কয়েকটি ট্যানারি ছিল সেগুলো হলো[২৩] —

সারণি-৩

ক্রমিক	নাম	ঠিকানা
১.	এইচ. বি. ট্যানারিজ (H. B. Tanneries)	১১৯, হাজারিবাগ, পিলখানা, ঢাকা
২.	তাজ ট্যানারি (Taj Tannery)	১৩৮, হাজারিবাগ, পিলখানা, ঢাকা
৩.	ওরিয়েন্ট ট্যানারি (Orient Tannery)	হাজারিবাগ, পিলখানা, ঢাকা
৪.	পাকিস্তান ট্যানারি (Pakistan Tannery)	হাজারিবাগ, পিলখানা, ঢাকা
৫.	এস.এন. এ. ট্যানারি (S.N.A. Tannery)	৪৮, মনেশ্বর রোড, হাজারিবাগ, ঢাকা
৬.	ঢাকা ট্যানারি (Dacca Tannery)	হাজারিবাগ, ঢাকা
৭.	ইস্ট পাকিস্তান ক্রোম ট্যানারি (East Pakistan Chrome Tannery)	ট্যানারবাগ, গজমহল, হাজারিবাগ, ঢাকা
৮.	দিলখুশা ট্যানারি (Dilkhusha Tannery)	ঐ
৯.	ওমর ট্যানারি (Omer Tannery)	ঐ
১০.	সলিমার লেদার করপোরেশন (Salimar Learther Corporation)	ঐ
১১.	ইস্ট বেঙ্গল ট্যানারি (East Bengal Tannery)	ঐ
১২.	ইস্ট ওয়েস্ট পাকিস্তান ট্যানারি (East West Pakistan Tannery)	৪৬, মনেশ্বর রোড, পিলখানা, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫৬ সালের ঢাকার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ট্যানারির বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা, ব্যবহৃত শক্তি এবং প্রতিদিন গড় শ্রমিকদের সংখ্যার একটি হিসাব দেয়া হলো —

সারণি-৪

ক্রমিক নং	নাম ও ঠিকানা	ব্যবহৃত শক্তি	বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা	শ্রমিকদের সংখ্যা (গড়ে প্রতিদিন)
১.	ওরিয়েন্ট ট্যানারি কোং, হাজারিবাগ রোড, ঢাকা	স্টিম অয়েল এবং ইলেকট্রিসিটি	৬০,০০০ টুকরো	২৫ জন
২.	ঢাকা ট্যানারিজ লিমিটেড, আরমানিটোলা, ঢাকা	ইলেকট্রিসিটি এবং স্টিম	১০,২৪০০০ lbs	১৪২ জন
৩.	পাকিস্তান ট্যানারি, হাজারিবাগ, ঢাকা	অয়েল ইঞ্জিন	৩০,০০০ ছাগলের চামড়া এবং ২০,০০০ চামড়া	২০ জন
৪.	এস. এন. এ. ট্যানারি, ৪৮, মনেশ্বর রোড, হাজারিবাগ, ঢাকা	ডিজেল ইঞ্জিন	প্রতিদিন ৫০ থেকে ১০০ টুকরো	২৪ জন
৫.	সলিমার লেদার করপোরেশন, হাজারিবাগ, ঢাকা	পেট্রোল	১,৮০,০০০ টুকরো	১৫ জন
৬.	সাদী ট্যানারি, পোস্তগোলা, ঢাকা	ডিজেল	২,০০,০০০ রুপি	৪৫ জন
৭.	ওমর ট্যানারি, ৭ মিটফোর্ট রোড, ঢাকা	ঐ	২,৭০,০০০ টুকরো	৪০ জন
৮.	তাজ ট্যানারি, হাজারিবাগ, ঢাকা	ঐ	৩৩,১৪২ টুকরো	২০ জন
৯.	এইচ. বি. ট্যানারি, হাজারিবাগ, ঢাকা	ঐ	৩,০০০ ছাগলের চামড়া এবং ১,০০০ গরুর চামড়া	১৪ জন
১০.	দিলখুশা ট্যানারি, ১ পোস্তা, ঢাকা	ঐ	১,৫৭,৫০০ টুকরো	৩০ জন
১১.	কুরশি ট্যানারি, হাজারিবাগ, ঢাকা	ইলেকট্রিসিটি	-	-
১২.	ইস্ট এ্যান্ড ওয়েস্ট পাকিস্তান ট্যানারি, হাজারিবাগ, ঢাকা	ঐ	২০,০০০ টুকরো	১৩ জন
১৩.	রহমান ট্যানারি, ঢাকা	পেট্রোল	৬০,০০,০০০ রুপি	২৫ জন

উৎস : *Statistcal Abstract for East Pakistan*, Vol. IV, 1958, pp. 260-290.

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬০-এর দশকে ঢাকার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ট্যানারির উৎপাদন ক্ষমতা দেয়া হলো —

সারণি-৫

ক্রমিক নং	ট্যানারির নাম	স্থান	ক্রোম (Sq.ft)	জুতার তলি (সোল)	ছাগলের চামড়া (kids lbs.)
১.	আজিজ ট্যানারিজ	ঢাকা (Dacca)	৩,৬০,০০০	১১২,০০০	১,২৬,০০০
২.	চাইনিজ লেদার	ঐ	৩,৬০,০০০	-	-
৩.	ঢাকা ট্যানারিজ	ঐ	৭,২০,০০০	৩,৭৫,০০০	৭৫,০০০
৪.	ইস্ট পাকিস্তান ক্রোম ট্যানারি	ঐ	৭,২০,০০০	১,৮৭,০০০	৭২,০০০
৫.	ইস্ট এ্যান্ড ওয়েস্ট পাকিস্তান ট্যানারি	ঐ	২৭,০০০ (Suade [*sic*])	-	-
৬.	দিলখুশা ট্যানারি	ঐ	৩,৬০,০০০	৯০,০০০	১০,৮০০
৭.	ইনাম ট্যানারি	ঐ	-	৫৪,০০০ ১০,০০০ (Sheep)	৭২,০০০
৮.	ওরিয়েন্ট ট্যানারি	ঐ	২,৭০,০০০	৩৭,০০০	-
৯.	এস.এন.এ. ট্যানারি	ঐ	১,৩৫,০০০ (Suade [*sic*]) ১৫,৭০০ (Chamois)	১,৩৫,০০০ (Glace kit [*sic*]) ২৭,০০০ (Reptiles)	-
১০.	সলিমার লেদার করপোরেশন	ঐ	৯০,০০০ (Suade [*sic*])	-	-
১১.	তাজ ট্যানারি	ঐ	১,৬৮,০০০	-	-
১২.	ওমর ট্যানারি	ঐ	৩,৬০,০০০	-	১,৮০,০০০
১৩.	ফেরদৌস ট্যানারি	ঐ	৩,৬০,০০০	১,৬৫,০০০	১,৮০,০০০

উৎস : S.N.H Rizvi, *East Pakistan District Gazetteers*, *Dacca*, East Pakistan Govt. Press, Dacca, 1969, p. 206.

Dhaka University Institutional Repository

উপরে উল্লিখিত পাকিস্তান আমলের বিভিন্ন ট্যানারির মালিকের নাম ও বর্তমান মালিকের নাম নিম্নে দেয়া হলো —

সারণি-৬

Sl. No.	Name of Tannery	Owner Name	Present Owner
1.	Aziz Tannery	আব্দুল আজিজ (বাঙালি)	-
2.	Chineses Tannery	চাইনিজ (বর্তমান চলমান)	আব্দুল কাদের (বাঙালি দ্বারা পরিচালিত)
3.	Dacca Tanneries	আর পি সাহা ও খান বাহাদুর শামসুদ্দাহা (নারায়ণগঞ্জ)	নূরুল হুদা। ঢাকা (চলমান)
4.	East Pakistan Chrome Tannery	ওসমান সাহেব (অবাঙালি)	২টি ভাগে Dhaka Hide and Leather Corporation
5.	East and West Pakistan Tannery	(পাওয়া যায় নি)	-
6.	Dilkhusha Tannery	ধন্নুশা (অবাঙালি, চলমান)	Lexco
7.	Inam Tannery	ইনামদার (অবাঙালি)	B. S. Leather
8.	Orient Tannery	ইলিয়াস সাহেব (অবাঙালি ভারতীয় মায়মন)	-
9.	S.N.A. Tannery	মাজহার সাহেব (অবাঙালি, পাকিস্তানি)	Crescent and Ayub Brothers
10	Salimar Leather Corpoation	-	-
11.	Taj Tannery	মুজিবুর রহমান (অবাঙালি, ভারতীয়) চলমান	Taj Tennery
12.	Omer Tannery	ওমর আলী (অবাঙালি,পাকিস্তানি) চলমান	Apex Tannery
13.	Firdous Tannery	হানিব সাহেব (পাকিস্তানি-অবাঙালি, চলমান)	শাহজালাল Leather Tannery
14.	H. B Tannery	হাবিবুর রহমান (ভারতীয় অবাঙালি, চলমান)	স্থানীয়ভাবে H. B Tannery নামে পরিচিত। আন্তর্জাতিক বাজারে H & H Leather Industry Tannery নামে পরিচিত।

উৎস : সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে আকবর হোসেন (৫৭), মালিক Paramount Tannery, 145 Hazaribagh. আড়ত : হাজি আওলাদ হোসেন এ্যান্ড সন্স, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ০৩.০৭.২০১১ আব্দুল হাই (৭০) সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ টেনার্স এসোসিয়েশন, ২০.৯.১১

Dhaka University Institutional Repository

উপরে উল্লিখিত ট্যানারি ছাড়াও আইয়ুব ব্রাদার্স নামে আরেকটি ট্যানারি ছিল, যা ৬৯, হাজারিবাগে প্রতিষ্ঠিত হয়। ট্যানারির নাম Gazetteer না আসার কারণ হিসেবে এই ট্যানারির মালিকের ছেলে হারুন-অর-রশিদ (বর্তমানে Lexco Tannery, MD) উল্লেখ করেন যে, পাকিস্তান সরকার লাইসেন্স দেয় নি।[২৪]

আইয়ুব ব্রাদার্স : আবু মুসা ও আব্দুল মতিন ১৯৫৮ সালে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। তখন এই ট্যানারি ক্ষুদ্র পরিসরে ছিল। কোনো আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হতো না। পাকিস্তান আমলে এই ট্যানারিতে ৭-৮ জন লোক কাজ করত।

পাকিস্তানিদের সাথে প্রতিযোগিতা করে তাদেরকে ব্যবসা করতে হতো। পাকিস্তান আমলে তারা কোনো আমদানি-রপ্তানি করত না। ফলে তারা শুধু কাঁচামাল বিক্রি করত। অনেক সময় তারা কাঁচামালের পুরো টাকাটাও পেত না। আর পাকিস্তানিরা করাচি থেকে এই চামড়া পাকা বা ফিনিসড লেদার করে অন্যান্য দেশে রপ্তানি করত এবং অনেক লাভ করত। কিন্তু লাভের পুরো অংশটা তারাই ভোগ করত। আর এসব বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়েই আইয়ুব ব্রাদার্স-এর জন্ম হয়।

পরবর্তীতে আবার আইয়ুব ব্রাদার্স-এর প্রতিষ্ঠাতারা দিলখুশা ট্যানারি কিনে নেয়। তবে এটি আইয়ুব ব্রাদার্স থেকে আলাদা ছিল। দিলখুশা ট্যানারি ছিল পাকিস্তান আমলের সবচেয়ে বড় ট্যানারি। এটি ৬ বিঘা জমির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১৯৭৮ সালে বিসিক থেকে নিলামে চলে যায়। নিলাম ওঠার পরে আইয়ুব ব্রাদার্স ৫৩ লক্ষ টাকায় এই ট্যানারি কিনে নেয়। ব্যাংক লোন না নিলেও ৫ বছরের কিস্তিতে কিনে নেয়। ১৯৭৯ সালে মেশিন কেনার জন্য এলসি খোলা হয়। এই ট্যানারির যন্ত্রপাতি ইটালি থেকে কেনা হয়। Economic Council-এ LC পাশ করার পর শিল্প ব্যাংক ঋণ দেয়। তবে এই ঋণ নগদ অর্থে দেয়া হয় নি। এটি মূলত এলসি খোলার ব্যাপারে অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়।

এরপর শিল্প ব্যাংক Construction করার জন্য প্রায় ২ কোটি টাকার ঋণ দেয়।

পরবর্তীতে এই ট্যানারিকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত করা হয়। কেননা ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়া সবসময় সম্ভব ছিল না। ফলে জনগণের কাছ থেকে টাকা নেয়ার জন্য শেয়ার ছাড়া হয়। ২ কোটি টাকার শেয়ারের মধ্যে ৫০% আইডিবি (ইসলামিক ডেভোলপমেন্ট ব্যাংক) থেকে লোন নেয়া এবং ৫০% শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করা হয়। আর এই পুরো টাকাটাই কাজে লাগানো হয়। এভাবেই Lexco Public Limited Company-র যাত্রা। এটি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় এবং আধুনিক ট্যানারি। এটি বাংলাদেশের ট্যানিং ফ্যাক্টরির পথ প্রদর্শক হিসেবে সমৃদ্ধি লাভ করে। এটি ১০০% চামড়া রপ্তানিকারক একটি লেদার ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশে আধুনিক ট্যানারি প্রতিষ্ঠার পেছনে যার সবচেয়ে বড় অবদান তিনি হলেন ফ্রান্সের জন সডরেট। তিনি ফ্রান্সের বনাফিল্ড কোম্পানির রিপ্রেজেনটিভ ছিলেন। তিনি আইয়ুব ব্রাদার্সের প্রতিষ্ঠাতা আব্দুল মতিন ও আবু মুসাকে আধুনিক ট্যানারি গড়ে তোলার ব্যাপারে সহায়তা করেন। এই কারণে তাকে আধুনিক ট্যানারির জনক (Father of modern Tannnery) বলা হয়।[২৫]

Dhaka University Institutional Repository

Lexco Tannnery-এর বর্তমান মূলধনের গঠন প্রক্রিয়া দেয়া হলো (The present capital structure) :

1. Authorised capital US$ 6.25 million
2. Paid up capital US$ 0.95 million
3. Sponsors/ Directors US$ 3,35,000 (share holding 35.2 1%)
4. Islamic Development Bank, Jeddah- US$ 1,20,000 (share holding 12.50%)
5. General public - US$ 95,000 (share holding 52.29%)

Liabilities

Bank loan, sundry creditors & others US$ 10 million

Good will

Including local & International US$ 15 million

Production capacity

Full Finished leather - Annual 1,80,00,000 sft.(@ 15,00,000 sft. per month)

উৎস : Lexco Limited.

বর্তমানে আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে চামড়া পাকাকরণ করা হলেও পাকিস্তান আমলে তথা বর্তমান অভিসন্দর্ভের আলোচ্য সময়ে চামড়াকে কেবল রোদে শুকিয়ে শক্ত করা হতো। এরপর ব্রাশ দিয়ে চামড়ার উপর রং করা হতো। রং করার পরে চামড়াকে চারটি ভাঁজ করে একটির উপর একটি রেখে কাঠের বাক্সে ঢুকানো হতো। এই কাঠের বাক্স করেই চামড়া প্রথমে পশ্চিম পাকিস্তানের করাচিতে এবং পরে বিভিন্ন দেশে পাঠানো হতো। পাকিস্তান আমলে ট্যানারিগুলোতে কোনো বাঙালি কাজ করত না। তবে বাঙালিদের শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হতো। পাকিস্তান আমলে চামড়া ট্যানিংয়ের ক্ষেত্রে পাকিস্তানি ও চাইনিজদের আধিপত্য ছিল। দেশ স্বাধীনের পর এরা বিতাড়িত হয়।[২৬]

সুতরাং দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, বর্তমানে আধুনিক পদ্ধতিতে চামড়া ট্যান করা হলেও পাকিস্তান আমেল এই প্রক্রিয়া ছিল না। অপরদিকে ব্রিটিশ আমলে তথা বর্তমান অভিসন্দর্ভের আলোচ্য সময়ের শুরুর (১৯২১) দিকে পূর্ববাংলার চামড়া কেবল খারি লবণ দিয়ে কলকাতায় পাঠাত।

Paramaunt Tannery-র মালিক আকবর হোসেন উল্লেখ করেন যে, ব্রিটিশ আমলে ট্রেনে করে চামড়া কলকাতায় পাঠানো হতো। প্রথমে চামড়া নৌকা করে গোয়ালন্দ থেকে নারায়ণগঞ্জ আনা হতো। এরপর নারায়ণগঞ্জ থেকে কলকাতায় ট্রেনে করে পাঠানো হতো। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, পাকিস্তান আমলে ইঞ্জিন ছাড়া কাঠের নৌকা করে দেশের

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন অঞ্চল থেকে চামড়া সংগ্রহ করে ঢাকায় আনা হতো। তখন চামড়া ঢাকায় পৌঁছাতে দীর্ঘ সময় লেগে যেত। উত্তর বঙ্গ থেকে চামড়া আসতে প্রায় ১২-১৪ দিন লাগত। দক্ষিণ বঙ্গ থেকে আসতে লাগত প্রায় ৮-১০ দিন।[২৭]

১৯৬০-এর দশকে ঢাকা শহরে ২৫টি ট্যানারি ছিল।[২৮] এসব ট্যানারিতে উৎপাদিত দ্রব্য বিপুল পরিমাণে পশ্চিম পাকিস্তান এবং বিদেশে পাঠানো হতো। অল্প পরিমাণে স্থানীয় (দেশীয়) চাহিদার জন্য রাখা হতো।

বাংলাদেশ কলেজ অব লেদার টেকনোলজির টেকনেশিয়ান নুর মোহাম্মদ (৬০) বলেন, পাকিস্তান আমলে ট্যানারির বাঙালি-পাকিস্তানি মালিকরা পোস্তার আড়তদারদের কাছ থেকে চামড়া কিনে আনতেন। তারপর চামড়াকে চৌবাচ্চার ভিতর পা দিয়ে মাড়িয়ে চামড়া ট্যান করা হতো। এই সময় কোনো কেমিক্যাল, যন্ত্রপাতি ও ড্রাম ব্যবহার করা হতো না। হাত ও পা দিয়ে চামড়াকে ট্যান করা হতো। পাকিস্তান আমলে ফিনিসড ক্রোম লেদারের ক্ষেত্রে যেসব উপাদান ব্যবহার করা হতো তাহলো —

১. গ্লিসারিন (Glycerine) ;
২. সিলেক (Shellac);
৩. ফর্মিক এসিড (Formic Acid);
৪. ফর্মা ডিহাইড (Forma de-hyde);
৫. কেজিন (Casine);
৬. গ্লেজি (Glassy)।

উপর্যুক্ত উপাদান দিয়ে পেস্ট তৈরি করে তা দিয়ে চামড়াকে ফিনিসড করা হতো। এছাড়া পাকিস্তান আমলে চামড়াকে ডাই এবং স্যান্ডিং করা হতো এবং Sole Leather তৈরি হতো।

উল্লেখ্য পাকিস্তান আমলে ঢাকার ট্যানারিগুলো নিজেরা Chrome তৈরি করত। আর ক্রোম তৈরির জন্য যেসব উপাদান ব্যবহার করা হতো সেগুলো হলো —

১. পটাশ, ২. চিটা গুড়, ৩. কাঠের গুঁড়া, ৪. সালফিউরিক এসিড।

পাকিস্তান আমলে চামড়াকে যেভাবে প্রক্রিয়াকরণ করা হতো —

ক. Curing করা হতো সাধারণ লবণ (সামুদ্রিক লবণ) দিয়ে।
খ. Liming করা হতো : Pit paddle (গামলা), এর মধ্যে বাঁশের লাঠি, চিমটা দিয়ে এবং পা দিয়ে।
গ. De-liming করা হতো ময়দার ভুসি দিয়ে।
ঘ. Bating করা হতো চামড়ার ফেলে দেয়া ঝিল্লি দিয়ে। মাটির বড় হাড়িতে ঝিল্লিগুলোকে পচানো হতো। এই পচানো পানি দিয়ে Bating করা হতো।
ঙ. Pickling করা হতো দ্রবীভূত লবণ পানির ভিতর এসিড (সালফিউরিক এসিড) দিয়ে।

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান আমলে চামড়া প্রক্রিয়াকরণে কোনো safty materials ব্যবহার করা হতো না। যা বর্তমানে করা হয়। পাকিস্তান আমলে চামড়াকে ওয়েট ব্লু করার পর রোদে শুকানো হতো। পরে এটিকে ফিনিসড চামড়া করে রপ্তানি করা হতো। সাধারণত চায়না, তাইওয়ান, হংকং রপ্তানি হতো। পাকিস্তান আমলে চামড়ার যে গ্রেডিং সিস্টেম ছিল তা ১-৮ পর্যন্ত। বর্তমানে এ-জেড। ১-৪ পর্যন্ত চীন ও তাইওয়ানে রপ্তানি করা হতো।

পাকিস্তান আমলে ধারণার উপর ভিত্তি করে চামড়া গ্রেড করা হতো। নূর মোহাম্মদ সাহেব উল্লেখ করেন যে, চট্টগ্রামে ভালোভাবে চামড়া ফিনিসড করা হতো না। কেননা চট্টগ্রামে পানি লবণাক্ত ছিল। ফলে নোয়াখালী ও ফেনি থেকে পানি নেয়া হতো। ঢাকায় চামড়া ফিনিস করার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ ছিল।

তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, পাকিস্তান আমলে যে বাটা সু কোম্পানি গড়ে ওঠে তা মূলত এদেশ থেকে চামড়া নিয়ে ভারত, ইংল্যান্ড থেকে ট্যান করে আনা হতো। তারপর এদেশে জুতা তৈরি করা হতো। এই সময় বাটা কোম্পানির নিজস্ব কোনো ট্যানারি ছিল না।

পাক লেদার এন্ড সু ফ্যাক্টরি নামে আরেকটি জুতা ফ্যাক্টরি ছিল। এটি তেজগাঁও অবস্থিত ছিল। পরবর্তীতে ফতুল্লায় স্থানান্তর করা হয়। এই ফ্যাক্টরিতে মূলত আর্মি বুট তৈরি করা হতো।[২৮ক]

চামড়া ব্যবসার সাথে ট্যানারি শিল্পের যোগসূত্র ছিল। কেননা ট্যানারি ছাড়া চামড়া শিল্প বা চামড়া ব্যবসা সম্ভব হতো না। বস্তুত চামড়া ব্যবসাকে কেন্দ্র করে ট্যানারি শিল্প গড়ে ওঠে। চামড়া শিল্পের পরিপূর্ণ রূপ দেয়ার জন্য বা সফল করার জন্য এবং চামড়া ব্যবসাকে আরো বিস্তৃত করার জন্য বা আধুনিক করার জন্য ট্যানারি শিল্প দরকার। তাই চামড়া ব্যবসা ও ট্যানারি শিল্প একে ওপরের সাথে জড়িত। আলোচ্য সময়ে ট্যানারি শিল্প কুটির শিল্প পর্যায়ে ছিল। তাই চামড়া ব্যবসা ও ট্যানারিকে ঢাকার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কুটির শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রীর ব্যবসার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

১৯৫২ সালের ৯ এপ্রিল The Provincial Advisory Committe-তে বলা হয় যে, পূর্ববাংলার ট্যানারিগুলো সবধরনের চামড়া (গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া) ট্যান করতে সক্ষম।

১৯৫২ সালের সরকারি নথিপত্রে থেকে জানা যায় যে, পূর্ববাংলায় যেখানে ২৪ লক্ষ জোড়া জুতা উৎপাদন করা প্রয়োজন সেখানে বার্ষিক উৎপাদন ছিল ১৫ লক্ষ জোড়া। চামড়ার জুতা প্রধানত শহরে এবং উত্তর বাংলার জেলাগুলোতে ব্যবহৃত হতো। ঘাটতি ৯ লক্ষ জোড়া জুতা করাচি, হায়দ্রাবাদ থেকে ডাকযোগে আসত। একই সময়ে চামড়ার কাপড় (kining leather) পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসত। অন্যদিকে ক্রোমিয়াম চামড়ার বেশিরভাগ পূর্ববাংলা থেকে করাচিতে আকাশ পথে পাঠানো হতো। অথচ ২৪ লক্ষ জুতা তৈরির জন্য ২.৫ লক্ষ টুকরো ক্রোমিয়াম চামড়ার দরকার ছিল। কিন্তু ২ লক্ষ ক্রোমিয়াম চামড়ার বেশিরভাগ পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যেত। এরফলে পূর্ববাংলার স্থানীয় জুতা কারখানাগুলোকে ভারত থেকে আমদানিকৃত চামড়ার উপর নির্ভর করতে হতো।[২৯]

উপরের তথ্যের আলোকে বলা যায় যে, চাহিদা অনুযায়ী যতটুকু উৎপাদিত হতো তার প্রায় সবটাই পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠানো হতো। ফলে স্থানীয় জুতা প্রস্তুতকারকদেরকে আমদানিকৃত চামড়ার উপর নির্ভর করতে হতো। পূর্ববাংলার চামড়া দিয়ে জুতা প্রস্তুত করে

Dhaka University Institutional Repository

এদেশের তথা ঢাকার জুতা ব্যবসায়ীদের কাছে অধিক মূল্যে বিক্রি করত। ফলে দেখা যাচ্ছে ইংরেজরা পূর্বে যেভাবে এদেশকে কাঁচামালের উৎস এবং তাদের প্রস্তুতকৃত দ্রব্যের বাজার করতে চেয়েছিল, ঠিক তেমনি পাকিস্তানি শাসকও পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করতে চেয়েছিল। কেননা ঢাকার চামড়ার মান ভারতীয় চামড়ার চেয়ে ভালো ছিল। পৃথিবী জুড়ে এর সুনাম ছিল। যা ঐ সময়ের পত্রিকা *'দৈনিক আজাদ'*-এ ওবায়দুল হক-এর "পূর্ব পাকিস্তানের চর্ম্মশিল্প" শীর্ষক লেখা থেকে জানা যায়। তিনি তাঁর লেখায় উল্লেখ করেছেন, "দুনিয়ার বাজারে ঢাকার অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের চামড়ার একটা সুনাম বরাবরই চলিয়া আসিতেছে। কলিকাতার চর্ম্ম ব্যবসায়ীগণের গুদামে ঢাকাই চামড়া যাচাই শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। এখন আমরা যদি এই অমূল্য সম্পদটির কেবল রপ্তানির উপর নির্ভর না করিয়া শিল্পায়িতকরণে মনোযোগী হই তাহা হইলে একদিকে যেমন দেশের জনসাধারণের মধ্যে কুটির শিল্পের প্রসারতা লাভ করিবে, অন্যদিকে আমাদের রাষ্ট্রটিরও শ্রীবৃদ্ধি হইবে।"[৩০]

১৯৫০ সালে পাকিস্তান সরকার কাঁচা চামড়ার উপর বিক্রয় কর ধার্য করেছিল। তবে লাইসেন্সধারী পাকা চামড়ার ব্যবসায়ীদেরকে কোনো বিক্রয় কর দিতে হতো না। যা *'দৈনিক আজাদ'* পত্রিকা থেকে জানা যায়।

"পাকিস্তান সরকারের এক প্রেস নোটে প্রকাশ গবাদি পশুর কাঁচা চামড়ার উপর কর ধার্য করিয়া একটি আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে। উক্ত আইন অনুসারে পাকিস্তানে চামড়া ব্যবসায়ীদিগকে কোনো পাকিস্তানি ট্যানারের নিকট চামড়া ক্রয় করিবার সময় বিক্রয়কর প্রদান করিতে হইবে।

চামড়ার বিক্রয় মূল্যের ভিত্তিতে ট্যানারকে উক্ত বিক্রয় কর দিতে হইবে। যথারীতি লাইসেন্সধারী চামড়া ব্যবসায়ীদিগকে অন্য কোনো ক্ষেত্রে বিক্রয় কর দিতে হইবে না। লাইসেন্সধারী পাকা চামড়ার ব্যবসায়ীদিগকেও কোনো বিক্রয় কর দিতে হইবে না।"[৩১]

১৯৫৯ ও ১৯৬০ সালের ঢাকার চামড়ার পাইকারি মূল্য সম্পর্কেও জানা যায়।[৩২]

সারণি-৭

Hides (চামড়া)	বাজার	পরিমাণ	জুন ১৯৬০	জুন ১৯৫৯
			রুপি-আনা-পাই	রুপি-আনা-পাই
শুকনো লবণ (গরু) চামড়া Dry salted (Cow)	ঢাকা	১০০ lbs	১৩১-৪-০	৪৪-১৫-০
শুকনো লবণ (মহিষ) চামড়া Dry salted (Baffallo)	ঢাকা	১০০ lbs	৯৭-০-০	৬৭-০-০
Skins (চামড়া)				
ছাগলের চামড়া	ঢাকা	১০০ টুকরো	৫০৭-০-০	৪৭৩-১২-০

Dhaka University Institutional Repository

উল্লিখিত হিসাবে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, ১৯৫৯ সালের চেয়ে ১৯৬০ সালে চামড়ার মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। যা চামড়া ব্যবসার জন্য একটি ইতিবাচক দিক ছিল।

অনুরূপভাবে আরো দেখা যায় যে, ১৯৬০ সালে পূর্ব পাকিস্তান তথা ঢাকা পশ্চিম পাকিস্তানে ১৫৫২ হাজার রুপির পাকা চামড়া এবং ১২৫ হাজার রুপির কাঁচা চামড়া রপ্তানি করে।[৩৩]

১৯৫১-৫২ থেকে ১৯৬১-৬২ সালের পাকিস্তানের চামড়া রপ্তানির তালিকা দেয়া হলো —

সারণি-৮

(হাজার রুপির)

সাল	কাঁচা চামড়া	পাকা চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য
১৯৫১-৫২	৩৩,২১০ রুপি	১৩ রুপি
১৯৫২-৫৩	৩৬,৭৫৫ রুপি	৮৩ রুপি
১৯৫৩-৫৪	৩৭,৭৪৫ রুপি	৩৫ রুপি
১৯৫৪-৫৫	২৭,৯৮০ রুপি	২৯৮ রুপি
১৯৫৫-৫৬	৩৮,৭১৭ রুপি	১,২৭৯ রুপি
১৯৫৬-৫৭	৪৩,৮৩৩ রুপি	২,৬৩০ রুপি
১৯৫৭-৫৮	৩৩,০৪৮ রুপি	২,৬৬৪ রুপি
১৯৫৮-৫৯	৫০,২৮৯ রুপি	৩,৪১৬ রুপি
১৯৫৯-৬০	৮২,৮৩২ রুপি	১৫,১৮৭ রুপি
১৯৬০-৬১	৫৩,২৬০ রুপি	১০,৪০৩ রুপি
১৯৬১-৬২	৬২,৪১৭ রুপি	১৭,৩৭৯ রুপি

উৎস : *Statistical Yearbook of Pakistan,* 1962 and the C.S.O. Statistical Bulletins for Jan, 61 and Jan, 62, উদ্ধৃত, *A Strategy of Export Promotion for Pakistan,* Table : 3, 1963, p. 14.

রপ্তানির আরো একটি তালিকা পাওয়া যায়।

১৯৫৯-৬০ থেকে ১৯৬৭-৬৮ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের চামড়ার বৈদেশিক বাণিজ্য —

সারণি-৯

[লাখ রুপি]

সাল	কাঁচা চামড়া	পাকা চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য
১৯৫৯-৬০	৪০৩	২৩
১৯৬০-৬১	২৮৬	৩৭
১৯৬১-৬২	২৬৬	১১৯

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬২-৬৩	২৬৩	৫৬
১৯৬৩-৬৪	২৫৯	৬৮
১৯৬৪-৬৫	২০০	১২৪
১৯৬৫-৬৬	২৭৮	২৪৮
১৯৬৬-৬৭	৩৮	৫১৮
১৯৬৭-৬৮	২১	৪৩১

উৎস : *Statistical Digest of East Pakistan*, No. 5, 1968, p. 190.

১৯৬৮-৬৯ সালে পশ্চিম পাকিস্তানসহ বিদেশে মোট ১০ কোটি ২২ লাখ ৪৯ হাজার টাকার চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি করা হয়।[৩৪]

আরেকটি উৎস থেকেও চামড়ার রপ্তানিকৃত আয়ের উৎস পাওয়া যায় —

সারণি-১০

মূল্য টাকায়

সাল	মূল্য
১৯৬৬-১৯৬৭	৭৩.৭৮৯ মিলিয়ন
১৯৬৭-১৯৬৮	৬৫.৫৭৯ মিলিয়ন
১৯৬৮-১৯৬৯	১০২.২৪৯ মিলিয়ন
১৯৬৯- ১৯৭০	৮৮.১০০ মিলিয়ন
১৯৭০-১৯৭১	৬১.৪৪৪ মিলিয়ন

উৎস : *The People*, 4 Oct, 1973.

সুতরাং দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, পূর্ববাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানের বা ঢাকার চামড়ার খ্যাতি ছিল বিশ্বজোড়া। পাকিস্তানি শাসনামলে এই চামড়ার উপর নির্ভর করে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে চামড়া শিল্প গড়ে ওঠে। কেননা চামড়া শিল্পের প্রধান কাঁচামাল হলো কাঁচা চামড়া, যা পূর্ব পাকিস্তান তথা ঢাকায় পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যেত। এখানকার গরু ও ছাগলের চামড়া বিশ্বের অন্য যেকোনো দেশের চেয়ে সস্তায় পাওয়া যেত। কারণ সস্তা চামড়া, সস্তা শ্রমিক, অনুকূল জলবায়ু, দক্ষ জনশক্তি রপ্তানিশিল্পের বৃদ্ধির জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। উপরের তালিকা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাচ্ছে যে, সারণি-৮-এ পাকিস্তানে পঞ্চাশ ষাটের দশকে কাঁচা চামড়া ও পাকা চামড়ার রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। অনুরূপভাবে সারণি-৯-এ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, ষাটের দশকের প্রথমদিকে কাঁচা চামড়ার রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও শেষের দিকে হ্রাস পেয়েছিল। পাকা চামড়ার রপ্তানির পরিমাণও হ্রাসের পর্যায়ে ছিল। সারণি-১০-এ একই অবস্থা বিরাজ করছে। অর্থাৎ চামড়া থেকে রপ্তানিকৃত আয় নিয়মিতভাবে হ্রাস পেয়েছিল। এই পতনের প্রধান কারণ ছিল, স্বদেশে চামড়ার চাহিদা বৃদ্ধি। আরেকটি কারণ হলো নিম্নমানের চামড়া। পুরাতন পদ্ধতিতে চামড়া পাকা করা হতো।

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং অভিসন্দর্ভের আলোচ্য সময়ে (১৯২১-৭১) চামড়া শিল্পের যেমন সমৃদ্ধি ছিল তেমনি কিছু সমস্যাও ছিল। এর মধ্যে একটি ছিল ঢাকা তথা দেশের বেশিরভাগ চামড়া প্রকল্প পুরাতন ও সেকেলে। আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত প্রকল্প থাকলেও এখানকার চামড়ার কারখানাগুলোতে কাজ করার পরিবেশ এবং কারখানার অবস্থা চরমভাবে অস্বাস্থ্যকর ছিল। বেশিরভাগ শ্রমিক ছিল অশিক্ষিত, তারা আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে জানত না। কর্মচারীরা সঠিকভাবে দ্রব্যের নকশা করতে পারত না। কখনো কখনো বিদেশ থেকে নমুনা ক্রয় করা হতো। পরবর্তীতে অবশ্য বিসিক এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নেয়।

অন্যান্য সমস্যার মধ্যে আরেকটি সমস্যা হলো কেমিক্যালের স্বল্পতা। এছাড়া নয়মাস মুক্তিযুদ্ধের সময়ে অনেক ট্যানারি পাক-হানাদাররা ধ্বংস করে দেয়। দক্ষ কর্মীদের হত্যা করে এবং চামড়া পাকাকরণ ব্যবস্থাকে ক্ষতি করে। ক্ষতিগ্রস্ত কারখানাগুলোকে মেরামতের জন্য অধিক যন্ত্রাংশের প্রয়োজন, শক্তির অপর্যাপ্ততা এবং ভোল্টেজ (বিদ্যুৎ শক্তির) ওঠানামার ফলে উৎপাদন ব্যাহত এবং কখনও কখনও লোকসানের সম্মুখীন হয়ে কারখানা গুটিয়ে ফেলা হয়। এর ফলে চামড়া ব্যবসায়ও বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ে। এছাড়া পাকিস্তান আমলের একজন প্রাক্তন ব্যাংকার উল্লেখ করেন যে, পাকিস্তান আমলে বড় পরিসরে ট্যানারি না হওয়ার জন্য ২টি কারণ ছিল,

১. পাকিস্তানিরা নিরুৎসাহিত করত।

২. বড় পরিসরে শিল্প গড়ে তুলতে হলে যে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের প্রয়োজন ছিল তা বাঙালির ছিল না।[৩৫]

ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলের কয়েকজন উল্লেখযোগ্য ক্ষুদ্র চামড়া ব্যবসায়ীর নাম দেয়া হলো —

১. আব্দুল আলীম- রয়েল বেঙ্গল টাইগার।

উল্লেখ্য আব্দুল আলীম ছিলেন অবিভক্ত বাংলার প্রথম সবচেয়ে বড় আড়তদার। তার ২৫টি purchase centre ছিল।

পাকিস্তান আমলের ঢাকার উল্লেখযোগ্য কয়েকজন কাঁচা চামড়ার আড়তদারের নাম দেয়া হলো —

সারণি-১১

ক্রমিক	আড়তের নাম	মালিকের নাম
১.	হাজী আওলাদ হোসেন এ্যান্ড সন্স	হাজী আওলাদ হোসেন
২.	হাজী আব্দুল আলীম	হাজী আব্দুল আলীম
৩.	হাজী কাজী ওয়াজউদ্দিন	হাজী কাজী ওয়াজউদ্দিন
৪.	হাজী কাজী মনসুর আহমদ	হাজী কাজী মনসুর আহমদ
৫.	হাজী সালাউদ্দিন	হাজী সালাউদ্দিন
৬.	এস. হুদা এ্যান্ড কোম্পানি	এস. হুদা

Dhaka University Institutional Repository

৭.	হাজী রহমতউল্লাহ	হাজী রহমতউল্লাহ
৮.	হাজী সিরাজউদ্দিন	হাজী সিরাজউদ্দিন
৯.	রাহেলা খাতুন	সারু মিয়া
১০.	হাজী সাজাহান এ্যান্ড কোম্পানি	হাজী সাজাহান
১১.	চান ব্রাদার্স	চান
১২.	হাজী মাজহারুল এ্যান্ড সন্স	হাজী মাজহারুল (মৃত)
১৩.	হাজী নূর হোসেন	হাজী নূর হোসেন "
১৪.	হাজী শামসুদ্দীন	হাজী শামসুদ্দীন "
১৫.	হাজী আব্দুল ওয়াহেদ মিয়া	হাজী আব্দুল ওয়াহেদ মিয়া "
১৬.	হাজী রবীউল্লাহ	হাজী রবীউল্লাহ "
১৭.	হাজী আতীকুল্লাহ এ্যান্ড সন্স	হাজী আতীকুল্লাহ "
১৮.	হাবীবুর রহমান এজেন্সী	হাবীবুর রহমান "
১৯.	শামসুল বদিউল এ্যান্ড সন্স	শামসুল বদিউল "
২০.	হাজী আনিসুর রহমান	হাজী আনিসুর রহমান "

উৎস : সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে, ফয়েজুর রহমান (৭০), আড়তদার, ৭০/১, ওয়াটার ওয়ার্কস, পোস্তা, লালবাগ, ঢাকা, তাং ০৩-০৭-২০১১ ।

উল্লেখ্য যে, উপরের সব আড়তদারের আড়ত বংশাল ও নাজিরাবাজারে ছিল । বর্তমানে তারা কেউ জীবিত নেই । বর্তমানে তাদের সন্তানরা ব্যবসা চালাচ্ছেন । আবার কেউ কেউ ছেড়ে দিয়েছেন । এরা প্রত্যেকে কাঁচা চামড়ার ব্যবসা করতেন ।

বাংলাদেশ ঢাকা ট্যানার্স এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হাই (৭৩) ঢাকার চামড়ার ব্যবসা সম্পর্কে উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশে চামড়া শিল্পের প্রাতিষ্ঠানিক সূচনাকাল গত শতকের ষাটের দশকে । ঐ সময় ঢাকার পশ্চিমাঞ্চলের হাজারিবাগ এবং চট্টগ্রামের চাঁদগাও এলাকায় এদেশের কিছু উৎসাহী বাঙালি উদ্যোক্তা এবং পশ্চিম পাকিস্তান হতে আগত কতিপয় অবাঙালি উদ্যোক্তা এ শিল্পের গোড়াপত্তন করেন । এর পূর্বে এ অঞ্চলে ট্যানারি শিল্প মূলত কলকাতা ভিত্তিক ছিল । কলকাতায় স্থাপিত ট্যানারি শিল্পের কাঁচামালের যোগানদার হিসাবে এখানকার চামড়া সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা পরিচিত ছিলেন ।

পাকিস্তান আমলে বেশিরভাগ ট্যানারি ছিল কুটির শিল্প আকারে । বিশেষ করে যেগুলো বাঙালিরা পরিচালনা করত । এই সময় চামড়াকে গাছের সাথে পিটিয়ে নরম করা হতো । তারপর মাটিতে ফেলে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে টান করে রোদে শুকানো হতো । এরপর ফিনিসড করে জুতা তৈরি করা হতো । অথবা করাচিতে পাঠানো হতো । তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, পাকিস্তান আমলে পাঞ্জাবি ট্যানারিগুলোতে চামড়া chrome করা হতো । তাই তাঁর মতে, এদেশে চামড়া শিল্প স্থাপিত হওয়ার পর চামড়া প্রক্রিয়াজাত করণের সম্পূর্ণ অবস্থায় এ শিল্প দাঁড়াতে পারে নি । তখন শুধু ওয়েট ব্লু পর্যায়েই এ শিল্পের অবস্থান নির্ধারিত হতো ।

Dhaka University Institutional Repository

অবশ্য স্থানীয় চাহিদার পাকা চামড়া (যেমন সোল, সু-আপার) প্রস্তুতকরণের ব্যবস্থাদি এখানে (ঢাকা) অল্পবিস্তর ছিল। তবে অধিকাংশই ওয়েট ব্লু আকারে প্রক্রিয়াজাতকরণ হয়ে তা হয় পশ্চিম পাকিস্তানে যেতো নতুবা বিদেশে রপ্তানি হতো। তবে এই সময় বাঙালিরা সরাসরি রপ্তানি করতে পারত না। তারা শুধু ওয়েট ব্লু করে করাচিতে পাঠাত। সেখান থেকে ফিনিসড চামড়া করে বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হতো।

তিনি আরো উল্লেখ করেন, এই সময় ট্যানারিগুলো ব্যাংক থেকে কোনো রকম সহায়তা পেত না/ নিত না। কারণ সরবরাহ বেশি থাকায় চামড়ার দাম কম ছিল। অপরদিকে খুব বেশি রপ্তানি হতো না। আর স্থানীয় জনগণ ট্যানারির গুরুত্ব বুঝত না। কেননা তখন পর্যন্ত ধারণা ছিল নিচু শ্রেণির লোকেরা চামড়ার ব্যবসা করে। যেহেতু এই সময় বিদেশি প্রতিযোগিতা ছিল না। সেহেতু চামড়ার মান নির্ধারণেরও প্রশ্ন ছিল না।

পাকিস্তান আমলে ঢাকার শাহবাগে প্রথম পাকিস্তান ট্যানার্স এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এটি হাজারিবাগের 'বাংলাদেশ ট্যানার্স এসোসিয়েশন' নামে পরিচিত। এই ট্যানারির প্রথম চেয়ারম্যান ছিলেন তাজ ট্যানারির মালিক জনাব মুজিবুর রহমান (অবাঙালি ভারতীয়)। পাকিস্তান আমলে ট্যানার্স এসোসিয়েশনের মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ১০০ জন। এই এসোসিয়েশনের সদস্য হতে হলে তাকে ট্যানারির মালিক হতে হতো। তবে পাকিস্তান আমলে ট্যানার্স এসোসিয়েশনের উদ্দেশ্যে কী ছিল, ঢাকার চামড়া ব্যবসায় ট্যানার্স এসোসিয়েশনের ভূমিকা কী ছিল তা জানা যায় নি।[৩৫(ক)]

ঢাকার জুতা শিল্প (১৯২১-১৯৭১)

জুতা শিল্প এই প্রদেশের তথা পূর্ববাংলা বা পূর্ব পাকিস্তানের বা ঢাকার একটি বিকাশমান শিল্প ছিল। এটি শুধু দেশজ শিল্পই ছিল না বরং বৃহৎ পরিমাণে আধুনিক মানের এবং হাতে তৈরি হতো বলে এটি কুটির শিল্পের স্তরের ছিল। আলোচ্য সময়ের শুরুতে ঢাকায় সাধারণত জুতা হাতে তৈরি করা হতো। ১৯৪০-এর দশকে নারায়ণগঞ্জের 'মেসার্স ঢাকা ট্যানারি লিমিটেড' অল্প কিছুসংখ্যক যন্ত্রের মাধ্যমে জুতা তৈরি করত।[৩৬] কিন্তু যেখানে হাতে তৈরি জুতা প্রাধান্য পেত সেখানে তথা স্থানীয় বাজারে এগুলো বিক্রির নিয়ন্ত্রণ ছিল না। বিভিন্ন সমস্যা থাকা সত্ত্বেও পূর্ববাংলায় জুতা তৈরি ছিল একটি আদর্শ ও সফল কুটির শিল্প। আর এ শিল্পকে কেন্দ্র করে ঢাকায় ব্যাপক ব্যবসা হতো।

১৯২০ শতকের বিশের দশকে ঢাকা শহরে এক ডজন ঋষি পরিবার ছিল। যারা ভালো মানের বুট, সু এবং স্লিপার তৈরি করত। যা আমদানিকৃত দ্রব্যের চেয়ে সস্তা। লক্ষ্মীবাজারের মুচিরা ক্রোম চামড়া থেকে ভালো মানের ও নকশার টেকসই জুতা তৈরি করত।[৩৭] সাধারণত ঋষির তৈরি স্যান্ডেল ও চটি স্থানীয় বাজারে বিক্রি হতো। যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। আবার এই সময় নিম্নমানের জুতা ও চটি ঢাকা শহরের পার্শ্ববর্তী জেলা মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া, খালাশি এবং পার্শ্ববর্তী গ্রাম ধামরাইয়ে তৈরি হতো।[৩৮] অর্থাৎ এই সময় জুতা তৈরি শিল্প চামার ও মুচিদের হাতে ছিল।

সরকারি নথিতে দেখা যায় যে, ১৯৪০-এর দশকের শেষের দিকে পূর্ববাংলায় শতকরা ১০ ভাগ লোক জুতা পরত।[৩৯] সাধারণত গরিব বা নিম্নশ্রেণির লোকেরা জুতা পরত না। যা

Dhaka University Institutional Repository

দৃষ্টান্ত হিসেবে সিলেটের নানকারদের[৪০] কথা উল্লেখ করা যায়। নানকাররা ছিল ভূমিহীন চাষী। এরা জমিদারদের জমিতে বেগার খাটত, তার বিনিময়ে তাদেরকে খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেয়া হতো। নানকাররা শুধু বেগারই খাটত না, জমিদারদের সমস্ত কাজ করতে বাধ্য থাকত। ফলে জমিদাররা তাদের উপর নানাধরনের নির্যাতন চালাত। এই নানকারদের জুতা পরা নিষেধ ছিল। পরবর্তীতে জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে নানকাররা যখন বিদ্রোহ (১৯২২-৫০) করে তখন তারা জুতা পরে প্রতিবাদ জানায়। নানকার ছাড়াও আলোচ্য সময়ে পূর্ববাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী ছিল কৃষিজীবী এবং অশিক্ষিত। কিন্তু পরবর্তীতে শিক্ষার বিকাশের সাথে সাথে এবং জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির ফলে ক্রমাগত জুতার চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং রপ্তানি বাণিজ্যে জুতা শিল্পের ভালো সম্ভাবনা দেখা দেয়। ১৯৪০-এর দশকে কলকাতা, কানপুর এবং আগ্রা থেকে জুতা আমদানি করা হতো।[৪১] কেননা ঢাকার জুতা প্রস্তুতকারকরা চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন করতে পারত না।

দেশবিভাগের আগে কানপুর এবং আগ্রা ছিল জুতা উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র। এই দুটি জায়গার কারিগর সারা ভারতের চাহিদা অনুযায়ী জুতা উৎপাদন করত। দেশভাগের পরে মুসলিম কারিগরদের অনেকে ভারত থেকে পাকিস্তানে চলে আসে। কিন্তু তাদের অনেকেই করাচি এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য জায়গায় স্থায়ী হয়। এ কারণে করাচিতে ভালো জুতা তৈরি হতো।[৪২]

১৯৪৮ সালের সরকারি নথিপত্র থেকে ১৯৪০-এর দশকে পূর্ব পাকিস্তানে জুতার চাহিদা কী পরিমাণ ছিল তা জানা যায়। এখানে দেখা যায় যে[৪৩]—

১. বর্তমান ব্যয় অনুযায়ী জুতার চাহিদা ৭,৬২,৮০০ জোড়া (Present estimated footwear requirement)।

২. জুতার উৎপাদন ৩,০০,০০০ জোড়া (Present estimated production in East Bengal)।

৩. বর্তমান ঘাটতি ৭,৩২,৮০০ জোড়া (Present estimated production deficiency to be made)।

৪. বর্তমান আমদানি (Present estimated imports) ৭,৩২,৮০০ জোড়া।

এদিকে ১৯৪০-এর দশকের শেষের দিকে ১৯৪৯ সালে Pak Leather Ltd. নামে একটি জুতা কারখানা প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নেয়া হয়। এর রেজিস্টার অফিস চট্টগ্রাম এবং প্রধান কার্যালয় ঢাকায় প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নেয়া যায়। এটি ছিল পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি। এই কোম্পানিতে সবধরনের জুতা তৈরি, চামড়াজাত দ্রব্য এবং চামড়া পাকাকরণ এবং চামড়া ক্রয়-বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। আর এসব দ্রব্যের ব্যবসা-বাণিজ্যের স্থান ছিল ঢাকা। পাক লেদার লিমিটেড কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলী ছিলেন[৪৪]—

১. খান সাহেব এফ. ডি. হায়দার।

২. বেগম নাঈমা খানম।

৩. মি. এন. হুদা (Partners Overseas Trading Corporation, 210, Mitford Road, Dacca)।

Dhaka University Institutional Repository

৪. মি. সৈয়দ আবুল খায়ের (Pleader, Dacca)।

৫. মি. আলাউদ্দিন (Marchant, 173, Rahmatganj, Dacca)।

৬. ড. নুরুউদ্দিন আহমেদ (7/8 Hyder Box Lane, Dacca)।

৭. এ. এম. নবী (Marchant and Contractor, 2 Jail Road, Dacca)।

পাক লেদার লিমিটেডের মোট মূলধন ছিল ২০,০০,০০০ রুপি।[৪৫]

এই ২০ লক্ষ রুপি ব্যয়ের একটি তালিকা দেয়া হলো[৪৬] —

সারণি-১২

Plant No. 1

Mens welted shoes 400 pairs shoes a day	Machinery	Rs. 75,000
	Lands 2 acres	Rs. 4,000
	Building Construction	Rs. 50,000
	Leather material and Grinderies for 24 days	Rs. 50,000
	Reserve	Rs. 10,000
	Total	Rs. 1,89,000

Plant No. 2

Mens staple welted shoes	Machinery	Rs. 73,000
	Land 2 acres	Rs. 4,000
	Building construction	Rs. 50,000
	Leather, material and Grinderies for 24 days	Rs. 50,000
	Reserve	Rs. 10,000
	Total	Rs. 1,87,000

Plant No. 3

Men's Screwed and Stitched boots	Machinery	Rs. 80,000
	Land 2 acres	Rs. 4,000
	Building construction	Rs. 50,000
	Leather material and Grinderies for 24 days	Rs. 50,000
	Reserve	Rs. 10,000
	Total	Rs. 1,94,000

Dhaka University Institutional Repository

Plant No. 4

Boys & Girls sewn shoes. 600 pairs day	Machinery	Rs. 65,000
	Land 2 acres	Rs. 4,000
	Building construction	Rs. 50,000
	Leather material and Grinderies for 24 days	Rs. 50,000
	Reserve	Rs. 10,000
	Total	Rs. 1,79,000

Plant No. 5

Ladies sewn shoes 600 pairs a day	Machinery	Rs. 70,000
	Land 2 acres	Rs. 4,000
	Building construction	Rs. 50,000
	Leather material and Grinderies for 24 days	Rs. 50,000
	Reserve	Rs. 10,000
	Total	Rs. 1,84,000

Plant No. 6

Cemented shoes 600 pairs a day	Machinery	Rs. 60,000
	Land 2 acres	Rs. 4,000
	Building construction	Rs. 50,000
	Leather material and Grinderies for 24 days	Rs. 50,000
	Reserve	Rs. 10,000
	Total	Rs. 1,71,000

Plant No. 7

Voldts chromes shoes 500 pairs a day	Machinery	Rs. 50,000
	Land 2 acres	Rs. 4,000
	Building construction	Rs. 50,000
	Leather material and Grinderies for 24 days	Rs. 30,000
	Reserve	Rs. 10,000
	Total	Rs. 1,44,000
	Total =	Rs. 2,51,000

Dhaka University Institutional Repository

Sale and Purchases Leather and Leather goods	Rs. 400,000
Construction of Office and Godown	Rs. 34,000
Registration and formation	Rs. 5,000
Equipment	Rs. 10,000
Transport	Rs. 50,000
Reserve	Rs. 2,50,000
Total	Rs. 7,49,000

Grand total : Rs. 20,00,000.

১৯৫২ সালের ৯ এপ্রিল The Provincial Advisory Committee-র যে প্রথম সভা হয় তাতে বলা হয় যে, পূর্ববাংলায় বার্ষিক জুতার চাহিদা ৬০ লক্ষ জোড়া। যা নিম্নোক্ত পরিসংখ্যানের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। পূর্ববাংলার মোট জনসংখ্যা ৪,২০,০০,০০০। এরমধ্যে শহরে বাস করে ৪% এবং ৯৬% গ্রামে বাস করে।[৪৭]

৭৮% শহরের লোক জুতা ব্যবহার করে -	১২ লক্ষ জোড়া
এবং ১২% গ্রামের লোক জুতা ব্যবহার করে-	৪৮ লক্ষ জোড়া
মোট	৬০ লক্ষ জোড়া

আবার এই সভাতে আরো বলা হয় যে, এর মধ্যে ৪০% জুতা বা ২৪ লক্ষ জোড়া জুতা ছিল চামড়ার, ৬০% জুতা বা ৩৬ লক্ষ জোড়া জুতা ছিল রাবারের।[৪৮]

১৯৫০-এর দশকের সরকারি নথি থেকে আরো জানা যায় যে, এই কমিটি পূর্ববাংলায় বা পূর্ব পাকিস্তানে চামড়ার জুতার উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করে। এই কারণে প্রতিদিন ১০০০ জুতা তৈরিতে সক্ষম যান্ত্রিকভাবে সুসজ্জিত ৫টি ইউনিট সম্বলিত জুতা কারখানা তৈরি করা। এর মধ্যে ৩টি ঢাকা, ১টি চট্টগ্রাম এবং ১টি রাজশাহী। এই কমিটি সেনাবাহিনী, পুলিশ, রেলওয়ে ইত্যাদির সদস্যদের জন্য আর্মি বুট ও জুতা এবং পেশওয়ারি চপ্পল তৈরির জন্য ঢাকায় ২ ইউনিটের কারখানা/প্রতিষ্ঠানের সুপারিশ করে।[৪৯]

এ সময় বিভিন্ন বিভাগের যে চাহিদা ছিল তা হলো[৫০]—

জেল :	২০০০ জোড়া
রেলপথ :	৫০০০ জোড়া
ফায়ার ব্রিজ :	৫০০ জোড়া
পুলিশ :	১৫,০০০ জোড়া
মোট	২২,৫০০ জোড়া

উপরের তথ্যানুসারে বলা যায় যে, দেশভাগের পরে জুতার চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে জুতা শিল্প তথা ঢাকার জুতা ব্যবসাও বৃদ্ধি পায়।

Dhaka University Institutional Repository

দেশভাগের পরে কয়েকটি জুতা কারখানা চালু হয়। এর মধ্যে অন্যতম একটি হলো টঙ্গীতে প্রতিষ্ঠিত বাটা সু ফ্যাক্টরি। যা ১৯৬২ সালে চালু হয়। এই কোম্পানি তাদের উৎপাদিত দ্রব্য রপ্তানি করত। যা এখনও অব্যাহত আছে। বাটা কোম্পানি স্থানীয় চামড়ার বড় ক্রেতা। ১৯৬৯ সালের *ঢাকা গেজেটিয়ার* থেকে নিম্নবর্ণিত জুতা ফ্যাক্টরির উৎপাদন ক্ষমতা সম্পর্কে জানা যায়[৫১] —

সারণি-১৩

ক্রমিক নং	নাম	স্থান	উৎপাদন
১.	পাক সু ইন্ডাস্ট্রিজ	ঢাকা	৫,৪০০ জোড়া বার্ষিক
২.	ঢাকা বুট ফ্যাক্টরি	ঢাকা	৭,২০০ জোড়া বার্ষিক
৩.	বাটা সু ফ্যাক্টরি	টঙ্গী, ঢাকা	৩,২০০ জোড়া প্রতিদিন

১৯৫০-এর দশকের সরকারি একটি নথি থেকে 'পাক সু ফ্যাক্টরি' সম্পর্কে জানা যায়। তাতে বলা হয় যে, এটি ১৯৫১ সালের এপ্রিলে চালু হয়।[৫২] এই ফ্যাক্টরির জুতার চাহিদা এত বেশি ছিল যে, ব্যবসায়ীরা চাহিদা মেটাতে পারত না। এই ফ্যাক্টরি ঢাকার নবাবপুর রোডে অবস্থিত ছিল। এই ফ্যাক্টরি আগ্রার বিখ্যাত জুতা ফ্যাক্টরি Alex Andra Shoe Factory সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। দেশভাগের পূর্বে আগ্রার SadarBhatty যারা, সারা ভারতের মধ্যে সুনাম অর্জন করেছিল— তারা দেশভাগের পরে ঢাকায় চলে আসে এবং নিজেরা ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করে। তারা ঢাকার ২০৯, নবাবপুর রোডে পাইকারি ও খুচরা মূল্যে আমদানিকৃত সাইকেল ব্যবসা করত।

এই ফ্যাক্টরিতে ৩৫ জন অভিজ্ঞ জুতা প্রস্তুতকারী ছিল। তাদের প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত মজুরি দেয়া হতো। এবং আগ্রা থেকে তাদের ট্রাভেলিং এক্সপেনসেস এন্ড বাট্টা (Travelling Expenses & Batta) দেয়া হতো। এই ফ্যাক্টরির জুতা শুধু মেট্রোপলিটন শহর ঢাকা এবং উপশহরেই নয় বরং সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে সরবরাহ করা হতো।

এই নথিতে এ ফ্যাক্টরি সম্পর্কে আরো যেসব তথ্য পাওয়া যায় সেগুলো হলো[৫৩]—

১. জুতা কারখানা (Shoe Factory), ৪৭/১৭ পুরানা পল্টন, ঢাকা।

২. কর্মচারীদের সংখ্যা- ২৫ জন (Technical Hands workmen Employed)।

৩. উৎপাদন : ৬০ জোড়া পুরুষ ও শিশু।

৪. মূল্য : ৮০০ রুপির কাছাকাছি।

৫. কাঁচামালের উৎস : স্থানীয় এবং বিদেশ থেকে আমদানি করা হতো।

৬. বাজার : প্রস্তুতকৃত দ্রব্য স্থানীয় এবং মফস্বল জেলা শহরগুলোতে বিক্রি করা হতো।

মূলধন বিনিয়োগ : ব্লক : ২৫,০০০ রুপি

ওয়ার্কিং : ১০,০০০ রুপি।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া আরো ২০টি ফ্যাক্টরি ক্ষুদ্র পরিসরে কাজ করত। এসমস্ত ফ্যাক্টরিতে সাধারণত চামড়াজাত জুতা তৈরি করা হতো।

নিম্নে ১৯৬২ সালের ঢাকার কয়েকটি জুতা ফ্যাক্টরি ও দোকানের নাম দেয়া হলো[৫৪]—

1. Shoe Emporium, Luxmi Bazar.
2. Baby Nasreen Shoe Company.
3. Jubilee Golden Sandal Industries, Lolit Mohaon Das Lane.
4. Novelty Sandal Factory.
5. Anarkali Sandal Industries, Purana Moghultoli.
6. Boots man, New Market.
7. China Boot House, New Market.
8. M. A. Shoe Company, L. R. Lane.
9. Dessi Shoe Factory, Nawabpur.
10. Azizuddin Shoe Factory.
11. Brailly Shoe Store, Hossain Market.
12. Parvez Shoe Factory, Bangshall.
13. Lucky Sandal Shoe Factory.
14. Osman Shoe Factory, Bangla Bazar.
15. Modern Shoe Factory.
16. Pakistan Sandal Co., Purana Moghultoli.
17. Beauty Shoe Store, Mitford Road.
18. Paidar Footwears Industries.
19. Pak Footwears, Takerhat.
20. Kamran Shoe Factory, Aga Sadeq Road.
21. Happy Feet and Co., Taherbagh Lane.
22. Modern Sandle Co.

১৯৬২ সালের পূর্ব পাকিস্তানে তথা ঢাকায় চামড়াজাত দ্রব্য উৎপাদনের উপর একটি পর্যবেক্ষণ হয় তাতে দেখা যায় যে, চামড়ার জুতার নকশা সাধারণত নিজেদের ধারণা থেকে এবং অনুকরণের মাধ্যমে করা হতো। পাইকারি বিক্রেতারা উৎপাদনকারী ইউনিটের কাছে নকশা পৌছে দিত। নকশার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হচ্ছে বিদেশ থেকে নকশার নমুনা সাধারণত ক্রেতাদের কাছ থেকে ক্রয় করা হতো। অথবা উৎপাদনকারীদের পরিচিত কেউ বিদেশ থেকে নকশা তাদের কাছে সরবরাহ করত।[৫৫]

এই সময় (১৯৬২) ঢাকার যেসব চামড়া ব্যবসায়ী, উৎপাদনকারী, কর্মচারীদের সাক্ষাৎকার নেয়া হয় তার ভিত্তিতে বলা যায় যে, ৫৮টি জুতা উৎপাদনকারী ইউনিটের মধ্যে ৩০টি পুরুষদের জুতা উৎপাদনে দক্ষ এবং ১৬টি মহিলাদের জুতা উৎপাদনে দক্ষ। কিন্তু শিশুদের জুতা উৎপাদনকারী কোনো উপযোগী ইউনিট ছিল না। কেবল ১২টি ইউনিট সব

Dhaka University Institutional Repository

ধরনের অথবা পুরুষ ও মহিলা এ দুইয়ের কোনো একটি এবং একই সাথে শিশুদের জুতা উৎপাদন করত।[৫৬]

এদিকে চামড়া শিল্পের কিছু সমস্যা থাকার কারণে জুতা শিল্পের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। সমস্যাগুলো হলো—

১. মূলধনের অভাব;
২. আমদানিকৃত উৎপাদনের অপ্রাপ্যতা;
৩. দ্রব্যের উচ্চমূল্য;
৪. ব্যস্ত সময়ে (busy season) কারিগরদের অভাব।

১৯৬২ সালে চামড়া শিল্পের উপর যে পর্যবেক্ষণ করা হয়, তাতে দেখা যায় যে, ৭৫% সাক্ষাৎকারী অভিযোগ করে যে, মূলধনের অভাব।[৫৭] আর এই সমস্যা জুতা ও চামড়াজাত দ্রব্য উৎপাদন উভয়ক্ষেত্রে কার্যকর।

মূলধনের অভাবে ভালোমানের চামড়া জুতা উৎপাদনের জন্য পাওয়া যেত না। বাছুরের চামড়া, (Calf Leather) মসৃণ ছাগলের চামড়া (Glacekid), সোয়েড (Suede—ছাগলের চামড়া থেকে তৈরি নরম বিশেষ চামড়া) চকচকে চামড়া স্থানীয়ভাবে পাকা করা হতো না। অথচ সবচেয়ে ভালোমানের চামড়া পাওয়া গেলেও দেশীয় জুতা উৎপাদনকারীদের চাহিদা না মিটিয়ে রপ্তানি করা হতো। আবার ভালোমানের চামড়া পাওয়া গেলেও তার মূল্য ছিল অধিক। এছাড়া অন্যান্য উপাদান তথা আয়রন স্পিনস, চর্মবন্ধনী, মোটা সুতা, উচ্চ মূল্যের জন্য ব্যস্ত সময়ে উৎপাদন বাধাগ্রস্ত হতো।

অন্যদিকে ব্যস্তসময়ে কারিগরের অভাবও ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। কেননা কারিগররা প্রায়ই ভালো পারিশ্রমিকের প্রলোভনে এক ইউনিট থেকে অন্য ইউনিটে চলে যেত। ফলে জুতা উৎপাদন ব্যাহত হতো।

কিছু জুতা ফ্যাক্টরি ক্রোম চামড়া দিয়ে জুতা তৈরি করত। কিন্তু ক্রোম চামড়া দিয়ে তৈরি জুতা প্রত্যেকটি ইউনিটে বেশি ছিল না। আবার স্যান্ডেল উৎপাদনকারীদের অনেকে স্যান্ডেল তৈরিতে সোয়েড বা ছাগলের চামড়া ব্যবহার করত।

পুরুষদের জুতার তলি তৈরির জন্য মহিষের চামড়া উচু দামে পাওয়া যেত। একইভাবে জুতার জন্য নাইলনের জাল এবং নরম ও মসৃণ ফিতা দরকার। অপরদিকে মহিলাদের জুতার জন্য ভালোমানের চামড়া উঁচু দামে পাওয়া যেত। উল্লেখ্য যে, পূর্ব পাকিস্তান বা ঢাকায় পাওয়া চামড়া মহিলাদের জুতার জন্য উপযুক্ত। কেননা এই অঞ্চলের চামড়া অত্যন্ত নরম।[৫৮]

চামড়াজাত দ্রব্যের চাহিদার ক্ষেত্রে দুটি বিষয় চোখে পড়ে। একটি হলো শীতকালে জুতাসহ অন্যান্য চামড়াজাত দ্রব্যের ব্যাপক চাহিদা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বর্ষাকালে হ্রাস পায়। ব্যস্তসময় তথা নভেম্বর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত চামড়াজাত দ্রব্যের (জুতাসহ) ব্যাপক চাহিদা বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত চামড়াজাত দ্রব্যের বিক্রি ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। যা নিম্নবর্ণিত তালিকার মাধ্যমে প্রতিদিনের গড় বিক্রি বুঝানো হয়েছে। ১৯৬২ সালে চামড়া শিল্পের উপর যে পর্যবেক্ষণ করা হয় তাতে পর্যবেক্ষকরা যেসব চামড়া উৎপাদনকারী, ব্যবসায়ী ও কর্মচারীদের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন তার ভিত্তিতে তালিকাটি করা হয়েছে।[৫৯]

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিদিনের গড় বিক্রি

সারণি-১৪

জুতা	চামড়াজাত দ্রব্য
ব্যস্ত সময় (নভেম্বর-মার্চ) (Busy Season) ১১৫.৫৯ রুপি	ব্যস্ত সময় (নভেম্বর-মার্চ) ৮০.৫১ রুপি
শিথিল সময় (এপ্রিল-অক্টোবর) (Slack Season) ৫৯.৪৬ রুপি	শিথিল সময় (এপ্রিল-অক্টোবর) ৪৫.৪৪ রুপি

উৎস : *The Leather Goods Manufacturing Industry in East Pakistan,* Bureau of Economic Research, University of Dacca, 1962 p. 29.

এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই সময় ক্ষুদ্র চামড়া উৎপাদনকারী / ব্যবসায়ীরা তাদের দামের নথি রক্ষণাবেক্ষণ করত না। ফলে পাকিস্তান আমলের জুতার ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা লাভ করা যায় না।

আবার জুতা বিক্রির ক্ষেত্রে জলবায়ুর অবস্থা এবং কৃষি অর্থনীতির কারণে ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। চামড়ার জুতা ব্যবহারকারীদের একটি বড় অংশ গ্রামে বাস করত। ফলে তারা বর্ষাকালে ও গ্রীষ্মকালে কোনো জুতা ব্যবহার করত না। বিশেষ করে গ্রামে বর্ষাকালে প্রায়ই জুতা ব্যবহার করা সম্ভব হয় না।

অন্যদিকে কৃষি অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামের ক্রেতাদের কাছে শীতকালে ফসল তোলার সময়ে তাদের হাতে টাকা আসে। যা চামড়ার জুতার বাজারের উপর প্রভাব ফেলত। অথচ অন্যান্য চামড়াজাত দ্রব্য—ব্যাগ, সুটকেসের ক্ষেত্রে জলবায়ু সংক্রান্ত বিষয়টি ছিল গৌণ।

জুতার ডিজাইন পছন্দের বেলায়ও গ্রাম ও শহরের ক্রেতাদের মধ্যে পার্থক্য ছিল। শহরের ক্রেতাদের কাছে ডিজাইন ছিল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর গ্রামের ক্রেতাদের কাছে দাম অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

পূর্ব পাকিস্তান তথা ঢাকায় জুতা উৎপাদন করা হলেও কেবল ৫০% পুরুষের জুতা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আমদানি করা হতো ; যা ঐ সময়ের (১৯৬২) পর্যবেক্ষণ থেকে জানা যায়। একটি রিপোর্টে দেখা যায় যে, ১৯৬০ সালে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে ৬০০ হাজার রুপির জুতা আমদানি করা হয়।[৬০]

১৯৬০-৬১ সাল থেকে ১৯৬৫-৬৬ সালে পূর্ব পাকিস্তানের সাথে পশ্চিম পাকিস্তানের যে বুট এবং জুতার ব্যবসা-বাণিজ্য হয়েছিল তা নিম্নের তালিকায় দেয়া হলো —

Dhaka University Institutional Repository

বুট ও জুতা আমদানি

সারণি-১৫

সাল	মূল্য (মিলিয়ন রুপি)
১৯৬০-৬১	৮.৯
১৯৬১-৬২	১১.০
১৯৬২-৬৩	৮.৬
১৯৬৩-৬৪	৫.১
১৯৬৪-৬৫	২.৮
১৯৬৫-৬৬	৪.৯

উৎস : C. S. O. Karachi (Central Statistical Office), E. P. B. S. Qouted (*East Pakistan Bureau of Statistics*) উদ্বৃত, *Economic Survey of East Pakistan* 1966-67, Finance Department, Government of East Pakistan, 1967, p. 35.

উপরের তালিকায় দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৬০-এর দশকের প্রথম দিকে ব্যাপকভাবে জুতা ও বুট আমদানি করা হলেও পরবর্তীতে কম হারে আমদানি করা হয়।

১৯৬০-এর দশকের পাশাপাশি ১৯৩০-এর দশকের কলকাতার বুট ও জুতা আমদানির একটি হিসেব পাওয়া যায় ঐ সময়কার রিপোর্টে। যা নিম্ন বর্ণিত —

সারণি-১৬

সাল	মূল্য	শতকরা
১৯৩১-১৯৩২	৩১,২৯,৭৯৩ রুপি	
১৯৩২-১৯৩৩	২৬,৭০,২৯৬ রুপি	
১৯৩৩-১৯৩৪	২৭,৬৪,৩১২ রুপি	০.৮৬

উৎস : *Report on the Administration of Bengal (1932-33),* Revenue Department, Government of Bengal, Bengal Government Press, Alipore, Bengal 1934, p. 156. *Report on the Administration of Bengal* (Pt-II), Chapter XIII, 1933-34, Revenue Department, Government of Bengal, 1935, p. 199.

উপরের তালিকায় দেখা যাচ্ছে যে, কলকাতায় বিপুল অংকের জুতা আমদানি করলেও ঢাকায় কী পরিমাণ বা কত মূল্যের জুতা আমদানি করা হতো তার হিসেব পাওয়া যায় না।

পাকিস্তান আমলে মাঝে মাঝে স্থানীয় বিতরণকারী ব্যক্তিরা (Local Distribution) তাদের নিজেদের দ্রব্যের উপর লেবেল জুড়ে দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আমদানিকৃত দ্রব্য হিসেবে প্রদর্শন করে। অথচ প্রকৃত অর্থে এগুলো ছিল স্থানীয় উৎপাদনকারীদের দ্বারা তৈরি। কারণ পাকিস্তানের জুতার মোহনীয় মূল্য এখানাকার ক্রেতাদের আকৃষ্ট করত।

Dhaka University Institutional Repository

কেননা পশ্চিম পাকিস্তানের জুতার মূল্য পূর্ব পাকিস্তানের জুতার চেয়ে সস্তা। এমনকি পরিবহন মূল্য নিয়েও প্রতিজোড়া জুতার দাম ছিল ২.৫০ রুপি। যদিও বলা হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের শ্রমিক মজুরি অনেক এবং আবহাওয়া জুতা শিল্পের প্রতিকূলে।

আবার পশ্চিম পাকিস্তানের জুতা শিল্পেরক্ষেত্রে বলা হয় যে, এখানকার (প. পাকিস্তান) জুতার মান ভালো এবং উৎকৃষ্ট ফিনিশিং। আপাতদৃষ্টিতে মনে করা হয় যে, দেশভাগের পর সবচেয়ে দক্ষ কারিগররা আগ্রা এবং কানপুর থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে আসে।

এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অন্যান্য শিল্পের মতো জুতা শিল্পের কোনো এসোসিয়েশন ছিল না। ফলে ব্যস্ত সময়ে প্রায় সব ইউনিট সপ্তাহের সাতদিনই রাত-দিন কাজ করত। বিশেষ করে রমজান মাসের সময়ে অনেক চাপ বেড়ে যেত, অতিরিক্ত চাহিদা মিটাতে গিয়ে।

১৯৬২ সালের একটি রিপোর্টে দেখা যায় যে, ব্যস্ত সময়ে ঢাকার জুতা কারখানার ৫৮টি ইউনিটের শ্রমিকের সংখ্যা ৩৮৫ জন। শিথিল সময়ে ৩৮টি ইউনিটের শ্রমিক সংখ্যা ছিল ১৪৫জন।[৬১]

১৯৬৯-৭০ সালের সেন্সাস থেকে ঢাকার জুতার উৎপাদন, মূল্য ইত্যাদি সম্পর্কে জানা যায় —

সারণি-১৭

Number of Factory	Fixed Assets	Stock at the end of the year	Average daily employment		Employment cost		Contact labour	Industrial cost	Value of product	Value added
			All employee.	Production worker	All Employee	Production worker				
38	8108	8882	1,458	1165	3,351	1.921	7	17.186	28960	11.774

উৎস : *Census of Manufacturing Industries in Bangladesh,* 1969-70, Bangladesh Govt. Press, Dacca, 1970, p. 10.

এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৯৬০-এর দশকের প্রথম দিকে চামড়ার জুতার ব্যবসার পাশাপাশি রাবার ও স্পঞ্জের জুতার প্রচলন শুরু হয়। কারণ চামড়ার জুতা প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাতে পারছিল না। নারী ও পুরুষের জুতার ব্যাপক চাহিদার কারণে স্থানীয় পণ্য তথা চামড়ার জুতা ও স্পঞ্জের স্যান্ডেল/চটির সাথে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। এক্ষেত্রে স্পঞ্জের স্যান্ডেলের বিশেষ গুরুত্ব ছিল। স্থানীয় পণ্য ও স্পঞ্জের স্যান্ডেলে বাজার ছেয়ে যায়। এগুলো দামে সস্তা ছিল এবং বর্ষাকালে ব্যবহারের সুবিধা ছিল। কেননা চামড়ার জুতা বর্ষাকালে ব্যবহারের অসুবিধা রয়েছে। ফলে চামড়ার জুতার সাথে স্পঞ্জের স্যাণ্ডেল নতুনত্ব নিয়ে আবির্ভূত হয়।[৬২] যা সবার কাছে, বিশেষ করে স্বল্প আয়কারীদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায়।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকার কাঁসা ও পিতল শিল্প (১৯২১-১৯৭১)

কারুশিল্পে ব্যবহৃত ধাতু দ্বিবিধ, একক ও মিশ্র। লোহা, তামা, জিঙ্ক (দস্তা), এলুমিনিয়াম প্রভৃতি একক ধাতু। পিতল, ব্রোঞ্জ, নিকেল, রূপা ইত্যাদি মিশ্র ধাতু।[৬৩] কারুকর্মে ব্যবহৃত ধাতুসমূহ হলো তামা, ব্রোঞ্জ, পিতল, কাঁসা, সোনা, রূপা, লোহা, পঞ্চ লোহা এবং অষ্ট ধাতু।[৬৪] যেহেতু পিতল মিশ্রধাতু সেহেতু পিতল তৈরি হয় দস্তা ৫% থেকে ৪০% এবং তামা ৯৫% থেকে ৬০% মিশ্রিত করে।[৬৫] পিতল ও কাঁসা শিল্প ঢাকার কারুশিল্পের তথা কুটির শিল্পের অন্তর্গত। কারুশিল্প হলো সুষমা বা সৌন্দর্য দান করার উদ্দেশ্যে কায়িক কৌশলে যে অলংকরণ করা হয় তাকে কারুশিল্প বলা যায়। আবার বিপণনের জন্য উৎপন্ন কারুশিল্প কুটির শিল্প নামে পরিচিত।

আলোচ্য সময়ের ঢাকার কাঁসা ও পিতল ব্যবসা সম্পর্কে ব্যাপক কোনো ধারাবাহিক তথ্য পাওয়া যায় নি। ইতঃপূর্বে অনেক গবেষক ঢাকার এই শিল্প নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু তাদের প্রত্যেকেই স্বাধীন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে/সময়ের আলোচনা করেছেন। বিশেষ করে বর্তমান অভিসন্দর্ভের আলোচ্য সময়ের আমদানি-রপ্তানির কোনো ধারাবাহিক পরিসংখ্যান পাওয়া যায় নি। তারপরও যতটুকু তথ্য উপাত্ত পাওয়া গেছে তার উপর ভিত্তি করেই এই শিল্প সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার উল্লেখ করেন যে, প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশে ধাতব শিল্পের প্রচলন ছিল।[৬৬] ধাতব শিল্পে পিতলের ব্যবহার অতীতকাল থেকে বাংলাদেশে জনপ্রিয় ছিল।[৬৭] ঢাকা শহরের ধাতব শিল্পের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখতে পাওয়া যায় যে, উপাদান ঠিক পিতল না হলেও (জিঙ্ক ও তামা মিশ্রিত) ধাতব পাত্রের গায়ে সোনা রূপার পাত বসানোর বিদ্রী বা কোপ্তাগারির কাজ ঢাকার এক ঐতিহ্যবাহী ধাতব শিল্প। ১৮৮৩-৮৪ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে শ্রেষ্ঠতম বিদ্রীর কাজ ছিল নবাব আহসান উল্লাহ প্রদত্ত একটি বাক্স।[৬৮] বল্লালসেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলে অনুমিত[৬৯] ঢাকেশ্বরী মন্দিরে অন্যধাতুর বিগ্রহের পাশাপাশি পিতলের কিছু মূর্তি ছিল। কিন্তু এগুলো লুণ্ঠনের পরও কিছু প্রাচীন বিগ্রহ অবশিষ্ট আছে। জেমস টেলরের '*টোপগ্রাফী অব ঢাকা*' গ্রন্থে ১৮৩৮ সালের আদম শুমারীতে কাঁসারি, বিদ্রীসাজ ও চেরাকষ নামক ধাতব শিল্পীদের তালিকা পাওয়া যায়।[৭০] আবার ১৮৮৩ সালে প্রকাশিত জেমজ ওয়াইজ তার '*পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও পেশার বিবরণ*' গ্রন্থে কাঁসারিদের কথা উল্লেখ করেন। তার মতে, কাঁসারিরা হলো সোনার বণিকদের একটি উপশাখা। কাঁসার জিনিস তৈরি করার কারণে এরা সমাজচ্যুত। আজকাল এরা পিতলের জিনিস বানায়। ঢাকায় এদের সংখ্যা নিতান্ত কম। পদ্মার দক্ষিণে রাজনগরে এরা অসংখ্য।[৭১]

Dhaka University Institutional Repository

তিনি আরো বলেন, কাঁসারিরা খাঁটি শূদ্র। এদের ধোপা, নাপিত এ সবই নবশাখদের মত। সবাই এরা শৈব। বৈষ্ণব এদের মধ্যে নেই। অন্য কারিগর শ্রেণির মত তারা বিশ্বকর্মার উৎসব পালন করে।[৭২] অপরদিকে *Eastern Bengal District Gazetteers* (1912) এ অন্যান্য শিল্পের পাশাপাশি কাঁসা ও পিতলের গৃহ সাজসরঞ্জামের কথা উল্লেখ করা হয়।[৭৩] তোফায়েল আহমেদ উল্লেখ করেন পূজার উপকরণ কোষা, কোষী, কমণ্ডুল, পঞ্চ প্রদীপ, নন্দী প্রভৃতি তৈরি হয়ে আসছে অতি প্রাচীনকাল থেকে। তাছাড়া নিত্যদিনের ব্যবহার্য তৈজসপত্র তৈরির ধারাও অতি প্রাচীন।[৭৪]

বিশ শতকের বিশের দশকে দেখতে পাওয়া যায় যে, ঢাকা শহরের ঠাঁটারিবাজারে ব্যবসায়ী ও তাম্রকারদের কলোনি ছিল।[৭৫] তারা গৃহস্থালির কাজে ব্যবহার্য কাঁসার পণ্য সামগ্রী তৈরি করত। ঠাঁটারিবাজার ছাড়াও নিম্নলিখিত জায়গাগুলোতে এ শিল্পের কেন্দ্র ছিল। যেমন— Brahmangaon, ধানকুনিয়া, লোহাজঙ্গ, ফিরিঙ্গিবাজার, আব্দুল্লাহপুর, ঝোলঘর এবং ধামরাই। আবার ১৯৪৮ সালের একটি নথিতে দেখতে পাওয়া যায় যে, কাঁসা শিল্প পূর্ব বাংলার ঢাকা জেলার ধামরাই, শিমুলিয়া এবং ময়মনসিংহের ইসলামপুরে বড় পরিসরে পাওয়া যেত। এছাড়া অন্যান্য জেলাতেও যেমন, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম এবং ফরিদপুরে ক্ষুদ্র পরিসরে ছিল।[৭৬]

ব্রিটিশযুগে এই শিল্পে কম লোক নিয়োজিত ছিল না। W.W.Hunter উল্লেখ করেন যে, ঢাকা জেলায় কাঁসা এবং তামাজাত দ্রব্য উৎপাদনে ৪৮৯ জন লোক নিয়োজিত ছিল।[৭৭] আবার বিশের দশকের একটি রিপোর্টে দেখতে পাওয়া যায় যে, এই শিল্পে প্রায় ২০০০ লোক নিয়োজিত ছিল।[৭৮] এই শিল্পের কারিগররা হিন্দু ও মুসলমান উভয়ই ছিল। হিন্দু ও মুসলমান উভয় কারিগর মুর্শিদাবাদ থেকে এসেছিল এবং মুসলমান কারিগর যারা বিশ শতকের বিশের দশকে স্বতন্ত্র দোকান প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং হিন্দু কারিগরদের তাদের দোকানে শ্রমিক বা কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ দিত। উল্লেখ্য জেমস ওয়াইজ (১৮৮৩) উল্লেখ করেন যে, চণ্ডালরা কাঁসারিদের কাছে কাজকর্ম করে পাকা কারিগর হয়ে ওঠে।[৭৯] সুতরাং দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, পূর্বে হিন্দুরা এই পেশায় নিয়োজিত থাকলেও পরবর্তীতে মুসলমানরা এই পেশায় আসে। এবং তাদের অধীনে হিন্দুরা কাজ করত।

নিম্নে ১৯২১ সালে এই শিল্পের উৎপাদন ও ব্যবসা বাণিজ্যের সাথে জড়িত লোকসংখ্যার হিসাব দেয়া হলো[৮০]—

সারণি-১৮

বছর (Year)	উৎপাদনের পরিমাণ (Nos. in Production)	ব্যবসা-বাণিজ্য (Nos. intrading)
১৯২১	২৫১৮	৫৭২

কাঁসার কাঁচামালের উৎস ছিল স্থানীয় পাইকার নামে একটি শ্রেণি। যারা মফস্বলের গ্রামগুলোতে ঘুরে বেড়াত এবং পরিত্যক্ত গৃহস্থালির পণ্যসমূহ সংগ্রহ করত এবং মহাজনকে হস্তান্তর করত। মহাজনরা পুরানো পণ্যগুলোকে গলিয়ে এবং পিটিয়ে নতুন একটি পণ্য তৈরি করত। অর্থাৎ পুরানো কাঁসার পাত গলিয়ে গৃহের সরঞ্জামাদি তৈরি করা হতো। দৃষ্টিগোচর হওয়ার জন্য স্থানীয়ভাবে দস্তা এবং তামার মিশ্রণে ভারান (Bharan) খাদ দেয়া হতো। বিশ শতকের বিশের দশকে কাঁসা দিয়ে গৃহস্থালির নিম্নবর্ণিত পণ্যসামগ্রী তৈরি হতো।[৮১]

Dhaka University Institutional Repository

১. বিভিন্ন আয়তনের কাঁসার পেয়ালা, বাটি।

২. বিভিন্ন আয়তন ও আকারের থালা।

৩. বিভিন্ন আকারের বল, কাপ।

এ সময় সাধারণত নিম্নের দুই ধরনের পদ্ধতিতে গৃহের সাজসরঞ্জাম তৈরি করা হতো।[৮২]

১. হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে ;

২. ছাঁচে ঢেলে।

প্রথমটি প্রায় একচেটিয়াভাবে এই জেলাতে অবলম্বন করা হতো। কাঁসারিরা অগ্নিকুণ্ডে কাঁসার পাতকে উত্তপ্ত করে এবং হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে যেকোনো আকার দিত। কারিগরদের বেশিরভাগই অন্যান্য তাঁতিদের মত অসুবিধা ভোগ করত এবং তারা প্রকৃত ভোক্তাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারত না। এই শিল্পটি প্রায় মহাজনদের নিয়ন্ত্রণে থাকত। মহাজন, পাইকার এবং উৎপাদনকারী বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ কাঁসা ও পিতল শিল্পের সাথে জড়িত ছিল। মহাজন ছাড়া অন্যান্য শ্রেণিকে দাদন প্রথার (অগ্রিম টাকা দেয়া) মাধ্যমে টাকা প্রদান করা হতো। আর মহাজন ছিল অগ্রিম টাকা প্রদানকারী। বিশের দশকে দক্ষ ও অদক্ষ কাঁসা ও পিতলের শ্রমিকদের গড় আয় ছিল যথাক্রমে প্রায় ৪০ রুপি এবং ১৫ রুপি।[৮৩]

দাদন প্রথার কারণে উৎপাদনকারীরা স্বাধীনভাবে বা স্বতন্ত্রভাবে গৃহস্থালির দ্রব্যসামগ্রী বিক্রি করতে পারত না বরং তারা মহাজনদের নিয়ন্ত্রণে থাকত এবং তৈরিকৃত সব দ্রব্যসামগ্রী তাদের সরবরাহ করত। শ্রমিকদের পুরো উৎপাদনের পরিমাণ মহাজনদের কাছে হস্তান্তর করতে হতো এই কারণে যে, তারা কাঁচামাল সরবরাহ করত, শ্রমিকদের মজুরি প্রদান করত। ফলে তারা (মহাজন) দ্রব্যের দাবিদার ছিলেন। অপরদিকে স্থানীয় দোকানদাররা উৎপাদনকারীদের অগ্রিম মূলধন প্রদান করত না। কিন্তু তারা মহাজনকে প্রদান করত এবং মহাজনদের মাধ্যমে দ্রব্য পেত।

উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, বিশের দশকে এই শিল্পের উন্নতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল মূলধন ও শ্রমিকদের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয়ের ব্যবস্থা করা । যা এই সময় ছিল না/ অভাব ছিল। এই শিল্পের সমৃদ্ধি লাভ করতে সবচেয়ে বড় বাধা ছিল মহাজনদের হাতে কারিগরদের বন্দীদশা এবং আর্থিক অবস্থার অনুন্নতি। মহাজনরা লাভের সিংহভাগ আত্মসাৎ করত বলে কারিগররা উন্নত যান্ত্রিক পদ্ধতির শিক্ষা নেওয়া থেকে বঞ্চিত হতো। উপরন্তু যেকোনো শিল্পের উন্নতি করতে হলে সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করা এবং শিল্প সংক্রান্ত ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা দরকার। যা বিশের দশকে ছিল না।

অপরদিকে বিশ শতকের বিশের দশকে পিতলের দ্রব্য সামগ্রী ব্যবসার বড় কেন্দ্র ছিল লোহাজঙ, ধামরাই এবং ঠাঁটারিবাজার । এই সময় কলকাতা থেকে পিতলের পাত সংগ্রহ করা হতো।[৮৪]

Dhaka University Institutional Repository

অনুরূপভাবে ১৯৪৮ সালের নথিতে দেখতে পাওয়া যায় যে, পিতল ও তামা আরো বিস্তৃত পরিসরে উৎপাদন করা হতো। যা নিম্নবর্ণিত প্রধান কেন্দ্রগুলো দেখে বোঝা যায়[৮৫]—

ঢাকা শহর, লোহাজঙ, ধামরাই, শিমুলিয়া, ইসলামপুর, টাঙ্গাইল, মোগরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাপাইনবাবগঞ্জ, কালান এবং বুদ্ধপাড়া, নাটোর।

যেহেতু আলোচ্য গবেষণার বিষয় ঢাকা শহর কেন্দ্রিক তাই সমগ্র পূর্ববাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তান নিয়ে আলোচনা না করে শুধু ঢাকা শহরের পিতল শিল্প বা পিতলের দ্রব্যসামগ্রী কেন্দ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ঢাকায় এই শিল্প (পিতল ও তামা) প্রধানত বামাচরণ চক্রবর্তী রোডে কেন্দ্রীভূত ছিল। ১৯৪৮ সালের সরকারি নথিতে উল্লেখ করা হয় যে, ৫০/১ বামাচরণ চক্রবর্তী রোডে (Bama Charan Chakravarti Road) "The Thataribazar Brassware Dealers" নামে উৎপাদনকারীদের একটি এসোসিয়েশন ছিল এবং এর সভাপতি ছিলেন মি. এন. কে. পাল। এই এসোসিয়েশন মূলত একটি বিক্রয়কেন্দ্র।[৮৬]

কারখানাগুলোতে দেশের তৈরি যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হতো। প্রত্যেকটি কারখানাতে ৩ জন-১৫ জন শ্রমিক ছিল। কিন্তু ১৯৪০-এর দশকে পিতলের পাতের অপর্যাপ্ত সরবরাহের কারণে প্রত্যেকটি কারখানায় ২-৩ জন শ্রমিক কাজ করত। সাধারণত বাজারের চাহিদা অনুসারে দ্রব্য উৎপাদিত হতো কিন্তু একই কারণে ১৯৪০-এর দশকে উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ ছিল নামমাত্র। বিভিন্ন ধরনের গৃহসরঞ্জাম তৈরিতে শ্রমিকদের বিশেষ দক্ষতা ছিল। যেমন— গামলা (Gamla), ঘটি (Ghati), থালা (Thala), কলসি (Kalsi), রাইং (Raing) ও বদনা (Badna)।[৮৭]

এখানে উল্লেখ্য যে, উনিশ শতকেও একই ধরনের দ্রব্যসামগ্রী তৈরি হতো। জেমস ওয়াইজ ১৮৮৩ সালে উল্লেখ করেন যে, কলকাতা থেকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে এরা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তৈরি করত। পাত দিয়ে এরা থালা, কড়াই, বদনা এসব তৈরি করত। কাটা ও পেটাই করার পর ঘষে মেজে ধারগুলো মসৃণ করে নিত।[৮৮]

বিশের শতকের বিশের দশকে পিতল দিয়ে যেসব দ্রব্যসামগ্রী তৈরি হতো[৮৯]—

১. বিভিন্ন আয়তনের পিতলের কলস;

২. বিভিন্ন আয়তনের পিতলের ঘটি;

৩. বিভিন্ন আয়তনের চামচ;

৪. বিভিন্ন আয়তনের ও আকারের বল।

পাকিস্তান আমলে পশ্চিমাঞ্চল থেকে আমদানি করা গৃহসজ্জার ধাতব দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে ঢাকার কারু বিপণীসমূহে বেচাকেনা হতো। স্বাধীনতার পর সেই উৎস বন্ধ হয়ে গেলে ঢাকার ধাতব শিল্পের প্রসার ঘটে। তৈজস তৈরির কারখানাসমূহে ধাতব সাজশিল্প স্থান করে নেয়।

Dhaka University Institutional Repository

কাঁচামাল হিসেবে পিতল ও তামার পাত এই কারখানাগুলোতে ব্যবহৃত হতো। তবে নির্দিষ্ট কিছু জায়গায় যেমন— লোহাজঙ্গ কলসি, ঘটির তলদেশ তৈরির জন্য পিতলের পিণ্ড অল্প পরিমাণে দরকার হতো। কাঁচামাল হিসেবে তামার পিণ্ডের খুব বেশি চাহিদা ছিল না। ১৯৪৮ সালের সরকারি নথিতে উল্লেখ করা হয় যে, বার্ষিক কাঁচামালের পরিমাণ ছিল ১০০০ টন (কাছাকাছি) পিতলের পাত এবং ৪০০ টন তামার পাত (অব ২০/০২ টু ৩৮/০২) আবার পিতলের পাত ব্যবহারের জন্য বার্ষিক ৫০ টন (Per Annum) টিন এবং ১০০ টন জিঙ্ক/ দস্তা দরকার হতো।[৯০] ১৯৪০-এর দশকে কাঁচামাল সরবরাহকারী প্রধান প্রতিষ্ঠান ছিল বিহার, ঘাটশিলার (Ghatshila) "The Indian Coppers Corporation"। নির্দিষ্ট অনুপাতের/পরিমাণের কাঁচামাল ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আমদানি করা হতো। এই কাঁচামালের গুণগত মান ছিল সর্বোৎকৃষ্ট এবং এর দাম ছিল উঁচু। ইংল্যান্ডের সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ছিল M/s. H. Righton & Co. Ltd. Priory Works, Belsize Road, Kilbum, London, N.W. 6.[৯১] অপরদিকে যুদ্ধের (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে) পরে কলকাতার The Metal Merchants Association কাঁচামাল সরবরাহ করত।[৯২] অবিভক্ত বাংলার শিল্প পরিদপ্তরের পুনর্বাসন বিভাগ মফস্বলের ক্রেতাদের কাছে জেলা ও মহকুমার অফিসারদের মাধ্যমে এই উপাদানগুলো বন্টনের ব্যবস্থা করত। কিন্তু ১৯৪০-এর দশকে (১৯৪৮) এই সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান ছিল না। এবং তখন থেকেই এই শিল্পের অবক্ষয় দেখা দেয়। ফলে ব্যাপকভাবে বেকারত্ব দেখা দেয়। তাই এই সমস্যা সমাধানের জন্য এবং শিল্পের উন্নতির জন্য বিভিন্ন সুপারিশ করা হয় যা সরকারি নথিতে উল্লেখ করা হয়—

"Removal of Export restrictions and provision of cheap railway transport would go a long way in solving the marketing problem. Along with this, regular supply of brass and copper sheets, etc. should be arranged for the rehabilitation of this old cottage industry."[৯৩]

১৯৫০-এর দশকে এই শিল্প সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং তাতে বলা হয় যে, "The industry existed in the province for a long time and mostly Hindus used these things for cooking and other purposes. ... This industry flourished in Dhamrai. ... There was an association of the manufacturers of brass and bell metal and Government was giving them scope in designs and artistic manufacture."[৯৪]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৫০-এর দশকে এই শিল্পের নকশা ও শৈল্পিক গুণাবলির প্রতি সরকার জোর দেয়। তোফায়েল আহমেদ উল্লেখ করেন যে, নকশা পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে ঠোকাই, পিটাই, ঠাপাই, ইনলে, মিনা ও স্প্রে।[৯৫]

রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়ও পাত্রের গায়ে নকশা খোদাই করা হয়। যে অংশ খোদাই করা হয় তা বাদ দিয়ে পাত্রের বাকি অংশ তুলির সাহায্যে ব্ল্যাক অ্যাসফালটাম বা পিচ (এসিড প্রতিরোধক দ্রবণ) দিয়ে ঢেকে শুকিয়ে নিতে হয়।

তারপর এসিড দ্রবণে ডুবিয়ে দিলে ঢাকা অংশ বাদে অন্যস্থানে গর্ত হতে থাকে। পরিমাণ মত গর্ত হলে দ্রবণ থেকে পাত্র তুলে নিয়ে কেরোসিন তেল দিয়ে পিচ পরিষ্কার করে নিতে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

তামা পিতলের দ্রবণের জন্য প্রয়োজন :

১. নাইট্রিক এসিড - ১ অংশ

পানি - ২ অংশ।

২. ফেরিক ক্লোরাইড স্ফটিক (কৃষ্টাল) ১৩ আউন্স, পানি ১ কোয়াটার।[৬৬]

খোদাই কাজের সামগ্রীর মধ্যে আছে কলসি, ট্রে, ডিস, ফুলদানি, মদের জগ, পদক, টেবিল ছাউনি, বাতি, এ্যাসট্রে প্রভৃতি।

মিনার কাজ যা মোরাদবাদি নামে পরিচিত। তা করা হয় গালা বা লাক্ষার সঙ্গে রং মিশিয়ে। মোরাদবাদি কারিগর পূর্বে থাকলেও বর্তমানে বাংলাদেশে নেই বললেই চলে। মিনার সামগ্রীর মধ্যে আছে ফুলদানি, এ্যাসট্রে প্রভৃতি।

আবার রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়ও পাত্রের গায়ে রং করা হয়। পিতলের সামগ্রীতে কালো, ব্রোঞ্জ, ব্রাউন, চকলেট ও সবুজ রং করা হয়।

নকশার স্থান ঢেকে রেখে অনাবৃত অংশের উপর রং স্প্রে করে পাত্রের গায়ে সোনালি রঙের নকশা ফুটিয়ে তোলার আরেকটি প্রক্রিয়া প্রচলিত আছে।

বিভিন্ন আকৃতির ফুলদানি, ফুলের পাত্র এ প্রক্রিয়ায় অলংকৃত করা হয়।

এভাবে দেখা যাচ্ছে যে, স্বাধীনতার পর ঢাকা শহরে যেসব পিতলের সামগ্রী তৈরি হতো তার বেশিরভাগই ছিল গৃহের সাজশিল্প। পূর্বের তৈজস তৈরির কারখানাসমূহে এসব ধাতব শিল্প স্থান করে নেয়। পাকিস্তান আমলে যা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আমদানি করা হতো।

সুতরাং দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, এ শিল্প দিনদিন অবক্ষয়ের পথে এগিয়ে গেলেও এর সম্ভাবনা পূর্বে ছিল এখনও আছে। যদিও এ শিল্পকে বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হতে হয়। ১৯২০-এর দশকে যেমন দেখতে পাওয়া যায় এই শিল্প মহাজনদের হাতে দৃঢ়মুষ্টিতে বাধা ছিল। ফলে উৎপাদনকারীরা স্বাধীনভাবে বিক্রি করতে পারত না এবং ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হতো। আবার ১৯৪০-এর দশকে দেখা যায় এ শিল্পের কাঁচামালের স্বল্পতা, সম্পদের সুষ্ঠুবণ্টনের অভাব, ব্যয়বহুল পরিবহন খরচ, রপ্তানি সীমিতকরণ, পিতল ব্যবহারকারী হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশ ত্যাগ, সর্বোপরি বিকল্প সামগ্রীর প্রতিযোগিতা সংকটের কারণ। বর্তমানে প্রযুক্তির অগ্রগতির ধারায় অনিবার্যভাবে একাধিক বিকল্পের সৃষ্টি হয়েছে, তাকে ঠেকানো যাবে না। আর তা সমীচীনও নয়। এ শিল্প সম্পর্কে বলা হয় "এই শিল্পকে ধরিয়া রাখিতে হইবে ঐতিহ্যের ধারক হিসেবে। শিল্পের সূক্ষ্মতা দিয়া উপকরণসমূহকে নতুনমাত্রা দিতে হইবে। এমন সমস্ত উপকরণ নির্মাণের দিকে যাইতে হইবে যা বিদেশিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যাহা রপ্তানিযোগ্য পণ্য হিসেবে আদৃত হইতে পারে। ঐ সমস্ত সামগ্রীতে উৎকীর্ণ থাকিবে আমাদের পুরাতন ঐতিহ্যের ধারা"।[৬৬(ক)]

কাঁসা-পিতল শিল্প এখনো পুরানো ছকে বাঁধা-এর বন্দীদশা মোচনের জন্য প্রয়োজন অর্থনৈতিক সংগঠন ও নতুন আঙ্গিকে গোটা শিল্প কাঠামোকে সাজান। নতুন পণ্যসামগ্রী নির্মাণে কিছু বিচ্ছিন্ন উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে। এখন প্রয়োজন এ উদ্যোগকে সংগঠিত এবং ব্যাপকতর করা এবং এ শিল্পের সনাতন ধারাকে তার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা। পরিকল্পিতভাবে বিচ্ছিন্ন সাবেকি কারখানা বা পরিবারকে নতুন আঙ্গিকে উদ্বুদ্ধ করা। শিল্পোত্তীর্ণ পিতলের

Dhaka University Institutional Repository

তৈজসের জন্য বৈদেশিক বাজারের অনুসন্ধান করতে হবে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় যাতে তা টিকে থাকতে পারে, সেজন্য সরকারের সহায়তা প্রয়োজন। এভাবেই দেশের এ ঐতিহ্যবাহী শিল্পকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে।

ঢাকার শঙ্খশিল্প (১৯২১-১৯৭১)

ঢাকার শঙ্খশিল্প সবচেয়ে পুরাতন শিল্প। শঙ্খ থেকে চুড়ি তৈরি করা হতো। যা বিবাহিত হিন্দু রমণীদের পোশাকের অপরিহার্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হতো। চুড়ির চাহিদার কারণেই সব হিন্দু পরিবারগুলি এই শিল্পকে টিকিয়ে রেখেছে। এই চুড়ি বা শাঁখা সারাদেশের হিন্দুরা ব্যবহার করে এবং প্রত্যেকটি জেলায় এটি তৈরি হয়। অন্যান্য জায়গার তৈরিকৃত চুড়ি থেকে ঢাকার শঙ্খের চুড়ির পার্থক্য ছিল। ভালোমানের চুড়িতে স্বর্ণের সাথে মুক্তা, রুবি এবং অন্যান্য মূল্যবান পাথর (হীরা, মণি) বসানো হতো। এর ফলে এর সৌন্দর্য যেমন বৃদ্ধি পেত তেমনি দামও। উঁচু শ্রেণির হিন্দু নারীরা এই চুড়ি ব্যবহার করত। এক জোড়া সাধারণ চুড়ির দাম ১০ আনা থেকে ৪ রুপি পর্যন্ত হতো।[৯৭]

শাঁখারিরা নিজেরা একটি পৃথক প্রথা গঠন করেছিল। জেমস ওয়াইজ উল্লেখ করেন, শাঁখারিরা দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। বড় ভাগিয়া ও ছোট ভাগিয়া। ছোট ভাগিয়ারা আবার সোনারগাঁর শাঁখারি হিসেবে পরিচিত। এরা সংখ্যায় নগণ্য, বড় ভাগিয়ারা নিজেদের বিক্রমপুরের শাঁখারি বলে পরিচয় দিত।[৯৮] এদের তিনশ পঞ্চাশটি পরিবার ছিল। শাঁখারিদের কিছু সংখ্যক ছিল ধনী আর বৃহৎ অংশ ছিল গরিব। শাঁখারিরা ঢাকা শহরের শাঁখারি বাজারে বাস করত। যদিও ঢাকায় শাঁখারিদের আগমন নিয়ে বিভিন্ন গবেষক বিভিন্ন মন্তব্য করেন। জেমস ওয়াইজ উল্লেখ করেন, বঙ্গ অঞ্চলে শাঁখারিরা প্রথম আসে রাজা বল্লাল সেনের সঙ্গে (১১৬০-১১৭৮)।[৯৯] বিক্রমপুরে বল্লাল সেনের প্রাসাদের কাছে একটি জায়গার নাম ছিল শাঁখারি বাজার। সপ্তম শতাব্দীতে মুঘল রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত হলে নতুন শহরে নিষ্কর জমির লোভ দেখিয়ে তাদের বিক্রমপুর ছাড়তে রাজি করানো হয়। জেমস হর্নেল লিখেছেন যে, মালিক কাফুর কর্তৃক টিনেভেলি জেলার হিন্দুরাজ্য পতনের পর চর্তুদশ শতাব্দীতে দক্ষিণভারত থেকে শঙ্খ শিল্পীরা ঢাকায় আগমন করেন।[১০০] আবার দীনেশচন্দ্র সেন এই মতের বিরোধিতা করেন। তাঁর মতে, স্মরণাতীতকাল থেকেই ঢাকায় শঙ্খ শিল্পের কারখানার অস্তিত্ব ছিল।[১০১]

বিভিন্ন গবেষক শাঁখারিদের আগমন সম্পর্কে বিভিন্ন সময়কে চিহ্নিত করলেও একথা বলা যায় যে, শাঁখারিরা অতি প্রাচীনকাল থেকে ঢাকায় বসবাস করত এবং আলোচ্য সময়ে তাদের অবস্থান ঢাকার শাঁখারি বাজারে ছিল এবং এখনো আছে।

শাঁখারিবাজারের রাস্তার দুপাশে শাঁখারিদের ছোট ছোট দোকান ছিল। যেখানে শাঁখারিরা তাদের দ্রব্য তৈরি করত এবং বিক্রি করত। আলোচ্য সময়ের শুরুর দিকে ১৯২০-এর দশকে (১৯২৮) প্রায় ২০০০ লোক এই শিল্পে নিয়োজিত ছিল।[১০২]

এ সময় মানিকগঞ্জের কৃষ্ণপুরা গ্রামে ৩ জন লোক শঙ্খের কাজ করত এবং তারা গড়ে প্রতি মাসে ১০ রুপি আয় করত।[১০৩] আবার ১৯৪৪ সালে ঢাকায় ৩০০০ লোক শঙ্খশিল্পে নিয়োজিত ছিল।[১০৪]

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকার শাঁখা শিল্প ব্যবহারিকভাবে কারখানার ভিত্তির উপর চলত। শাঁখা বা চুড়ি উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে ছিল। একজন মানুষ সব প্রক্রিয়া শেষ করতে পারত না। শঙ্খের অভ্যন্তরের গুরুত্বপূর্ণ অংশ একজন দক্ষ লোক দিয়ে ভাঙা হয় এবং যিনি উৎপাদনের অন্য প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত না/ কাজ করে না। যে লোক শঙ্খ কাটে সে এই পেশাতেই দক্ষ হয় এবং এই কাজেই সীমাবদ্ধ থাকে। সাধারণত শঙ্খগুলোকে বৃত্তাকারে বা গোল করে কাটার পর এর বাইরের অংশ চ্যাপ্টা বেলে পাথরে ঘষে মসৃণ করা হতো এবং ভেতরের অংশও ঘষে মসৃণ করা হতো। ১৯২৯ সালের একটি রিপোর্টে দেখা যায় যে, মাঝে মাঝে শঙ্খের চুড়িকে শিশুদের দ্বারা মসৃণ করা হতো। চুড়ির অলংকরণ দক্ষ কারিগররা তাদের সূক্ষ্ম যন্ত্র দিয়ে করত।

বিশ শতকের বিশের দশকের (১৯২৯) রিপোর্টে দেখা যায় যে, একটি শঙ্খ থেকে সাধারণত ৪টি চুড়ি তৈরি হতো। কিন্তু কখনো কখনো একটি শঙ্খ থেকে ৬-৮ টি চুড়ি কাটা হতো। তবে এটা শঙ্খের আকারের উপর নির্ভর করত।[১০৫] জর্জ ওয়াট উল্লেখ করেছেন একটি শঙ্খ থেকে ৫-৬টি শাখা তৈরি হলেও "... as a rule only one bracelet can be cut from each shell."[১০৬] ওয়াটের তথ্যকে ভ্রান্ত বলে মনে করেন গবেষক শিপ্রা সরকার। কেননা ওয়াট যে তথ্যের উপর ভিত্তি করে *The Commercial Products of India : Indian Art Exibition in Delhi* (1903) শীর্ষক গ্রন্থে শঙ্খ শিল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন তা মূলত দিল্লিতে বসে ঢাকার কারখানায় দীর্ঘদিন কাজ করেছে, এমন একজন ব্যক্তির মুখে শুনে শুনে। তাই শিপ্রা সরকার 'ঢাকার শঙ্খ শিল্প : অতীত ও বর্তমান' শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে, ভালো আকৃতির একটি শঙ্খ থেকে মাঝারি ধরনের শাঁখা যেখানে পাওয়া যায় সর্বোচ্চ ৪টি, সেখানে সরু শাখা পাওয়া যায় ১০টির মতো। তিনি আরো উল্লেখ করেন, সরু শাঁখা কাটার সময় শ্রমিকদের অতিরিক্ত সতর্ক থাকতে হয় এবং বেশি পারিশ্রমিক দিতে হয়।[১০৭]

গবেষক শিপ্রা সরকার ঢাকার শাঁখারি বাজারের প্রভাস কুমারের যে সাক্ষাৎকার নেন তার ভিত্তিতে তিনি শাঁখা তৈরির প্রতিটি পর্যায় সম্পর্কে জানতে পারেন। তিনি শাঁখা নির্মাণের প্রক্রিয়াকে বারটি ধাপে উপস্থাপন করেছেন। নিচে শাঁখা তৈরির ক্রমিক প্রক্রিয়াসমূহ উপস্থাপন করা হলো।

শঙ্খশিল্পের প্রক্রিয়াসমূহ —

১. হাতুড়ি দিয়ে ভাঙা (কুরা ভাঙা) [কুরা হলো এক পাশে হাতল লাগানো লোহার হাতুড়ি]

২. করাত দিয়ে কেটে লম্বা নালটাকে সোজা করা (সোজাকরণ);

৩. গেড়া-পাড়া (গেড়া বের করে ফেলা);

৪. মাঝার ঠোঁট কাটা (মাঝার দেয়া);

৫. ঝাপানি দেয়া (কর্তিত অংশ পাটায় ঘষে চ্যাপ্টাকরণ এবং বাঁকা অংশ যথাসম্ভব সোজাকরণ);

৬. বলয় কাটা (করাত দিয়ে গোলাকৃতি বলয় কাটা);

৭. সলই কাঠের দণ্ডে ঘষে ভিতরের অংশ মসৃণকরণ (হোলাই দেয়া);

Dhaka University Institutional Repository

৮. পাথরে ঘষে বলয়ের বাইরের অংশ মসৃণকরণ;

৯. লোহার রেত দিয়ে নকশাকরণ;

১০. ভিতরের অংশ রেত দিয়ে সতর্কতার সঙ্গে মসৃণকরণ (গোড়া মাজা);

১১. ফাটা বা পোকায়-খাওয়া অংশ ভরাটকরণ, মোম-নাইট্রিক এসিড ও জিঙ্ক পাউডারের দ্রবণের সাহায্যে পুটিং দেয়া;

১২. আগুনের সাহায্যে শাঁখার উপরের অংশ কিছুটা লালকরণ (মালাবাতি)[১০৮]।

আরো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, উপর্যুক্ত পদ্ধতির সাহায্যে ১৯৯০-এর দশকে শঙ্খের চুড়ি ও অন্যান্য অলংকার নির্মিত হলেও একই পদ্ধতিতে আলোচ্য সময়েও তৈরি হতো, যা যা পূর্বেই উল্লেখ্য করা হয়েছে।

দুটি চুড়িতে এক জোড়া হয়। ব্রিটিশ শাসনামলে একজোড়া চুড়ির দাম ছিল ৪ আনা। আর পাকিস্তান শাসনামলে একজোড়া চুড়ির দাম ছিল ৩.৫০-৪.০০ আনা।[১০৯]

শঙ্খ দিয়ে চুড়ি ছাড়াও ব্রেসলেট, আংটি, গলার হার, বোতাম এবং একই ধরনের আরো দ্রব্য তৈরি হতো। চুড়ির জন্য শঙ্খ কাটার পর যে অংশ বাকি থাকে সেই অংশ দিয়ে আংটি, দুল, বোতাম ক্ষুদ্র আকারের কোনো দ্রব্য ইত্যাদি তৈরি করা হতো। এছাড়া এ্যাসট্রে, সিফটিপিন, ঘড়ির চেন, ক্রুস, রুমালদানি প্রভৃতি জিনিস তৈরি করা হতো। এছাড়া শঙ্খের উখা ও টুকরোগুলোকে মালদা ও অন্যান্য জায়গায় পাঠানো হতো। প্রতি মণ শঙ্খ ১ রুপি থেকে ৮ রুপিতে বিক্রি হতো। উৎপাদন প্রক্রিয়ার জন্য যে উখা ব্যবহৃত হয় সে সম্পর্কে বলা হয় যে, শঙ্খের উখা (কাঠ, লোহা বা কঠিন বস্তু মসৃণ করার যন্ত্রবিশেষ) থেকে যে শঙ্খগুঁড়া হতো তা জল বসন্তের চিকিৎসার ও রোগ নিরাময়ের জন্য ব্যবহৃত হতো।[১১০] এ সম্পর্কে জেমস ওয়াইজও উল্লেখ করেন যে, "শঙ্খের পেটে যে পিত্ত থাকে তা প্লিহার ভালো ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হতো। শঙ্খের খোলসের ভাঙ্গা টুকরোগুলো কিনে নেয় মুর্শিদাবাদ থেকে আসা দালালরা। ধনী লোকেরা বাগানে পায়ে চলার পথে কাকরের মত বিছিয়ে দেন এগুলো। ছোট টুকরো দিয়ে তৈরি হয় "মাইট্যা সিন্দুর", আবার বসন্তের দাগ মোচনের জন্য শঙ্খচূর্ণ ব্যবহারের রীতি আছে।[১১১]

শঙ্খ দ্বারা উৎপাদিত শঙ্খের চুড়ি বা হাতের শাঁখার নানা ধরনের নাম পাওয়া যায়। নিচে বিভিন্ন যুগে হাতের শাঁখার বিভিন্ন নামকরণ উল্লেখ করা হলো —

প্রথম যুগ : গাড়া (২ গাছা হতে ৪০ গাছা পর্যন্ত);

মধ্য যুগ : সাতকানা, পাঁচদানা, তিনদানা, বাচ্চাদার, সাদাবালা, আউলাকেশী, ইত্যাদি।

বর্তমান যুগ : সোনা বাঁধানো, টালি, লাইনবোর্ড, চিত্তরঞ্জন, পানবোট, মোড়ানো, সতীলক্ষ্মী, জালফাঁস, হাইসাদার, দানাদার, সাদাশাঁখা, শঙ্খবালা, আইপেটেরন, ইংলিশপ্যাচ, ভেড়াশঙ্খ, শিকলিবালা, নেকলেস বালা, লতাবালা, চৌমুক্ষি, হাসিখুশি, দার্জিলিং, তারচেঁচ, জয়শঙ্খ, পাথরহাটা, গোলাপফুল, মোটালতা, মাজ, মুড়িদার, অঙ্গরপাতা, বেনী-উপবেনী, বাঁশগির, গোলাপ, বালা, নাগরী বয়লা ইত্যাদি[১১২]। কাজিক নামে শঙ্খ শিল্পীদের কলাকৌশলের নিদর্শনগুলি দেশবিদেশে সমাদর লাভ করত। তাদের হাতের কাজ পূর্ববঙ্গের সম্মান বৃদ্ধি করত।

Dhaka University Institutional Repository

শঙ্খশিল্পের কাঁচামাল কতিপয় জায়গায় পাওয়া যেত। যেমন—সিলন, মাদ্রাজ, তারাভানকোর উপকূল, বারোদা রাষ্ট্র। সবচেয়ে বেশি সরবরাহ করা হতো সিলন থেকে কিন্তু ভালোমানের শঙ্খগুলো তারাভানকোর উপকূল ও বারোদা (Baroda) রাষ্ট্র থেকে সরবরাহ করা হতো। যা স্থানীয় বাজারে দোয়ানি (Doani) ও সুরতি (Surti) নামে পরিচিত। একটি রিপোর্টে বলা হয় এই দুটি উৎস থেকে বার্ষিক মোট প্রায় ২০,০০০ শঙ্খ ক্রয় করা হতো। অন্যদিকে সিলন থেকে ১০ থেকে ১১ লক্ষ এবং মাদ্রাজ থেকে ৫ লক্ষ ক্রয় করা হতো।[১১৩] একটি রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে, ঢাকার শ্রমিকরা / কারিগররা লালচে রংয়ের শঙ্খের চেয়ে সাদা শঙ্খ বেশি পছন্দ করত। রং এবং একই মাপের কারণে তারাভানকোরের শঙ্খের স্থান ছিল প্রথমে। এরপর বারোদা ও তুতিকরিন শঙ্খের স্থান। ঢাকার শাঁখারিরা সিলনের শঙ্খ পছন্দ করত না। তবে নিচু মানের চুড়ি তৈরিতে তারা এটা ব্যবহার করত। রামনাদ (Ramnad) মৎস্য খামার থেকে এগুলো সংগ্রহ করা হতো। যদিও এগুলো তুতিকরিন (Tuticorin) শঙ্খের চেয়ে নিম্নমানের তারপরও ঢাকার কারিগররা এগুলো ব্যবহার করত।[১১৪]

সুতরাং দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, বিশের দশকে সবচেয়ে বেশি শঙ্খ সংগ্রহ করা হতো তুতিকরিন ও রামনাদ থেকে। এরপর বারোদা ও তারাভানকোর (Travancore), কিন্তু পরিমাণের দিক থেকে এটা ছিল নগণ্য। বিভিন্ন উৎস থেকে ঢাকার বাজারে যে শঙ্খ সরবরাহ করা হতো তার বার্ষিক পরিমাণ ছিল ১০ থেকে ১২ লক্ষ।[১১৫]

অন্যদিকে গবেষক তোফায়েল আহমেদ, শঙ্খ শিল্পের কাঁচামালের উৎস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, মাদ্রাজ-উপকূল, সিংহল ও মালয় থেকে পুরাকাল হতে শঙ্খ এদেশে আমদানি হয়ে আসছে। সুরাটি, দুয়ানাপটি ও আলাবিলা বোম্বাই থেকে এবং তিতকাড়ি, সিংহল থেকে আমদানিকৃত শঙ্খ উৎকৃষ্ট। এরপর পটি, জাহাজি এবং গরবাকি শঙ্খ ক্রমিকভাবে নিকৃষ্টতর।[১১৬]

১৯৪৮ সালের সরকারি নথিতে দেখা যায় যে, মাদ্রাজের তুতিকরিন (Tuticorin) রামেশ্বর (Rameswar), কালিকর (kalekar), পামবাং (Pambang), এবং সিলন থেকে তেলামোনা (Telamona) মটিসলেমেত শঙ্খ আমদানি করা হতো।[১১৭] বার্ষিক প্রায় ৬,০০,০০০ শঙ্খ দরকার হতো। ১টি শঙ্খের মূল্য ছিল গড়ে ১ রুপি।[১১৮]

সরকারি নথিতে আরো দেখা যায় যে, শঙ্খ, করাত, উখা প্রভৃতি সরবরাহের স্বল্পতার কারণে এই শিল্প সংকটের সম্মুখীন হয়। এই শিল্পকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে মাদ্রাজ, সিলন, বার্মা থেকে শঙ্খ কেনার উদ্যোগ নেয়া হয়। করাত ও ইস্পাতের অন্যান্য যন্ত্রপাতি/ হাতিয়ারও শাঁখারিদেরকে সংগ্রহ করে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন জেমস ওয়াইজ-এর তথ্যের আলোকে উল্লেখ করেছেন যে, ধনাঢ্য শাঁখারিরা সিংহল থেকে শাঁখা কিনে আনতেন। সমুদ্রের যেসব অংশে শাঁখা পাওয়া যেত, সরকার সেগুলিকে লিজ দিতেন। যারা লিজ নিতেন তাঁরা জেলেদের সাহায্যে শাঁখা উঠিয়ে বিক্রি করতেন মহাজনদের কাছে। মহাজনরা আবার শাঁখা সরবরাহ করতেন ঢাকার শাঁখারিদের কাছে।[১১৯]

১৯২৯ সালের একটি রিপোর্টে দেখতে পাওয়া যায় যে, মাদ্রাজের তিনটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান যথা— O. S. M. Mohammad Tambi, J.N. Saik Mohammad এবং K.

Dhaka University Institutional Repository

Venkatasalam Chetty। সিলন (Cylon), তারাভানকোর (Travancore) এবং বারোদা শঙ্খের সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করত। আর Messres J.B. Dutt এবং Hemchandra Kar তুতিকরিন (Tuticorin) এবং রামনাদ (Ramnad) শঙ্খের সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করত। এ সময় (১৯২৮-২৯) শাঁখারিরা শঙ্খ সমবায় সমিতি (Sankha Shamabay Somity) নামে একটি সংগঠন গঠন করেন।[১২০] এই রিপোর্টে আরো উল্লেখ করা হয় যে, "The Department of Industries has evolved a machine for the cutting of the conch-shell bangles by a disc [*sic*] driven by mechanical power and a demonstration of its work has been given successfully at Dacca. As a result several such machines have been installed and are at present working at Dacca. The Department also helped the co-operative society in procuring Tuticorin shells direct from the Madras Fishery Department at a concession rate for several years."[১২১]

দেলোয়ার হাসান তার 'Traditional Business' শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখ করেন যে, ১৯৭০ সালে শঙ্খ শ্রমিকদের ৭টি সমিতি ছিল।[১২২] উল্লেখ্য, ১৯২৪-২৫ সালের একটি রিপোর্টে দেখা যায় যে, ঢাকা শহরে ৮টি শঙ্খ শ্রমিকদের সমিতি ছিল। যার সদস্য সংখ্যা ছিল ২৬৫ জন এবং তাদের মূলধনের পরিমাণ ছিল ৯৫,৮২৯ রুপি। তারা ঢাকা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিয়ন থেকে ৯২,৩২৫ রুপি শঙ্খ ক্রয় করত। যা সদস্যদের মধ্যে তাদের মূলধনের অংশের ভিত্তিতে বন্টন করা হতো। ঢাকা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিয়ন মাদ্রাজ সরকারের সাথে রামনাদ ও তুতিকরিন শঙ্খ কেনার বিষয়ে চুক্তি নবায়ন করতে এ বিভাগকে সাহায্য করত।[১২৩]

১৯৪৮ সালের সরকারি নথিতে দেখা যায় যে, ঢাকার শাঁখারি বাজারের শঙ্খ শিল্প একটি কুটির শিল্প। বাবু ত্রৈলোক্য নাথ ধর শাঁখারি এসোসিয়েশনের (শঙ্খ উৎপাদনকারীদের) সভাপতি ছিলেন। অন্যান্য সদস্য ছিলেন বাবু আর. কে. রায়, ডি. নন্দী, এবং পি. কে. নন্দী। ১৯৪৮ সালে প্রায় ৬০০০ দক্ষ শ্রমিক এ শিল্পে নিয়োজিত ছিল। এদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানের মালিক অথবা টাকার বিনিময়ে শ্রম দিত। এদের উপার্জনের মাধ্যমে এই শিল্প চলত। প্রতিদিনের পারিশ্রমিক ছিল ২ আনা থেকে ২ রুপি। প্রায় সব উৎপাদনকারী, দক্ষ শ্রমিক এবং ক্রেতারা ছিল হিন্দু।[১২৪]

১৯৭০-এর দশকে শ্রীলংকা থেকে শঙ্খ আমদানি করা হতো। শিপ্রা সরকার ঢাকার শাঁখারি বাজারের কয়েকজন শাঁখারিদের সাক্ষাৎকার নেন। তার ভিত্তিতে তিনি যে তথ্য দেন তাতে দেখা যায় যে, ব্রিটিশ আমলে শঙ্খ আসত মাদ্রাজ থেকে, পাকিস্তান আমলে শ্রীলংকা থেকে।[১২৫]

শঙ্খকে গুণগত বিচারে আবার নানা শ্রেণিতে বিন্যাস করা হয়। জেমস হর্নেল বিভিন্ন এলাকার শঙ্খ শিল্পীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে গুণগত বিচারে পাঁচ শ্রেণির শঙ্খের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রাপ্তিস্থান তৎকালীন বাজারদর (১৯১২) প্রভৃতি উল্লেখ করে জেমস হর্নেল লিখেছেন—

The grades of shell sections recognised by bangle workers in outlying districts are usually five in number, and are as followes :

Dhaka University Institutional Repository

First quality, Titkutt—The working sections sold under this title very in price from Rs. 17 to Rs. 22 per 100 pieces according to size and quality—the average working out at about 3 annas each.

The Second quality, termed Jadki, also hails from the Tuticorin and Rameswaram fisheries, but is slightly inferior to the Titkutti grade which forms a "Selected" quality. The price of working sections made from this quality is from Rs. 1 to Rs. 2 per 100 less than similar sized Titkutti ones.

Patti is the 3rd grade, priced from Rs. 2-8 to Rs. 3-8 per 100 sections less than those of the Titkutti grade.

The 4th grade, Dhola is cut from dead shells imported from Ceylon. The price for useful- sized sections rangs from Rs. 8 to Rs. 12 per 100 or from Rs. 5 to Rs. 6 per 100 less than for Patti.

The 5th and most inferior grade is Alabila, cut from the smaller sizes of Jaffna dead shells. The wholesale price varies from Rs. 5 to Rs. 10 per sections.[১২৬]

তোফায়েল আহমেদ বিভিন্ন নামে শঙ্খের শ্রেণিবিন্যাস দেখিয়েছেন। তিতপুতি, রামেশ্বরী, ঝাঁজি, দোয়ানি, মটিসলমত, পটি, গরবেলি, কাচ্চাম্বর, ধলা, ভেজাল, কেলাকার, জামাই পটি, এলপাকার পটি, নয়োখাদ, খগা, সুকি, চোনা নামে শঙ্খের শ্রেণিবিন্যাস করেন।[১২৭]

শিপ্রা সরকার উল্লেখ করেন যে, ঢাকার শঙ্খ শিল্পীরা শ্রীলংকা থেকে আমদানিকৃত তিতকাড়ি শঙ্খকেই সর্বোৎকৃষ্ট শঙ্খ বলে মনে করেন।[১২৮] কিন্তু যতীন্দ্রমোহন রায় সুরতি ও দুয়ানাপটি ও আলাবিলা শঙ্খকেই সর্বোৎকৃষ্ট বলে মনে করেন।[১২৯] জেমস হর্নেল যেখানে আলাবিলা শঙ্খকে নিকৃষ্ট বলে উল্লেখ করেছেন, সেখানে যতীন্দ্রমোহন রায় তাকেই সর্বোৎকৃষ্ট বলেছেন। আবার বিশ শতকের বিশের দশকের একটি রিপোর্টে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, তারাভানকোর (Travancore) ও বারোদা রাষ্ট্রের (Baroda State) সুরতি (Surti) ও দোয়ানি (Doani) শঙ্খ ছিল ভালো মানের। এর মধ্যে রং ও আকারের দিক থেকে তারাভানকোর (Travancore) শঙ্খের স্থান ছিল প্রথমে। যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। আবার *Eastern Bengal District Gazetteeres* (1912) এ উল্লেখ করা হয় যে, The shells are brought from Ceylon, Bombay and the Madras coast. The Bombay shells do-annapati, alla-billa and Surti are the most expensive of all but they are rare, the Titkawri shankha and pati which come from Ceylon are much esteemed, while the Madras shells are cheaper.[১৩০]

কাঁচামাল হিসেবে মাদ্রাজ ও শ্রীলংকা থেকে যে শঙ্খ আমদানি করা হয়, গুণগত বিচারে তার মূল্য ছিল অনেক রকমের। জেমস হর্নেল উল্লেখ করেছেন ২৫০টি শঙ্খের একটি বস্তা

Dhaka University Institutional Repository

বিক্রি হতো পাঁচ টাকা থেকে পঞ্চান্ন টাকার মধ্যে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খেরও মূল্য বৃদ্ধি ঘটেছে। গবেষক শিপ্রা সরকার শাঁখারি বাজারের অলোকনাথ নন্দীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন সময়ের শঙ্খের মূল্য তালিকা উপস্থান করেছেন।[১৩১] উল্লেখ্য, তিনি তিতকাড়ি শঙ্খের মূল্য তালিকা উপস্থাপন করেছেন।

সারণি–১৯

সাল	পরিমাণ	মূল্য
১৯১০	১বস্তা (১৫০টি শঙ্খ)	৪০-৪৫ টাকা
১৯৫৫	১ বস্তা "	৩৫০-৪০০ টাকা

অপরদিকে মাদ্রাজ, শ্রীলংকা, বোম্বে, মালদ্বীপ থেকে ঢাকার শাঁখারিরা কাঁচামাল হিসেবে শঙ্খ আমদানি করলেও আলোচ্য সময়ের আমদানিকৃত শঙ্খের উল্লেখযোগ্য কোনো মূল্য তালিকা পাওয়া যায় নি। অথচ জেমস হর্নেল ১৯১২ সালে প্রকাশিত তার প্রবন্ধে ১৯০৫ থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত আমদানিকৃত শঙ্খের মূল্য তালিকা উল্লেখ করেছেন।

শঙ্খ শিল্পের কেন্দ্র হিসেবে অতীত আমল থেকেই ঢাকার অবস্থান ছিল সর্বোচ্চ। শঙ্খ শিল্পের বিপণন ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও এ কথা সত্য। বহু বছর পূর্ব থেকেই পূর্ববাংলা তথা ঢাকা শহরের শাঁখারি কর্তৃক শঙ্খবলয়সমূহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে রপ্তানি হতো। পূর্ববাংলার শঙ্খপণ্যের খ্যাতি তখন ভারতের সর্বত্র প্রচারিত। ঢাকা শহরের শঙ্খবলয়সমূহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্রয়ের জন্য পাঠানো হতো।

জেমস হর্নেল লিখেছেন, "Dacca, as in Tavernier's day (Seventeenth Century) when it was the capital of Bengal, continues to be the headquarters of the chank-cutting trade and the chief mart for the purchase by dealers and hawkers of the finished article. From Dacca, also are exported to other towns in Bengal large quantities of Swan shell sections in the rough to be carved and finished locally."[১৩২]

এভাবে দেখা যায় যে, ঢাকা থেকে প্রতিবছর শঙ্খ বিভিন্ন স্থানে রপ্তানি করা হতো। ভারতের বিভিন্ন এলাকা ছাড়াও এসব শাঁখা নেপাল, ভুটান, চীন এমনকি আফ্রিকায় রপ্তানি হতো।[১৩৩] কিন্তু আলোচ্য সময়ে কী পরিমাণ রপ্তানি হতো তার কোনো নির্দিষ্ট তালিকা বা তথ্য হাতের কাছে পাওয়া যায় নি/ চোখে পড়ে নি। এ ধরনের তথ্য পাওয়া গেলে শঙ্খ ব্যবসা সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা পাওয়া যেত।

শিপ্রা সরকার ঢাকার শঙ্খ শিল্পের ব্যবসার পাশাপাশি ঢাকায় এই শিল্পের অবস্থান, আয়তন এবং পরিবেশ নিয়েও আলোচনা করেছেন। যা থেকে শঙ্খ ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

পুরানো ঢাকার একটি অপ্রশস্ত সংকীর্ণ গলিতে যুগযুগ ধরে শঙ্খ শিল্পীরা বসবাস করে আসছে। বুড়িগঙ্গা নদীর উত্তর পাড় থেকে সামান্য দূরে প্রায় ৩৫০ গজ দীর্ঘ একটি গলিই ঢাকার শঙ্খ শিল্পের কেন্দ্র। শাঁখারি বাজার নামে খ্যাত এই গলিটি কখনোই খুব পরিচ্ছন্ন ছিল না, ছিল না শহর অঞ্চলের আভিজাত্য। শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিবাহিত হলেও শাঁখারি বাজারের দৈন্যদশা চোখে পড়ে। শাঁখারি বাজারের এই কাল-পরম্পরার দৈন্যদশার চিত্র নিম্নের উদ্ধৃতি থেকে জানা যায়। যা থেকে আলোচ্য সময় সম্পর্কেও তথা ১৯৩৫ ও ১৯৬৮ সালের শাঁখারি বাজার সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩৫ সালে প্রকাশিত দীনেশ চন্দ্র সেন-এর বৃহৎ বঙ্গ (২য় খণ্ড) গ্রন্থে ঐ সময়কায় ঢাকার শাঁখারি বাজার সম্পর্কে উল্লেখ করেন—

"ঢাকার শাঁখারি বাজার সম্পূর্ণরূপে তাহাদের নিজস্ব ছিল—অতি সংকীর্ণ ৩০০ গজ পরিমিত রাস্তার দুই ধারে দ্বিতল, ত্রিতল ও চৌতল, ছোট ছোট ঘরগুলি, শাঁখারিদের বিশেষ করে তাহাদের মেয়েদের অতিশয় ধবধবে শ্বেতবর্ণ, শাঁখা কাটিবার একরূপ অদ্ভুত লৌহের করাত এবং অপরাপর যন্ত্র, শাঁখ কাটার সেই একঘেয়ে শব্দ... এই সকল বৈশিষ্ট্য লইয়া ঢাকার শাঁখারি সম্প্রদায়- বহুযুগ যাবৎ ঢাকার কোতয়ালির নিকটে বাস করিয়া আসিতেছেন। তাহাদের প্রত্যেকের বাড়িতে তখন একটি করিয়া কূপ ছিল। সেই কূপে স্নান এবং সেই গৃহে আহারাদি সমাপন পূর্বক তাহারা শাঁখা তৈরি করিতেন—তাঁহারা কদাচিৎ বাহিরে যাইতেন।"[১৩৪]

অপরদিকে ১৯৬৮ সালে রচিত বুদ্ধদেব বসু তার "গোলাপ কেন কালো" গ্রন্থে শাঁখারি বাজার সম্পর্কে উল্লেখ করেন : "তুমি হয়তো হাসবে শুনে, তবু বলি। বুলবুল, কোনো চৈত্রমাসের দুপুরবেলায় শাঁখারি বাজারের মধ্যে দিয়ে হেঁটেছ কোনো দিন ? কী আশ্চার্য সেই সরু ছোট্ট পুরানো গলিটি, দু-দিক গায়ে গা-ঠেকানো তেতলা-চারতলা চকমিলানো বাড়িগুলো, রোদ ঢুকতে পায় না সেই গলিতে, পা দেয়াপাত্র কেমন একটা সাদা, ভ্যাপসা স্যাঁতস্যাঁতে গন্ধ শাঁখের করাতের ধারালো আওয়াজ সবসময়, হয়তো দুশো বা তিনশো বছর ধরে এই একই শাঁখা তৈরির কাজ করে যাচ্ছে। এরা রোদের অভাবে সিটিয়ে সাদা হয়ে গেছে গায়ের রং। একটি গলির মধ্যে চলছে তাদের বংশানুক্রমে সমস্ত জীবন-জীবিকা অস্তিত্ব অবাক লাগে না ভাবতে।"[১৩৫]

উপরের দুটি উদ্ধৃতি থেকে দুই যুগে রচিত ত্রিশ ও ষাটের দশকে শাঁখারি বাজারের অপরিবর্তনীয় সমধর্মী চিত্র লক্ষ্য করা যায়। যদিও শাঁখারি বাজারের ভবনসমূহ একটি নির্দিষ্ট স্থাপত্য নকশা অনুযায়ী নির্মিত হয়েছে। জেমস ওয়াইজের মতে, শাঁখারিদের যে লাখেরাজ জমি দেয়া হয়েছিল তা ছিল আয়তনে ক্ষুদ্র। সেই আয়তন মেনে নিয়েই নির্মিত হয়েছে তাদের বাসগৃহ। বাড়িগুলির সম্মুখভাগ অনেকটা দুর্গের মতো।

ঢাকার শাঁখারিদের উত্থান-পতনে তৎকালীন সময়ের রাজনৈতিক পরিবর্তন কমবেশি যুক্ত। ত্রিশ ও চল্লিশ দশকের দাঙ্গা এবং স্বাধীনতার যুদ্ধ শাঁখারিদের উপর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভাব ফেলে। শঙ্খ শিল্পী প্রভাস কুমার সুর উল্লেখ করেন যে, ১৩৬৫/৬৬ বঙ্গাব্দ (১৯৫৮) শাঁখারি বাজারের ১৪২টি পরিবারের সকলেই খুব সচ্ছল ছিল। প্রতি পরিবারেই ৩-৪ জন শঙ্খ শিল্পের সঙ্গে জড়িত ছিল। সেই সময় শঙ্খ শিল্পের কারিগর ছিল প্রায় ৫০০ জন।[১৩৬]

অথচ বিশ শতকের শুরুতে ৪০০-৫০০টি পরিবার ছিল। কারণ শাঁখারিদের অনেকে পেশা পরিবর্তন করে অন্য পেশায় চলে গেছে। তাছাড়া ঢাকায় হিন্দু জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং হ্রাসের ফলে শঙ্খ শিল্পের ব্যবসার উত্থান-পতন ঘটে। এক সময় এই শিল্প তার শ্রেষ্ঠত্ব হারিয়েছিল। কারণ দেশভাগের পরে অনেক শাঁখারি বহির্গমন করে। এছাড়া অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত হওয়ার কারণে শাঁখার ব্যবহার কমে যায়। অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন উল্লেখ করেন যে, ঢাকার শাঁখারি বাজার ও তাঁতি বাজারের ভূমি উনিশ শতকে বর্তমান সময়ের

Dhaka University Institutional Repository

বারিধারা, গুলশান, বনানীর আবাসিক এলাকার মত উচ্চমূল্যে বিক্রি হতো। কারণ উভয় জায়গায়ই শঙ্খ এবং স্বর্ণ ব্যবসার কেন্দ্র ছিল। কিন্তু বর্তমানে এই জায়গা খুবই সংকীর্ণ ও জনাকীর্ণ। কোনো স্বাস্থ্যকর অবস্থা নেই। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনী শাঁখারি বাজার গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। স্বাধীনতার পর তারা আবার বসবাস শুরু করে সেই একই জায়গায় কিন্তু আগের সেই জমজমাটভাব আর নেই।[১৩৭] উল্লেখ্য ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় শঙ্খশিল্পী অলোকনাথের দোকানঘর ভস্মীভূত হয়ে যায়।[১৩৮]

বর্তমানে শঙ্খ শিল্পের রপ্তানির হার একেবারে শূন্য। উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী দেশের মধ্যে বিক্রি হয়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা শাঁখারি বাজার থেকে শাঁখা কিনে প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিয়ে যায় বিক্রির উদ্দেশ্যে। এছাড়া বিভিন্ন পূজা-পার্বণ ও মেলা উপলক্ষেও শাঁখার অলংকার ব্যাপকভাবে বিক্রি হয়। বিপণন ব্যবস্থার উন্নতি হলে কুটির শিল্পের এ শাখাটির বর্তমান দৈন্যদশা কেটে যাবে বলে অনেকে মনে করেন। যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করলে অতীতের মত বর্তমানকালেও শঙ্খ উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী বিদেশে রপ্তানি করে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে সক্ষম হবে।

ব্রিটিশ আমলের কয়েকজন প্রসিদ্ধ শঙ্খ কারিগর হলেন—

১. প্রেমচাঁদ সুর

২. দ্বারকানাথ নাগ

৩. কৃষ্ণকুমার

৪. রাম গোপাল সুর

৫. ত্রৈলেক্যনাথ ধর (Trolaiskynath Dhar)।

উৎস : Delwar Hassan (ed.), *Commercial History of Dhaka* 2008, p. 347.

পাকিস্তান আমলের কয়েকজন প্রসিদ্ধ শঙ্খ শিল্পীর নাম —

১. অলোকনাথ নন্দী

২. প্রভাসকুমার বসু

৩. নকুলকুমার সুর

উৎস : শিপ্রা সরকার : 'ঢাকার শঙ্খশিল্প : অতীত ও বর্তমান', *এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, ২য় সংখ্যা, ডিসেম্বর, ১৯৯৭, পৃ. ৬৭।

ঢাকার বোতাম শিল্প (১৯২১-৭১)

প্রাচীন ও আধুনিকযুগের পশ্চিমাদেশের মত ভারতেও পোশাকের ধরন ও বোতামের চিহ্নের মধ্যে পার্থক্য আছে। পুরাতন ঐতিহ্যের ধরনে গঠিত ঢিলে পোশাক, যা পুরো শরীর জুড়ে থাকে এবং ধর্মীয় ভিক্ষুক এবং গোড়া জনগোষ্ঠী দ্বারা এখনও এই পোশাক প্রচলিত আছে। ইউরোপীয়ান ফ্যাশন আগমনের মধ্যদিয়ে ভারতে বোতামের ব্যবহার আসে এবং ঐ যুগের পূর্বে বোতামশিল্প ছিল না। এমনকি কয়েক দশক আগেও বোতাম শিল্প প্রতিষ্ঠান করার

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ ছিল না। যদিও বিপুল পরিমাণে বোতাম অন্যান্য দেশ থেকে ভারতে আমদানি করত। এটা সত্য যে, এ শিল্প প্রচলন করার শুরুর দিককার নিদর্শন যা পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনে খুঁজে পাওয়া যায়। যদিও কোনো ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ছিল না। কাঁচামালের প্রাপ্যতার কারণে নির্দিষ্ট কিছু জায়গায় এই শিল্প গড়ে উঠেছিল। সুতরাং ঢাকার কিছু কিছু এলাকায় কাঁচামালের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ধরনের এবং বিভিন্ন দ্রব্যের (হাড়, শিং, ঝিনুক) বোতাম শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঢাকার কুটির শিল্পের মধ্যে বোতাম শিল্প ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। আলোচ্য সময়ের শুরুর দিকে (১৯২১-৭১) ঢাকায় ব্যাপক বোতাম ব্যবসা হতো। এই বোতাম উৎপাদন ও বিক্রির উপর নির্ভর করে অনেক পরিবার তখন জীবিকা নির্বাহ করত। ঢাকার বোতামের অনেক খ্যাতি ছিল, যা বিদেশেও রপ্তানি করা হতো। ঝিনুক (mother of pearl) দিয়ে বোতাম তৈরি ঢাকার কুটির শিল্পের মধ্যে অন্যতম ছিল। বাংলায় ঝিনুক দিয়ে বোতাম তৈরি পূর্ব থেকেই ছিল। বিশ শতকের বিশের দশকে ঢাকা শহরের উপশহর নারিন্দা, ফরিদাবাদ, একরামপুর ও সুত্রাপুর গ্রামে প্রায় ৩০ জন কারিগর / শ্রমিক তাদের নিজেদের বাড়িতে এ বোতাম তৈরি করত।[১৩৯]

ত্রিশ এবং চল্লিশের দশকেও কেবল কয়েকটি কেন্দ্রে উৎপাদিত হতো। এ শিল্প একসময় সমৃদ্ধি অর্জন করেছিল। কিন্তু পরবর্তীতে ক্রমাগতভাবে এটি হ্রাস পায়। চল্লিশের দশকে এই শিল্পের বাজারে অনেক মন্দা দেখা দেয় ফলে বাংলার এই কুটির শিল্প সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। পূর্ববাংলা ছিল এই শিল্পের প্রধান কেন্দ্র, যেখানে এই শিল্পের উৎপত্তি হয়। যদিও পশ্চিম বাংলায় বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি কেন্দ্রে এই শিল্প গড়ে উঠলেও তা সফল হয় নি। চল্লিশের দশকে কেবল ঢাকা জেলার কয়েকটি গ্রাম এবং ত্রিপুরায় এই শিল্প কেন্দ্রীভূত ছিল।

বিশ শতকের বিশের দশকে ঝিনুকের বোতাম ব্যবসার প্রধান কেন্দ্র হলো লাঙ্গলবন্ধ এবং নারায়ণগঞ্জ মহকুমায়। বোতাম উৎপাদনের প্রধান প্রধান গ্রামগুলো এই অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। চল্লিশের দশকে ঢাকায় ঝিনুকের বোতাম উৎপাদনের জন্য কোনো জায়গা ছিল না। অথচ শিল্প পণ্যের ব্যবসায়িক কেন্দ্র হিসেবে ঢাকার প্রতি ক্রেতাদের মনোযোগ ছিল।

বোতাম উৎপাদনের গ্রামগুলো একটি থেকে আরেকটির দূরত্ব অল্প ছিল। লাঙ্গলবন্ধ থেকে ঢাকা শহরের দূরত্ব ছিল ২০ মাইল। এই জায়গা এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামের সমস্ত পণ্য ঢাকায় আসত এবং সেখান থেকে অন্যান্য কেন্দ্রে পাঠান হতো। বিশের দশকের একটি রিপোর্টে দেখা যায় যে, লাঙ্গলবন্ধ, লালাতি, কাঁমারগাঁও, জীনধরা, তাজপুর, মাধবপাশা, মালিকপারা, কুলচরিত্র (Kulcharitr), কাইফতাল, বারাপারা গ্রামগুলোতে প্রায় ২০০০ লোক বোতাম উৎপাদনের সাথে জড়িত ছিল।[১৪০] অপরদিকে ১৯৪০-এর দশকে প্রায় ২২০০ লোক এই শিল্পে নিয়োজিত ছিল।[১৪১]

যদিও ঢাকার মধ্যে অনেকে সহায়ক পেশা হিসেবে কৃষি কাজ করত। ১৯৪০-এর দশকের রিপোর্টে এই শিল্প পণ্যের শ্রমিকদের সম্পর্কে বলা হয়, "If they were entirely dependent on button making alone, it would be very difficult for them to make both ends meet for the earnings of the industry are not so large

Dhaka University Institutional Repository

now-a-days that many families can obtain a living out of it. In fact the average earning of a worker per week varies between Rs. 1-8 and Rs. 2-8 only."[১৪২]

সুতরাং উৎপাদনকারীদের কাজ সারাবছর সমভাবে কমবেশি চলত কিন্তু শ্রমিকদের বেশির ভাগ কৃষি কাজে জড়িত ছিল। ফলে তাদের বোতাম উৎপাদন ফসল তোলা ও কাটার সময়ে বিঘ্নিত হতো। যারা প্রধান পেশা হিসেবে এই শিল্পের উপর চলত, তাদের সংখ্যা ছিল খুবই সামান্য। তারা প্রতিদিন গড়ে ১০ ঘণ্টা কাজ করত।

সাধারণত নারী, পুরুষ, শিশুরা এই উৎপাদনের সাথে জড়িত ছিল। তবে অনেকসময় বোতাম তৈরির কাজ অনেকাংশে মহিলাদের দ্বারা সম্পন্ন হতো। পুরুষরা শুধু ঝিনুকের খোল কেটে এর আকার দিত। বাকি কাজ মহিলারা সম্পাদন করত। তাছাড়া চিত্রশিল্পীদের একটা বড় অংশ অবসর সময়ে বোতাম তৈরি করত। এভাবে কুটির শিল্পীরা বোতাম তৈরি করে তাদের আয়ের ঘাটতি পূরণ করত।[১৪৩]

১৯৪০-এর দশকের রিপোর্টে দেখা যায় যে, প্রতিমাসে ৭৫০০ গ্রোস বিভিন্ন ধরনের বোতাম তৈরি হতো। এবং এর মূল্য ছিল মাসিক প্রায় ৭০,০০০ রুপির কাছাকাছি।[১৪৪]

বোতাম শিল্পের প্রধান কাঁচামাল হলো ঝিনুক ও পেইসট বোর্ড। ঝিনুক স্থানীয় বাজারে পাওয়া যেত। যেখানে এক শ্রেণির লোক বিডি (Bede) বা বেদুঈন নামে পরিচিত। যাদের খুব কমই স্থায়ী বাড়ি আছে। কিন্তু তারা ঝিনুক বিক্রির জন্য একস্থান থেকে অন্য স্থানে যেত। তারা নদীর তীর অথবা নদীগর্ভ থেকে ঝিনুক সংগ্রহ করত। বুড়িগঙ্গা, মেঘনা এবং পার্শ্ববর্তী জেলার ছোট ছোট নদীগুলোতে বিপুল পরিমাণে ঝিনুক পাওয়া যেত। পদ্মা, যমুনা এবং অন্যান্য ছোট নদী অথবা ময়মনসিংহ, পাবনা, বগুড়ায় এরূপ ঝিনুক পাওয়া যেত। যা স্থানীয় লোকের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হতো এবং ঢাকায় রপ্তানি করা হতো। কেন্দ্রীয় ও পশ্চিম বাংলার জেলার নদী থেকেও কিছু পরিমাণে ঝিনুক সরবরাহ করা হতো। ১৯২৯ সালের একটি রিপোর্টে দেখা যায় যে, মুক্তা ও ঝিনুকের বাজারের কেন্দ্র ছিল ঢাকার পার্শ্ববর্তী থানা ডেমরা। এই সময় ঝিনুক সরাসরি জেলেদের কাছ থেকে অথবা নারায়ণগঞ্জের ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কেনা হতো। এই সময় সিলেটে (বিশের দশক) প্রতিমণ ঝিনুক বিক্রি হতো ৩ রুপি থেকে ৪ রুপি।[১৪৫] অপরদিকে তুগার (Tugar) নদী থেকে যেসব ঝিনুক তোলা হতো তা প্রতি মণ বিক্রি হতো ১ রুপি থেকে ২ রুপি।[১৪৬]

বিশের দশকে (১৯২৯) শ্রমিকরা ঝিনুক থেকে বোতাম তৈরির জন্য যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করত তা ছিল ত্রুটিপূর্ণ এবং তাদের কাজের ধরন ছিল সহজ। যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হতো তাহলো[১৪৭]—

১. খোল কাটার জন্য একজোড়া সাড়াশি;

২. একটি সাধারণ উখা (কোনো বস্তু কাটা বা মসৃণ করার জন্য যন্ত্রবিশেষ);

৩. বিভিন্ন নকশার একটি তুরপুন;

৪. ছিদ্র করার জন্য তুরপুন;

৫. শান পাথর— শান দেয়ার কাজে ব্যবহৃত চক্রাকার পাথর বিশেষ;

৬. কাঠের বাক্স বা ছোট প্যাকবাক্স।

Dhaka University Institutional Repository

বোতাম তৈরির প্রথম পর্যায়ে ঝিনুকের শক্ত খোলসগুলোকে সাড়াশি দিয়ে আধা ইঞ্চি থেকে ১ ইঞ্চি করে কাটা হতো। এরপর এগুলোকে পাটের কাপড়ের ভেতর রেখে কাঠের বাক্সে রেখে দেয়া হতো। সাধারণত কাটা ও ছিদ্র করার সময়ে সাবধানতা অবলম্বন করার জন্য বা পিচ্ছিল থেকে রক্ষা করার জন্য পাটের কাপড় ব্যবহার করা হতো। খোলসের শক্ত টুকরোগুলোকে তুরপুন দিয়ে কেটে চিহ্ন অথবা অসম্পূর্ণভাবে কেটে ফেলা হতো। পরবর্তীতে হাড়গুলোকে সাড়াশি অথবা উখা দিয়ে ঝকঝক করা হতো এবং চূড়ান্তভাবে শানপাথর দিয়ে শান দিয়ে সুসম্পন্ন করা হতো। একটি হাত দিয়ে বোতাম ধরা হতো এবং অন্য হাত দিয়ে পাথরকে চক্রাকারে ঘোরানো হতো। তারপর প্রয়োজন অনুসারে বোতামে তুরপুন দিয়ে ২টি অথবা ৪টি ছিদ্র করা হতো। এভাবে দেখা যায় যে, বিশের দশকে হাতে তৈরি মেশিন/ যন্ত্রপাতি দিয়ে বোতাম তৈরি হতো। বিশের দশকে যে পদ্ধতিতে বোতাম তৈরি হতো ১৯৪০-এর দশকে সেই একই পদ্ধতিতে তথা হাত দিয়ে তৈরির প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতো। সব মিলিয়ে বোতাম তৈরি ৬ ধরনের প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হতো, যা একটি রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, প্রক্রিয়াগুলো হলো[১৪৮]—

a. Blanking
b. Grinding
c. Facing
d. Drilling
e. Smoothing
f. Coloring

রং করা ছাড়া উপর্যুক্ত উপকরণের সাহায্যে হাত দিয়ে সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতো।

বোতামে রং করার ক্ষেত্রেও উৎপাদনকারীদের অসুবিধা ছিল। আমদানিকৃত বোতাম বিভিন্ন ধরনের ও বিভিন্ন রংয়ের হওয়ায় এই বোতামের চাহিদা ব্যাপক ছিল। এটা বলা হয় যে, ঝিনুক রং করার ক্ষেত্রে সংবেদনশীল ছিল না, বা রং করার প্রক্রিয়া শ্রমিকদের জানা ছিল না। কারণ ঝিনুকে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় রং করা হয়। যা ঢাকার কুটির শিল্পীরা জানত না। একারণে দেশীয় বোতাম ভারতের বিশাল বাজারে আমদানিকৃত বোতামের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারত না।

১৯৪১ সালের একটি রিপোর্টে আমেরিকার বোতাম কারখানাগুলোতে যন্ত্রপাতি ও শ্রমিকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যেভাবে বোতাম তৈরি হতো তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে এভাবে— "After the mussels have been cooked and the meat removed, the shells are taken to the factory and stored in sheds. They are then sorted into three different sizes and soaked in barrels of water for three, four or even six days in order that they may be rendered less brittle. They must be used while wet as otherwise they crumble up under the tool. They are next cut or sawn into rough blanks; the shells are usually held with pliers while being cut, but sometimes they are held in the hand. The saws are hollow cylindrical pieces of steel 2 inches wide with a diameter corresponding to the size of the button. At one end these cylinders are provided with fine teeth and are adjusted to lathes in which

Dhaka University Institutional Repository

they revolve. The sawer holds the shell against the saw, blanks are cut out and drop into a receiver. They are then pressed and ground on the back of the blank to remove the skin and produce an even surface. In order to accomplish this each blank has to be held against a revolving emery wheel. Then comes the turning by which the front of the button receives its form, including the central depression. When the holes are drilled the button is complete with the exception of the following and this brings out the natural lustre which was lost in the grinding. It is this lustre which gives the buttons their chief value. The polishing is done by placing the buttons in bulk in large wooden tumblers or kegs in which they are subject to the action of a chemical fluid. As the tumblers rapidly revolve by mutual contact combined with the effect of the fluid, the buttons become highly lustrous, then they are washed, dried and sorted into sizes and grades of quality, and then, after being sewn on cards or packed in paste-board boxes, they are ready for the market."[১৪৯]

একটি রিপোর্টে দেখা যায় যে, ঢাকা শহরে অনেক দালাল ছিল যারা নিজেদেরকে ঝিনুকের বোতাম উৎপাদনকারী হিসেবে প্রচার করত। প্রকৃতপক্ষে তারা বোতাম উৎপাদনকারী ছিল না। যখনই তারা বাইরে থেকে ফরমায়েশ পেত, তখনই তারা লাঙ্গলবন্ধে বোতাম কিনতে যেত এবং যতদূর সম্ভব নমুনা অনুসারে তারা ক্রেতাদের বোতাম সরবরাহ করত। কখনো কখনো এমন হতো যে, তারা প্রকৃত ক্রেতাদের নমুনা অনুযায়ী বোতাম পেত না, ফলে সরবরাহ করতে পারত না। এর ফলে ক্রেতারা অসন্তুষ্ট হতো। এরপর দালালরা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করে এবং নতুন নামে ব্যবসা গড়ে তুলত। আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ঐ সময় ১৯২৯ সালে কুটির শিল্পীদের দ্বারা যে বোতাম তৈরি হতো, তা ত্রুটিযুক্ত ছিল। কারণ বোতামগুলো একই আকার, আয়তন ও ঘনত্বের হতো না, উপরন্তু বোতামের ছিদ্রগুলো একটি থেকে আরেকটি সমদূরত্বে হতো না। এই ত্রুটিযুক্ত বোতামের গুণগত মান উন্নত করার কোনো ব্যবস্থা নেয়া হতো না এবং এগুলো বিক্রির কোনো গুদাম ঘর ছিল না।[১৫০]

১৯৪০-এর দশকের আরেকটি রিপোর্টে দেখা যায় যে, শ্রমিকদের কেউ কেউ উৎপাদনের সব পর্যায় সম্পাদন করত। সাধারণত তারা বোতামে ছিদ্র করা ব্যতীত উৎপাদনের সব পর্যায় সম্পন্ন করত। মহাজনরা তাদের নিয়োগকৃত শ্রমিক/ কর্মচারীদের মাধ্যমে অসম্পূর্ণ বোতামে ছিদ্র করত। শ্রমিকরা তাদের অমসৃণ বোতাম বাজারে ওজন দরে মহাজনদের কাছে বিক্রি করত। ফলে তারা বাজারে মসৃণ, নিখুঁত, মানানসই ও ছিদ্র করা বোতাম বিক্রি করত।[১৫১]

সুতরাং দেখা যায় যে, বোতাম উৎপাদনকারীরা সরাসরি ক্রেতাদের কাছে তাদের উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রি করতে পারত না। বরং মহাজনদের মাধ্যমে বিক্রি করত। অর্থাৎ মহাজনদের দ্বারা পুরো উৎপাদন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হতো।

উৎপাদনের যে-কোনো উন্নতিসাধনের জন্য কুটির শিল্পীদের নিয়ে শিল্পসংক্রান্ত সমবায় সমিতি গঠন করা অপরিহার্য ছিল। কিন্তু বিশের দশকে (১৯২৯) এরূপ কোনো সমবায় সমিতি ছিল না। যাতে করে ঝিনুকের বোতাম ভালোভাবে কার্যকরভাবে বিক্রি হতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

অনুরূপভাবে ১৯৪০-এর দশকেও ঝিনুকের বোতাম শিল্পের শ্রমিকদের নিজস্ব কোনো সমিতি ছিল না। যার মাধ্যমে নিজেদের শিল্পের উন্নতি করতে পারে। ১৯৪১ সালের রিপোর্টেও উল্লেখ করা হয় এভাবে—

"The organization of the industry in the matter of marketing, financing etc., is admittedly very unsatisfactory. The system prevailing, if it can be called a system at all—is subject to the common draw-backs from which most of our cottage industries suffer. The manufacturers that is, the actual workers have no organization among themselves for the purpose of effecting bulk purchases of raw materials or of marketing their products, buy raw materials individually, fashion them into semi-finished products individually and dispose of them individually in the market. The middlemen, that is, the mahajans, buy the semi-finished goods, have them finished by other people and sell them in the market. It is they who are to think of the market for finished goods and what they care about most is the margin of profit which they can retain by taking advantage of the weak position of the workers. They do not feel the uerge for helping the workers to improve the technique of production nor are they so much interested in finding new markets for the products in which they deal."[১৫২]

ধাতুর বোতাম : ধাতুর বোতাম তৈরির জন্য পুরো বাংলায় বিশের দশকে ঢাকার ৩৫/৩৬ নবাবপুরের 'মেসার্স এস. এন. বসাক এ্যান্ড সন্স' সোনা, রূপা এবং ধাতুর (তামা, পিতল এবং দস্তার মিশ্রণে ধাতু) বোতাম তৈরি করত।[১৫৩] ১৯৪০-এর দশকের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে, এই প্রতিষ্ঠানে কেবল ২জন শ্রমিক নিয়োজিত ছিল এবং ৪ মণ পিতলের পাত এবং ২ মণ রূপার পাত বোতাম তৈরিতে ব্যবহৃত হতো। যার মূল্য ছিল যথাক্রমে ১৫০ রুপি এবং ১৫০ রুপি। এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মোট উৎপাদন ছিল ১০০০ গ্রোস বোতাম, যার মূল্য ছিল ২২৫০ রুপি মাত্র।[১৫৪] অপরদিকে বিশের দশকের (১৯২৯) একটি রিপোর্টে দেখতে পাওয়া যায় যে, এই শিল্পে প্রায় এক ডজন লোক কাজ করত। বোতাম উৎপাদনের প্রক্রিয়া গোপন রাখা হতো। কলকাতা থেকে উক্ত কাঁচামাল কেনা হতো এবং ব্যবসায়ী বা দালালদের মাধ্যমে বিক্রি করা হতো।[১৫৫] কিন্তু বোতাম বিক্রি ও সীমিত উৎপাদন থেকে ধারণা করা হয় যে, এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন যথেষ্ট ছিল না।

নিম্নে বিভিন্ন দেশ থেকে ধাতুর বোতাম আমদানির একটি তালিকা দেয়া হলো —

সারণি-২০

Country	1931-32	1932-33	1933-34	1934-35	1935-36	1936-37	1937-38
United Kingdom	Rs. 63,878	Rs. 59,530	Rs. 1,05,246	Rs. 1,03056	Rs. 1,15436	Rs. 97,725	Rs. 98,818
other British possession	74	303	54	93	390	79	1,249

Dhaka University Institutional Repository

Total British Empire	**63952**	**59,833**	**1,05,300**	**1,03,149**	**1,15826**	**97,804**	**100067**
Germany	2,13,608	3,65178	3,28,075	384,846	3,88,467	345,883	3,19198
Italy	9,646	12,180	12,926	7,250	523	889	2,214
Austria	4009	7,902	7,281	6,292	4,486	1,859	12,021
Czechoslovakia	3,10,520	4,11,205	3,74,378	4,53,305	3,02,644	2,59740	472371
U.S.A Via pacific	-	-	722	127	619	-	-
U.S.A via atlantic	30,711	41396	46,506	25,533	15,617	19,378	18,870
Japan	436	12153	76037	68260	71491	104135	49330
other foreign country	2,948	367	3,220	1,236	1,377	2,050	2,444
Total foreign countries	**5,72281**	**8,86722**	**8,49145**	**9,46,878**	**7,85229**	**7,33934**	**8,76448**
Share of Bengal	1,51,344	2,77,300	2,32,043	2,82,674	2,57634	2,00698	1,84358

উৎস : D.N Ghose, *Report on the Button Industry in Bengal,* Department of Industries, Government of Bengal, 1941, p. 7.

কলকাতা এবং উপশহরগুলোতে ধাতুর বোতাম তৈরি হতো। কিন্তু এরূপ বোতাম সীমিত পরিমাণে উৎপাদিত হতো এবং এগুলো সাধারণ বাজারের জন্য তৈরি হতো না ; বরং নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে অর্ডারে তৈরি হতো। তবে এর পরবর্তী দশকগুলোতে বোতাম ব্যবসা কী পরিমাণ হতো সে সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য পাওয়া যায় নি।

ঝিনুক এবং ধাতুর বোতাম ছাড়াও আরেকটি দ্রব্য দিয়ে বোতাম তৈরি করা হতো সেটি হলো শিং ও হাড়। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে এ শিল্পে কয়েক হাজার লোক নিয়োজিত ছিল। হাড়ের চিরুনি, বোতাম ও অন্যান্য সামগ্রী তৈরি ঢাকার একটি প্রাচীন শিল্প। ঢাকার আমলিগোলা, নবাবগঞ্জ, চৌধুরীবাজার, চুড়িহাট্টার মুসলিম পরিবারের শিল্পীরা এই কাজে নিয়োজিত ছিল। বিশের দশকে (১৯২৯) প্রায় ১০০ লোক একাজে নিয়োজিত ছিল।[১২৬]

১৯৪১ সালের একটি রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে, এই শিংয়ের বোতাম শিল্প ঢাকা শহরে কেন্দ্রীভূত ছিল এবং প্রায় ৭০০ লোক এই কাজে নিয়োজিত ছিল। যার মধ্যে আমলিগোলা, নবাবগঞ্জ, চৌধুরীবাজার এবং ভাতের মসজিদের ৬০০ লোক এই কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করত অর্থাৎ তারা কর্মন্যোজীবী (wage earner) ছিল। এই শিল্পের উৎপত্তি হয়েছিল ইউরোপীয় যুদ্ধের সময়ে যখন বিদেশের দ্রব্য সরবরাহ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই বোতাম শিল্প কয়েকবছর ভালো অবস্থানে ছিল। কিন্তু অন্যান্য অভ্যন্তরীণ অসুবিধার কারণে এই শিল্পের অবক্ষয় শুরু হয়।[১২৭]

ঝিনুকের বোতামের মত একই পদ্ধতিতে শিংয়ের বোতাম উৎপাদন পদ্ধতি ছিল ত্রুটিপূর্ণ। শিংয়ের শক্ত অংশ থেকে এরূপ বোতাম তৈরি করা হতো।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবহারিকভাবে বোতাম তৈরির জন্য তারা কোনো যন্ত্রপাতি ব্যবহার করত না। উখা, করাত, ছুরি, লেদ (যে যন্ত্রে কাঠ বা ধাতব খণ্ড ধরে রেখে ধারালো অস্ত্রের মুখে রেখে ঘুরিয়ে আকার দেয়া)। ১৯৪১ সালের একটি রিপোর্টে বোতাম তৈরি সম্পর্কে বলা হয় যে, "The solid portion of the horn is first of all chiselled off to give it a cylindrical shape. It is then fixed by means of a clamp to a hollow horizontal spindle fixed in bearings round which a fiddle is made to pass by which it is given a rotating motion. Buttons are cut out of the solid horn by bringing a chisel to bear against it while revolving. This gives the buttons a polish. No buffing is done. The holes in the buttons are drilled by a bow-drill."[১৫৮]

সুতরাং দেখা যায় যে, শিংয়ের শক্ত অংশ দ্রাঘিমাংশ অনুসারে দুই টুকরো করে কাটা হতো। তারপর টুকরোগুলোকে কাঠকয়লার আগুনে পোড়ানো হতো। যখন শিংগুলো ভালোভাবে উত্তপ্ত বা গরম করা হতো এবং নরম হতো তখন লোহার আংটা দিয়ে চ্যাপ্টা করা হতো। যতক্ষণ পর্যন্ত শিংগুলো ভালোভাবে চ্যাপ্টা না হতো ততক্ষণ পর্যন্ত ভারি ওজনের কিছু দিয়ে চ্যাপ্টা করে থালার মত করে তৈরি করা হতো। শিংয়ের এই থালা ঢাকা শহরের আমলিগোলা, চুড়িহাট্টার ৪০টি পরিবার তৈরি করত (বিশের দশক)। শিংয়ের থালার পুড়ে যাওয়া অংশ ঠাণ্ডা হলে ছুরি দিয়ে সরিয়ে নেয়া হতো। আর এই চ্যাপ্টা অংশ বা থালার মত অংশ দিয়ে বোতাম, চিরুনি তৈরি করা হতো।

বিশ শতকের বিশের দশকে শিংয়ের এই থালা থেকে নারায়ণগঞ্জ বাটন ফ্যাক্টরি (Narayanganj Button Factory) এবং ঢাকা করনেশন বাটন ফ্যাক্টরি (The Dacca Coronation Button Factory) নামে দুটো ফ্যাক্টরিতে বোতাম তৈরি হতো।[১৫৯]

শিল্পপতি আনোয়ার হোসেন তার আত্মজীবনী গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, "ঢাকার শিং নির্মিত শিল্পদ্রব্য যেমন— চিরুনি, বোতাম বিভিন্ন রকম খেলনা আর নস্যির কৌটার চাহিদা ছিল অনেক ; এসব জিনিস ভারতের লক্ষ্ণৌ, কানপুর, দিল্লি, বোম্বে, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ এমনকি বার্মা ও পূর্ব আফ্রিকা পর্যন্ত রপ্তানি হতো। সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হতো বোম্বেতে। ত্রিশ চল্লিশের দশকে ঢাকায় প্রতিমাসে প্রায় ২৯০০ রুপির ১২০ মণের মতো শিং আমদানি করা হতো এবং সেসব শিং থেকে বানানো হতো প্রায় ৭৫,০০০ গ্রোস বোতাম, যার বাজারমূল্য ছিল ৮০,০০০ রুপির কাছাকাছি। তখন দিনে ১০ ঘণ্টা কাজ করে একজন শ্রমিক ২ গ্রোস বোতাম বানাতে পারত। শ্রমিকদের সবাই ছিল মুসলিম। থাকত চুড়িহাট্টা, চৌধুরীবাজার, নওয়াবগঞ্জ ভাটমসজিদসহ আরও অনেক এলাকায়। ৮ আনা থেকে ১২ আনা পর্যন্ত ছিল তাদের দৈনিক বেতন। বর্ষাকালে বৃষ্টির কারণে অন্যান্য ঋতুর মত কাজ করতে পারত না।"[১৬০]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪১ সালের রিপোর্টেও দেখা যায় যে, ১৯৪০ সালে ঢাকার শিংয়ের বোতাম বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হতো। তা নিম্নে দেয়া হলো —

সারণি-২১

এলাকা	কাঁচামাল (প্রতি)	শ্রমিকের সংখ্যা	বার্ষিক উৎপাদন মূল্য (রুপিতে)	রপ্তানিকৃত দেশের নাম
আমলিগোলা, চৌধুরীবাজার, নবাবগঞ্জ, ভাটের মসজিদ, চকবাজার (মোকাম), নারিন্দা, হাজারিবাগ সুবলদাস লেন	১৪০০ মণ মহিষের শিং	৭০০	৮০,০০০ রুপি	লক্ষ্ণৌ, কানপুর, দিল্লি, বোম্বে, কেন্দ্রীয় প্রদেশ, মাদ্রাজ, বার্মা, পূর্ব আফ্রিকা

উৎস : *Report on the Button Industry in Bengal,* 1941, p.9.

১৯৪০ সালে ঢাকায় ১০ জন ডিলার ছিল। যারা কলকাতা থেকে মহিষের শিং আমদানি করত এবং উৎপাদনকারীদের কাছে তা সরবরাহ করত। পূর্ববাংলার গবাদি পশুর শিং বা শিংয়ের শক্ত অংশ আয়তনে খাটো ছিল। মাদ্রাজ এবং আসামে বড় আকারের মহিষের শিং পাওয়া যেত। বিভিন্ন ধরনের শিং বিভিন্ন মূল্যে বিক্রি হতো। প্রতি মণ শিং ১০ রুপি থেকে ৫০ রুপি ছিল। সাদা রংয়ের শিংয়ের অনেক চাহিদা ছিল এবং উচ্চ মূল্যে বিক্রি হতো। প্রতিবছর মোট প্রায় ১৪০০ মণের কাছাকাছি মহিষের শিং লাগত। যার মূল্য ছিল প্রায় ৩৫,০০০ রুপির কাছাকাছি।[১৬১] শিল্পপতি আনোয়ার হোসেন উল্লেখ করেন যে, শিংয়ের বড় অংশ গয়না নৌকা দিয়ে মাদ্রাজ থেকে আমদানি করা হতো। এটি সাধারণত একমাস থেকে দুইমাসে ঢাকায় পৌঁছাত।[১৬২]

শিংয়ের বোতাম বাজারজাতকরণ/ বিপণন ব্যবস্থা প্রধানত স্থানীয় ডিলারদের মাধ্যমে সম্পাদিত হতো। যারা এগুলো উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করত এবং তাদের নিজস্ব ট্রেড মার্কের সিল/ ছাপ থাকত। এগুলো কলকাতা এবং অন্যান্য প্রদেশে সরবরাহ করা হতো। ১৯৪১ সালের একটি রিপোর্টে দেখা যায় যে, ঐ সময় মাত্র ২ জন উৎপাদনকারী ম্যানুফ্যাকচারিং বা বোতাম ব্যবসায়ী, যারা তাদের ফিনিসড দ্রব্য সরাসরি কলকাতায় বিক্রি করত। ঢাকার শিংয়ের বোতামের বাজার বিস্তৃত ছিল। এই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে, ঢাকার বোতাম, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, দিল্লি, বোম্বে, কেন্দ্রীয় প্রদেশ মাদ্রাজ, এমনকি বার্মা এবং পূর্ব আফ্রিকায় রপ্তানি করা হতো। ঢাকার উৎপাদিত বোতামের বড় অংশ বোম্বে যেত।[১৬৩]

একটি রিপোর্টে বাজারের ব্যাপ্তি সম্পর্কে বলা হয় যে, ঢাকার বোতাম ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। কিন্তু বোতাম উৎপাদনকারী শ্রমিকদের অবস্থা বেশ খারাপ ছিল। যথাচিত প্রচারের অভাবে শিল্পের সম্ভাব্য ভালো চাহিদা থাকা সত্ত্বেও উৎপাদনকারীরা লাভের অংশ থেকে বঞ্চিত হতো। আর দালালরা লাভের বড় অংশ নিত।[১৬৪]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪০ সালের বোতাম উৎপাদনের মূল্য নিম্নে দেয়া হলো —

সারণি-২২

Cost of Production —A typical case :-Stock : I maund of horns :

(a) Total receipts	Rs.	a.	p.
3 grosses of best quality coat buttons at Rs. 2-8	7	8	0
11 grosses of 2nd quality coat buttons at Rs. 1-8	16	8	0
3 grosses of inferior quality at 15 as	2	13	0
4 great grosses of shirt buttons at Rs. 3-14	15	8	0
4 grosses of ivory type buttons at 10 as	2	8	0
Horn dust	0	2	0
Total	**44**	**15**	**0**
(b) Total Expenditure			
Cost of 1 maund horn	12	0	0
Labour cost of 17 grosses of coat buttons	10	10	0
Labour cost of 4 great grosses of shirt buttons	12	0	0
Labour cost of 4 grosses of Ivory type of buttons	1	8	0
Drilling charges	0	8	6
Colouring charges	0	1	6
For fitting on paste boards	0	8	0
Total	**37**	**4**	**0**
Total Profit (a-b)	**7**	**11**	**per maund**

উৎস : *Report on the Button Industry in Bengal*, Calcutta 1941, p. 10.

১৯৪৮ সালের সরকারি নথিপত্রের এক জরিপেও দেখা যায় যে, দেশভাগের আগে পূর্ববাংলায় শিংয়ের পরিমাণ ছিল ৩০০০ মণ-এর কাছাকাছি। প্রায় ৪০টি প্রতিষ্ঠান মহিষের শিং থেকে বোতাম ও চিরুনি উৎপাদন করত। ১৯৪১ সালের মতই উৎপাদিত এসব দ্রব্য কলকাতা, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, দিল্লি, বোম্বে, কেন্দ্রীয় প্রদেশ, মাদ্রাজ এমনকি পূর্ব আফ্রিকায় রপ্তানি করা হতো।[১৬৫]

সরকারি নথিপত্রে আরো উল্লেখ করা হয় যে, পূর্বে মাদ্রাজ ও আসাম থেকে শিং আমদানি করা হলেও দেশভাগের পর তা বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে এই শিল্প বড় ধরনের সমস্যায় পড়ে। বিদেশি বাজার প্রতিযোগিতায় বোতাম ও চিরুনি শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ছিল না। কারণ বিদেশি দ্রব্যের আমদানির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ না করায় প্লাস্টিকের বোতাম (Celluloid button) ও চিরুনির আকর্ষণীয় দাম (কম দাম) ও জনপ্রিয়তার কারণে শিংয়ের বোতামের চাহিদা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।[১৬৬]

Dhaka University Institutional Repository

এই সময় শিংয়ের বোতাম ও চিরুনি উৎপাদনকারীরা প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতির অভাবে তারা তাদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে পারছিলেন না। যেমন— মহিষের শিং ও উখা (files)। শিং, হাড় এবং খুরের প্রধান রপ্তানিকারক এজেন্সি হলো [১৬৭]—

১. ইউসুফ হারুন এন্ড সন্স (Yousof Haroon & Sons)

২. র‍্যালি ব্রোস লি. (Ralli Bros Ltd.)

৩. ডেভিড সেশন এন্ড কোম্পানি লি. (David Sesson & Co. Ltd.)

৪. বারজো রোডেশ্বর কো. (Burjo Rodoashar & Co.)

৫. মিয়া মোহাম্মদ এন্ড সন্স (Main Mohammad & Sons, Yaka Root Gate, Peshawar City)

বোতাম উৎপাদনকারীরা এই সময় (১৯৪৮) বিদেশি দ্রব্যের উপর কর আরোপের মাধ্যমে শিল্পকে রক্ষা করার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানায়।

এদিকে ১৯৬৩ সালের পাকিস্তান শাসনামলে পুরানো ঢাকার বিভিন্ন অংশে ১৬টি শিল্পের বার্ষিক একটি তালিকা দেয়া হয়। যদিও এগুলোর অনেক প্রতিষ্ঠানে চিরুনি উৎপাদনের প্রক্রিয়া চলত।

আবার ১৯৬৯ সালের *ঢাকা গেজেটিয়ারে* কয়েকটি বোতাম কারখানার তালিকা দেয়া হয়, এগুলো হলো —

1. Bengal Buttons and Comb Manufacturing Company, Amligola, Dacca.
2. City Button Co., Nawabpur, Dacca.
3. Dacca Button Syndicate, Rupchand Lane, Dacca.
4. Dacca Co-operative Bastan Silp Syndicate, Amligola.
5. East Bengal Button Factory, Sutrapur.
6. Home made Button Manufacturing Company, Farashganj.
7. Faruque Industries, Chawk Circular Road.
8. Jahangirnagar Button Manufacturing, Postagola.
9. Jupiter Button Manufacturing, Sutrapur.
10. Kamal Button Manufacturing, Nawabpur.
11. Muslim Button Factory, Urdu Road.
12. Orient Button Factory, Faridabad.
13. Star Button Factory, Kalutola.
14. Victoria Button Factory, Narinda.

উৎস : S.N.H. Rizvi, *East Pakistan District Gazetteers, Dacca*, 1969, p.215.

শিল্পপতি আনোয়ার হোসেন তার আত্মজীবনী গ্রন্থে আরো উল্লেখ করেন যে, ১৯৪৫ সালের ৫৪ জগন্নাথ সাহা রোডের বাসায় প্রতিষ্ঠিত হয় শিংজাত শিল্পকর্মের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালিত হতো আজাদ মুসলিম ক্লাবের কর্মসূচি হিসেবে, পরে ১৮৩, জগন্নাথ সাহা রোডে স্থানান্তরিত করা হয় এই কেন্দ্রকে। আর পরিচালনা করতেন সাহাদাত নামের একজন ক্লাব সদস্য। তাঁর কাছ থেকে শিংজাত পণ্য সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি করতে শুরু করেন হুমায়ূন নামের এক লোক। একসময় শিংজাত পণ্য বানানোর কায়দাটা

Dhaka University Institutional Repository

শিখে ফেলেন হুমায়ূন। তিনি নিজেই ঘর সাজানোর বিভিন্ন উপরকণ বানাতে আরম্ভ করেন শিং দিয়ে, সাহাদাত মারা যাওয়ার পর তার স্ত্রী সালমা আক্তার দায়িত্ব নেন এ ব্যবসার।[১৬৮]

স্থানীয় মহাজনদের মাধ্যমে বোতাম ব্যবসা নিয়ন্ত্রিত হতো। স্থানীয় বাজারের পাশাপাশি মহাজনরা বাইরের অর্ডার নিতেন। এ সময় যারা বোতাম ব্যবসার সাথে জড়িত ছিলেন তারা এ শিল্পের জন্য একটা সংগঠনের অভাব অনুভব করেন। রহিম মহাজন (বোতাম ও চিরুনি ব্যবসায়ী) নামে একজন ঢাকার বড় ব্যবসায়ীর উদ্যোগে ১৯৩৯ সালে ২১ মার্চ প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা কো-অপারেটিভ বিষাণ শিল্প সমিতি।[১৬৯] এটি মূলত শিংজাত শিল্পসম্পর্কের সমবায় সমিতি। এ সমিতির দায়িত্ব ছিল শ্রমিকদের ঋণ ও অগ্রিম দেওয়া এবং উৎপাদিত নিখুঁত দ্রব্য বাজারজাত করার জন্য সমিতির সব সদস্যদের কাঁচামাল ক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

উল্লেখ্য, শিল্পপতি আনোয়ার হোসেন উল্লেখ করেন যে, সমিতির জন্য বাড়ি ভাড়া নেয়া হয়েছিল রহিম মহাজনের বাড়ি। প্রথমদিকে মাসে ২টাকা বাড়ি ভাড়া দেয়া হতো। পরে ১০টাকা করে দেয়া হতো। এই সমিতির হিসাবরক্ষকের দায়িত্ব পালন করতেন আহমেদ উল্লাহ। হাফেজ মুসা, হাফেজ মুহাম্মদ, হাজী নূর আহমেদ, বড় খাঁ সাহেব, ছোট খাঁ সাহেবের মত গণ্যমান্য লোকেরা সমিতির সদস্য ছিলেন। প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে সমিতির সদস্য ফি ছিল ২টাকা। সমিতির রেজিস্ট্রেশন নম্বর ছিল ২।[১৭০]

তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর এই সমিতির গুরুত্ব বেড়ে যায়। শিংয়ের বোতাম ছিল খুবই মজবুত। ব্রিটিশ সৈন্যসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সৈন্যদের ইউনিফর্মেও ব্যবহৃত হতো এই বোতাম। কিন্তু মধ্যস্বত্বভোগী এবং বিশ্বযুদ্ধ শেষে সংকর ধাতু, গাটা পাচা ও প্লাস্টিক দিয়ে মেশিনে বানানো আমদানিকৃত বিকল্প দ্রব্যের কারণে এই শিল্প আস্তে আস্তে একসময় বন্ধ হয়ে যায়। আর শিংয়ের বোতামের চাহিদা হ্রাস পাওয়ায় কারিগরদের পক্ষে সমিতির বাড়িভাড়া দেয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে বেশ কয়েক বছর পর এই সমিতি চৌধুরী বাজারের সুবল দাস রোডে, নিজস্ব জমিতে ভবন তৈরি করে নিজেদের কার্যক্রম নতুনভাবে শুরু করে।[১৭১]

বাংলা সরকার এই সমিতি সম্পর্কে বলেন, "The Association has great posibilities if only the workers adhere to its principles and act accordingly with honesty and perseverance. It has not as yet begun to function actively. So its achievements have yet to be watched and a waited."[১৭২]

সুতরাং দেখা যায় যে, অন্যান্য বোতাম (ঝিনুক) শিল্পের সমিতি না থাকলেও শিংয়ের বোতাম শিল্পের সমিতি ছিল। এই সমিতির মাধ্যমে এই শিল্পের উন্নতি সাধনের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা নেয়া হতো।

ঢাকার শিংয়ের বোতাম ব্যবসা বিশ, ত্রিশ, চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ব্যাপক খ্যাতি লাভ করলেও দেশভাগের পর বা পাকিস্তান আমলে তা সীমিত আকারে টিকে ছিল। এর প্রধান কারণ বিদেশি দ্রব্যের আমদানি। বিকল্প দ্রব্য হিসেবে প্লাস্টিকের ব্যাপক চাহিদা, কাঁচামালের অভাব, অবাধ আমদানিনীতি, যন্ত্রপাতির অভাব, কাঁচামালের উচ্চমূল্য প্রভৃতি কারণে ঢাকার শিংয়ের বোতাম শিল্প বন্ধ হলেও এখনও ঢাকার আমলিগোলায় মহিষের শিং দিয়ে লাঠি তৈরি হয়। মহিষের শিং ঢাকায় আসে চট্টগ্রাম থেকে। এরপর পোস্তার চামড়া ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে মহাজনরা ক্রয় করে। আগে যেখানে শিংয়ের মণ ছিল ৩০০ টাকা,

Dhaka University Institutional Repository

পরে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৬০০-৮০০ টাকা। একটা লাঠিতে খরচ পড়ে ১৮০ টাকা, বিক্রি হয় ২০০ টাকা। বর্তমানে ৪০০ থেকে ১০০০ টাকা।[১৭৩] দিনে প্রতিজন ২টি মহিষের শিংয়ের লাঠি তৈরি করতে পারে। এই লাঠি এখনও অনেকের কাছে জনপ্রিয় এবং শখের বস্তু।

সিপ বোতাম : হাড়, শিং, ঝিনুক ও ধাতুর বোতাম ছাড়াও আরেক ধরনের বোতাম ছিল সিপ বোতাম (Seep Button)। যা ১৯৪৮ সালের সরকারি নথিতে দেখতে পাওয়া যায়। সিপ বোতাম উৎপাদন একটি গুরুত্বপূর্ণ কুটির শিল্প। যা ঢাকার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। এই শিল্পের প্রধান কেন্দ্র ছিল লাঙ্গলবন্ধ। অতীতে ৬০-৭০ বছর এ ব্যবসা সমৃদ্ধি লাভ করে। এই শিল্পের ৯৫% কারিগর ছিল মুসলমান।[১৭৪] প্রায় ১০,০০০ পরিবারের ২৫,০০০ লোক প্রতিনিধিত্ব করত। এরমধ্যে নারী ও শিশু এই শিল্পে নিয়োজিত ছিল। এটি ছিল একটি দীর্ঘ স্থায়ী শিল্প।

লাঙ্গলবন্ধে বোতামের মোট উৎপাদন ছিল ৩০০ গ্রোস এবং আলিপুরে প্রতি সপ্তাহে ২০০০ ডজন। যার মূল্য ছিল যাথাক্রমে ১৫,০০০ রুপি এবং ১০,০০০ রুপি।[১৭৫] বোতামের স্থানীয় বাজার ছিল সূত্রাপুর, আলিপুর, লাঙ্গলবন্ধ। এই বোতাম ভারতীয় বিভিন্ন রাজ্য ছাড়াও আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশে রপ্তানি হতো। এই বোতামের কাঁচামালের উৎস ছিল ভারতের মেদেনীপুর, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, পাবনা, সিলেট প্রভৃতি অঞ্চল। তবে বেশিরভাগ বোতাম স্থানীয় দালাল ও ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে কলকাতায় রপ্তানির জন্য পাঠানো হতো।

এই বোতাম তৈরিতে নিম্নলিখিত দ্রব্য ব্যবহৃত হতো[১৭৬]—

১. এলুমিনিয়াম
২. নাইট্রিক এসিড
৩. পিচবোর্ড বা শক্ত কাগজ
৪. সোডা
৫. নীল
৬. কেরোসিন তেল
৭. সেলাই সুতা
৮. উখা (কাঠ, লোহা বা তজ্জাতীয় কঠিন বস্তু মসৃণ করা বা কাটার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রবিশেষ)
৯. পেপার
১০. চুনাপাথর।

সিপ বোতামের একটি সংগঠন ছিল লাঙ্গলবন্ধে। যার নাম ছিল লাঙ্গলবন্ধ সিপ বোতাম মেনুফ্যাকচার এন্ড ডিলার এসোসিয়েশন (Langalband Seep Button Manufacture and Association)-এর সচিব ছিলেন বাবু অবনী কুমার ভৌমিক।[১৭৭] তবে এসোসিয়েশন সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায় নি।

এই শিল্পও নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়। দ্রব্যের উচ্চমূল্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাবে সমস্যা দেখা দেয়। তাই চল্লিশের দশকে এই শিল্পকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে কাঁচামাল সরবরাহ ও শ্রমিকদের বিভিন্ন প্রয়োজন মেটানোর উপর জোর দেয়া হয়। ধাতু, ঝিনুক, শিংয়ের বোতাম ছাড়াও আরো কয়েক ধরনের বোতাম সীমিত পরিমাণে বিশেষ

Dhaka University Institutional Repository

কোনো উদ্দেশ্যে ও উপলক্ষে তৈরি হতো। শঙ্খ দিয়ে শাঁখারিরা বোতাম তৈরি করত। যা সাধারণ বাজারের জন্য তৈরি করা হতো না। সাধারণত বিশেষ কোনো ক্রেতার অর্ডার নিয়ে তৈরি করা হতো। হাঁতির দাঁত দিয়েও বোতাম তৈরি হতো। প্রধানত অলংকরণের জন্য এর বাণিজ্যিক সম্ভাবনা কমই ছিল। কিছু বোতাম কাঠ দিয়ে তৈরি হতো। কিন্তু বাজারের প্রতি এসব দ্রব্যের দৃষ্টি কম ছিল। চল্লিশের দশকে সেলুলয়েড বা প্লাস্টিকের বোতাম তৈরি শুরু হয়। সেলুলয়েডের বোতাম প্রধানত আমদানি করা হতো। কিন্তু কলকাতা ও যশোরে কিছু সেলুলয়েডের কাজ যা বাণিজ্যিক পরিসরে তৈরি হতো। মাঝে মাঝে সীমিত পরিমাণে অর্ডার দিয়েও তৈরি করা হতো। দেলোয়ার হাসান উল্লেখ করেন যে, সেলুলয়েডের (Celluloid) বোতাম উৎপাদন বাংলার বোতাম শিল্পে নিয়মিত হতে পারে নি। কিন্তু চল্লিশের দশকে প্লাষ্টিকের (সেলুলয়েডের) বোতাম প্রচলনের কারণে এখানকার বোতাম শিল্পের অবনতি শুরু হয়/ সমস্যার সম্মুখীন হয়।

উপর্যুক্ত পাঁচটি শিল্প সম্পর্কে আলোচনা শেষে দেখতে পাওয়া যায় যে, চামড়া ছাড়া অন্যান্য চারটি শিল্প ব্রিটিশ যুগে ব্যাপক সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। শঙ্খ শিল্প ব্রিটিশ যুগে বা বিশ শতকের শুরুতে অনেক লোক এ পেশায় নিয়োজিত ছিল। ফলে এই শিল্পকে কেন্দ্র করে একটি নির্দিষ্ট এলাকা (শাঁখারি বাজার) ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। যদিও পূর্ববাংলার অন্যান্য অঞ্চলে শাঁখা তৈরি হতো কিন্তু ঢাকার তৈরি শাঁখা পূর্ববাংলা বা পূর্ব পাকিস্তান ছাড়া অন্যান্য অঞ্চলে খ্যাতি অর্জন করে যা রপ্তানি করা থেকে বোঝা যায়। ফলে একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির (শাঁখারি) সৃষ্টি হয়। যে শ্রেণি এই অঞ্চলের ঢাকার অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখে। পরবর্তীতে বিভিন্ন কারণে (স্বাধীনতা যুদ্ধে শাঁখারিদের দেশ ত্যাগ, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার অভাব) এই শিল্পের অবনতি দেখা দেয়। অপরদিকে বোতাম শিল্পও ব্রিটিশ যুগে বা বিশ শতকের ত্রিশ চল্লিশ দশকে ব্যাপক সমৃদ্ধি লাভ করলেও পরবর্তীতে এই শিল্প ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। বিশেষ করে হাড়, শিং ও ঝিনুকের পরিবর্তে প্লাস্টিকের বোতাম প্রচলন হলে। এভাবে কাঁসা ও পিতলের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা লক্ষ করা যায়। এদিকে চামড়া শিল্পের দিকে তাকালে দেখতে পাওয়া যায় যে, ব্রিটিশ যুগে পূর্ববাংলার কাঁচা চামড়া কলকাতায় পাঠানো হতো। সেখান থেকে চামড়া পাকা করে বিভিন্ন দেশে পাঠানো হতো। দেশভাগের আগে এ অঞ্চলে চামড়া পাকা করা হতো না। কেবল খারি লবণ দিয়ে চামড়া সংরক্ষণ করা হতো। দেশভাগের পরে ঢাকায় প্রথম ট্যানারি শিল্প গড়ে ওঠে। এ ট্যানারিকে কেন্দ্র করে চামড়া ব্যবসা গড়ে ওঠে। তবে একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন ট্যানারি শিল্প গড়ে উঠলেও পাকিস্তান আমলে আধুনিক পদ্ধতিতে/ আধুনিক যন্ত্রপাতিতে চামড়া ট্যান করতে যা বুঝায় তা হতো না। কেবল চামড়াকে কাঁচামাল হিসেবে পাঠানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হতো। দেশভাগের পর কলকাতায় চামড়া রপ্তানি বন্ধ হয়ে যায় এবং করাচিতে চামড়া রপ্তানি শুরু হয়। পূর্বে যেখানে কলকাতা থেকে বিভিন্ন দেশে চামড়া রপ্তানি করা হতো, পাকিস্তান আমলে সেখানে করাচি থেকে রপ্তানি করা হতো। আর এই চামড়া ব্যবসা করে যে লাভ হতো তার সিংহভাগ পশ্চিম পাকিস্তানিরা ভোগ করত। অপরদিকে পাকিস্তান সরকার চামড়া শিল্পে নিয়োজিত বাঙালিদের তেমন পৃষ্ঠপোষকতা দিত না। বরং ঐ সময় যেসব ট্যানারি গড়ে ওঠে তাতে পাকিস্তানিদের আধিপত্য বা প্রাধান্য ছিল। পাকিস্তান আমলের এই অভিজ্ঞতা নিয়েই পরবর্তীতে বাংলাদেশে আধুনিক ট্যানারি গড়ে ওঠে। বর্তমানে এই চামড়া শিল্পের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। উপর্যুক্ত পাঁচটি শিল্পের প্রতি পৃষ্ঠপোষকতা এবং সরকার

Dhaka University Institutional Repository

যত্নশীল হলে তার হারানো ঐতিহ্য ফিরে পাওয়া সম্ভব। পরিশেষে বলা যায় যে, নতুনত্ব যেমন গ্রহণ করা উচিত তেমনি সাথে সাথে পুরানো ঐতিহ্যকেও গুরুত্ব দেয়া উচিত।

তথ্যনির্দেশ

১. রাজশেখর বসু, *চলন্তিকা*, এম. সি. সরকার এন্ড সন্স প্রা. লি., কলিকাতা, ১৩৮৯, পৃ. ১৪৭।

২. মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিন, *কুটির শিল্প*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ১২।

৩. *ঐ*, পৃ. ১১।

৪. *Report of the Census of Manufacturing Industries in East Pakistan for* 1954 Issued by Provincial Statistical Board and Bureau of Commercial and Industrial, Intelligence, East Pakistan, 1960, p. 01. *(DUL)*

৪ক. John Arthur Wilson, *Modern Practice in Leather Manufacture,* Reinhold Publishing Corporation, 1941, pp. 15-16.

৪খ. *ঐ*

৪গ. J. H. Sharphouse, *The Leather Workers Handbook*, Leather Producers Association, 1964, p. 1.

৪ঘ. S. S. Dutta, An *Introduction to Physical Testing of Leather*, 1990, p. 88.

৫. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *ঢাকা ইতিহাস ও নগরজীবন* (১৯৪০-১৯২১), একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবলিশার্স লাইব্রেরি, ঢাকা ২০০৬, পৃ. ১০৮।

৬. শেখ মাকসুদ আলী (সম্পাদিত), *বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার, বৃহত্তর ঢাকা*, [প্রাকৃতিক, আর্থ-সামাজিক ইতিহাস] বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ১৯৯৩, পৃ. ৪৪৭।

৭. *ঐ*, পৃ. ৩৮৩।

৮. S.N.H. Rizvi, *East Pakistan District Gazetteers, Dacca,* 1969, p. 209. *(DUL)*

৯. *Report on the Survey of Cottage Industries in Bengal*, Second Edition, Bengal Secretariat Book Depot., Calcutta, 1929, p. 72. *(NAB) (DUL)*

১০. *ঐ*, p. 72.

১১. *ঐ* , p. 72.

১২. *ঐ*, p. 72.

১৩. *ঐ*, p. 72.

১৪. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *ঢাকা*, পৃ. ১০৮।

১৫. *B. Proceedings,* B # 07, File No. 21-5 of 1948, List : 105, Sub : Industrial Policy, Department : Commerce, Branch : Industry, Government of East Bengal, Year : B January 1954, *National Archives of Bangladesh.* p. 10. *(NAB)*

১৬. *ঐ*, p. 9.

১৭. *ঐ*, p. 9.

Dhaka University Institutional Repository

১৮. ঐ, p. 9.

১৯. *B. Proceedings*, B# 10, List No. 105, File No. 21-23 of 1950, Sub: Industrial Estates in Pakistan, Branch: Industry, Dept: Commerce, Government of East Bengal, p. 05. *(NAB)*

২০. *দৈনিক আজাদ*, মঙ্গলবার, ২৫ এপ্রিল ১৯৫০, পৃ. ০৬ ।

২১. *B: Proceedings*, B # 10, File No: 2I-23 of 1950, List No. 105, Sub: Industrial Estates in Pakistan, Branch: Industry, Department: Commerce, Government of East Bengal, year: B August 1954, p. 05.

২২. ঐ, p. 05.

২২ক. S.N.H Rizvi, *East Pakistan District Gazetters, Dacca,* 1969, p. 219.

২৩. *Report of the Census of Manufacturing Industries in East Pakistan for 1954*, Issued by Provincial Statistical Board and Bureau of Commercial and Industrial Intelligence, East Pakistan, 1960, pp. 306-307. *(NAB)*

২৪. সাক্ষাৎকার : হারুন-অর-রশিদ (৫৭) MD. Lexco Tannery Limited, 146 Hazaribagh, Dhaka, Date : 03.07.2011.

২৫. সাক্ষাৎকার : হামিদ উদ্দিন (৭২), প্রাক্তন ব্যাংকার (হাবিব ব্যাংক), সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ০৫-০৭-১১ ।

২৬. সাক্ষাৎকার : মাহবুব রায়হান (৩৪) B: Sc Eng. Leather of Technologist, Lexco Tannery, and Bashir Ahmed (55) Lexco Tannery Limited, 145 Hazarihagh, Dhaka, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ০৩-০৭-১১ ।

২৭. সাক্ষাৎকার : আকবর হোসেন (৫৭), Paramount Tannery, Hazaribagh, Dhaka. সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ০৩-০৭-১১ ।

২৮. S.N.H. Rizvi, *East Pakistan District Gazetteers, Dacca*, 1969, p. 206.

২৮(ক). সাক্ষাৎকার : নূর মোহাম্মদ (৬০), টেকনিশিয়ান, বাংলাদেশ কলেজ অব লেদার টেকনোলোজি, ৪৪ হাজারিবাগ, ঢাকা-১২০৯, তারিখ : ১৭.০৯.১১

২৯. *B Proceedings,* B # 09, File No. 1C-8 (iii) of 1952, List No. 105, Sub: Committee of Leather and Rubber Goods Industries, Branch: Industry, Department : Commerce, Government of East Bengal, Year: July 1954, p. 4. *(NAB)*

৩০. *দৈনিক আজাদ*, রবিবার ৯ এপ্রিল, ১৯৫০, পৃ. ৩ ও ৪ ।

৩১. *দৈনিক আজাদ*, মঙ্গলবার ১১ এপ্রিল, ১৯৫০, পৃ. ০৫ ।

৩২. *Pakistan Trade,* October 1960, pp. 254-262. *(DUL)*

৩৩. *Pakistan Trade,* Vol. XII, February 1961, No. 2, p. 68. *(DUL)*

৩৪. *দৈনিক পূর্বদেশ*, ২১ নভেম্বর ১৯৭৪ ।

৩৫. সাক্ষাৎকার : হামিদ উদ্দিন (৭২), প্রাক্তন ব্যাংকার (হাবিব ব্যাংক), সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ০৫-০৭-২০১১ ।

Dhaka University Institutional Repository
465967

৩৫ক. সাক্ষাৎকার : আবদুল হাই (৭০), সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ (ঢাকা) টেনার্স এসোসিয়েশন, হাজারিবাগ, ঢাকা, তারিখ ২০.০৯.১১

৩৬. *B Proceedings*, B # 07, File No. 21-5 of 1948, Subject: Industrial Policy, Branch: Industry, Department: Commerce, Government of East Bengal, Year: 1954, January, p. 10. *(NAB)*

৩৭. *Report on the Survey of Cottage Industries in Bengal*, Second Edition, Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1929, p. 72.

৩৮. ঐ, p. 72

৩৯. *B Proceedings* B # 07, File No. 21-5 of 48, Subject: Industrial Policy, Branch: Industry, Department : Commerce, Government of East Bengal, Year 1954, January, p.10. *(NAB)*

৪০. অজয় ভট্টাচার্য, নানকার বিদ্রোহ, ২য় খণ্ড।

৪১. *B Proceedings*, B # 07, File No. 21-5 of 1948, Branch: Industry, Department : Commerce, Government of East Bengal, p. 10. *(NAB)*

৪২. *The Leather Goods Manufacturing Industry in East Pakistan*, Bureau of Economic Research, University of Dhaka 1962, p. 52. *(BER)*

৪৩. *B Proceedings*, B # 07, File No. 21-5 of 1948, Subject: Industrial Policy, Branch : Industry, Department : Commerce, Labour & Industry, p. 11. *(NAB)*

৪৪. *B Proceedings*, B # 75, File No. 11-57, Sub: Application for Pak Leather Ltd., Branch: Commerce, Department : Commerce, year : 1949-50, pp. 1-31. *(NAB)*

৪৫. ঐ, pp. 1-13.

৪৬. ঐ, pp. 1-31.

৪৭. *B Proceedings*, B # 09 File No. 1C-8(iii) of 1952, Sub: Committee of Leather & Rubber goods Industry, Branch: Industry, Dept. Commerce, Labour & Industry, Government of East Bengal, Year : July 1954, pp. 1-2. *(NAB)*

৪৮. ঐ, pp. 1-2.

৪৯. ঐ, p. 4.

৫০. ঐ, p. 4.

৫১. S. N.H. Rizvi, *East Pakistan district Gazetteers*, *Dacca*, 1969, p. 206.

৫২. *B. Proceedings* B # 09, File No. 1C-8 (iii), Sub: Committee of Leather and Rubber goods Industry, Branch: Industry, Dept. Commerce, Government of East Bengal, year: January-July 1954, p. 3. (*NAB*)

৫৩. ঐ

৫৪. *The Leather Goods Manufacturing Industry in East Pakistan*, Bureau of Economic Research, University of Dacca, 1962, pp. 70-75, *(BER)*,

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

৫৫. ঐ. *p* 23

৫৬. ঐ *p* 23

৫৭. ঐ *p* 23

৫৮. সাক্ষাৎকার : হারুন-অর-রশিদ, MD. Lexco Tannery Limited 146, Hazaribagh, তারিখ ০৩-০৭-১১.

৫৯. *The Leather Goods Manufacturing Industry in East Pakistan,* Bureau of Economic Research, p. 29.

৬০. *Pakistan Trade*, Vol. XII, February 1961, No. 2, p. 68.

৬১. *The Leather Goods Manufacturing Industry in East Pakistan,* Bureau of Economic Research, p. 48.

৬২. ঐ, p. 33.

৬৩. ধাতব শিল্প, নকশাকেন্দ্র, বিসিক, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা, ঢাকা ১৯৮৪, পৃ. ভিতরের প্রচ্ছদ ।

৬৪. An Anthology of Crafts of Bangladesh: Bangladesh National Crafts Council H. 15 Rd. 15/A, Dhanmondi, Dhaka 1987, p. 69. উদ্ধৃত, তোফায়েল আহমেদ, *ঢাকার বাণিজ্যিক কারুকলা*, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৯১, পৃ. ৮ ।

৬৫. ধাতব শিল্প, পৃ. ভিতরের প্রচ্ছদ ।

৬৬. R. C. Majumder, *The History of Bengal,* Vol. 1, Dhaka University, Dhaka, 1943, pp. 65-69.

৬৭. Enamul Haque, *Islamic Art Heritage of Bangladesh* : Bangladesh National Museum, Dhaka 1983, p. 159. উদ্ধৃত, তোফায়েল আহমেদ, *ঢাকার বাণিজ্যিক কারুকলা*, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৯১, পৃ. ৮ ।

৬৮. তোফায়েল আহমেদ, *ঢাকার বাণিজ্যিক কারুকলা*, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৯১, পৃ. ৮ ।

৬৯. A. H. Dani, *Dacca, A Record of Its Changing Fortunes,* Dacca Museum 1962, p. 13.

৭০. জেমস টেলর, *কোম্পানি আমলে ঢাকা*, অনুবাদ : মোঃ আসাদুজ্জামান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭৮, পৃ. ১৩৪-১০৭ ।

৭১. জেমস ওয়াইজ, *পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও পেশার বিবরণ* (৩য় খণ্ড), অনুবাদ ফওজুল করিম, আইসিবিএস, ২০০২, পৃ. ১৩০ ।

৭২. ঐ

৭৩. B. C. Allen, *Eastern Bengal District Gazetteers, Dacca,* Allahabad, 1912, p. 115. (*NAB) (DUL)*

৭৪. তোফায়েল আহমেদ, *ঢাকার বাণিজ্যিক কারুকলা, পিতল : চামড়া : কাতান*, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৯১, পৃ. ৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

৭৫. *Report on the Survey of Cottage Industry in Bengal*, Second Edition, Calcutta 1929, p. 69. *(NAB) (DUL)*

৭৬. *B. procceedings*, B # 07, File NO. 21-5 of 1948, Sub: Industrial Policy, Branch : Industry, Dept. Commerce, Labour & Industry Government of Bengal 1948, p. 5. *(NAB)*

৭৭. W.W.Hunter, *A Statistical Account of Bengal*, Vol. V (London 1877), p. 36. *(DUL)*

৭৮. *Report on the Survey of Cottage Industry in Bengal* 1929, p. 69. *(NAB) (DUL)*

৭৯. জেমস ওয়াইজ, *পূর্ব বঙ্গের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও পেশার বিবরণ*, পৃ. ১৩।

৮০. Census of 1921, উদ্ধৃত, *Commercial History of Dhaka*, DCCI 2008, p. 379. *(DUL)*

৮১. *Report on the Survey of Cottage Industry in Bengal*, 1929, p. 69. *(NAB) (DUL)*

৮২. *ঐ*, p. 69

৮৩. *ঐ*, p. 69

৮৪. *ঐ*, p. 69

৮৫. *B proceeding*, B # 07, File No. 21-5 of 1948, Sub: Industrial Policy, p. 5. *(NAB)*

৮৬. *ঐ*, p. 5.

৮৭. *ঐ*, p. 5.

৮৮. জেমস ওয়াইজ, *পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও পেশার বিবরণ*, পৃ. ১৩০-৩১।

৮৯. *Report on the Survey of Cottage Industry in Bengal*, p. 69. *(NAB) (DUL)*

৯০. *B Proceedings* B # 07, File No. 2 I-5 of 1948, Sub: Industrial Policy, Government of Bengal, p. 6. *(NAB)*

৯১. *ঐ*, p. 6.

৯২. *ঐ*, p. 6.

৯৩. *ঐ*, p. 6.

৯৪. *B proceedings*, B # 04, Sub: Proceeding of the Second Meeting of Provincial Industrial Advisory Council held on the 15th and 16th September 1952, Branch : Industry, Department : Commerce, Labour & Industry, Government of Bengal 1953, p. 14. (*NAB*)

৯৫. তোফায়েল আহমেদ, *ঢাকার বাণিজ্যিক কারুকলা, পিতল : চামড়া: কাতান*, পৃ. ১০।

৯৬. *ঐ*, পৃ. ১১।

৯৬ক. *ঐ*, পৃ. ১৭।

৯৭. *Report on the Survey of Cottage Industry in Bengal* 1929, p. 64. *(NAB) (DUL)*

Dhaka University Institutional Repository

৯৮. জেমস ওয়াইজ, *পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও পেশার বিবরণ*, পৃ. ১৮২।

৯৯. *ঐ*, পৃ. ১৮২।

১০০. James Hornell, 'The Chank Bangle Industry' উদ্ধৃত, শিপ্রা সরকার, 'ঢাকার শঙ্খশিল্প : অতীত ও বর্তমান', *এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, পঞ্চদশ খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৭, পৃ. ৫৩।

১০১. দীনেশ চন্দ্র সেন, *বৃহৎ বঙ্গ*, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৩৫, দেজ পাবলিশিং কলকাতা ২০০৬ পুনর্মুদ্রণ, পৃ. ৯২৮।

১০২. *Report on the Survey of Cottage Industry in Bengal,* 1929, p. 64.

১০৩. *ঐ*, p. 64.

১০৪. Delwer Hassan (ed), *Commercial History of Dhaka,* DCCI, 2004, p. 343.

১০৫. *Report on the Survey of Cottage Industry in Bengal,* 1929, p. 64.

১০৬. George Walt : *The Commercial Products of India : Indian Art Exibition in Delhi*, 1903 (London-1903), p. 204. উদ্ধৃত, শিপ্রা সরকার, 'ঢাকার শঙ্খ শিল্প: অতীত ও বর্তমান', *এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা* পৃ. ৬১।

১০৭. শিপ্রা সরকার, 'ঢাকার শঙ্খ শিল্প : অতীত ও বর্তমান', *এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, ১৯৯৩, পৃ. ৭৬।

১০৮. *ঐ*, পৃ. ৭৬-৭৭।

১০৯. Delwar Hassan (ed), *Commercial History of Dhaka,* p. 347.

১১০. *Report on the Survey of Cottage Industry in Bengal,* 1929, p. 64.

১১১. জেমস ওয়াইজ, *পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও পেশার বিবরণ*, পৃ. ১৮৪।

১১২. শিপ্রা সরকার, 'ঢাকার শঙ্খ শিল্প : অতীত ও বর্তমান', *এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, পৃ. ৭৭।

১১৩. *Report on the Survey of Cottage Industry in Bengal.* 1929, p. 65. *(NAB) (DUL)*

১১৪. *ঐ*, p. 65.

১১৫. *ঐ*, p. 65.

১১৬. তোফায়েল আহমেদ, *আমাদের প্রাচীন শিল্প*, নওরোজ কিতাবিস্তান, বাংলা বাজার, ১৯৬৪ পৃ.১১৩।

১১৭. *B Proceedings.* B # 07, File No. 2I-5 of 1948, Sub: Industrial Policy, Branch: Industry, Department : C. L. & I, Government of Bengal, 1948, pp. 4-5. *(NAB)*

১১৮. *ঐ*

১১৯. মুনতাসীর মামুন, *ঢাকা স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫১।

১২০. *Report on the Survey of Cottage Industry in Bengal,* 1929, p. 65.

১২১. *ঐ*, p. 65.

১২২. Delwar Hassan (ed), *Commercial History of Dhaka*, p. 334

Dhaka University Institutional Repository

১২৩. *Report on the Administration of Bengal* 1924-25, Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta. 1926, p. 69. *(NAB)*

১২৪. *B Proceedings*. B # 07. File No. 21-5 of 1948. Branch: Industry. Department: C.L. & I. p. 4. *(NAB)*

১২৫. শিপ্রা সরকার, 'ঢাকার শঙ্খ শিল্প : অতীত ও বর্তমান', *এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, পৃ. ৭১।

১২৬. James Hornell : 'The Chank Bangle Industry': Its Antiquity and Present Condition', *Memories of Asiatic Society Journal*, (Vol. 3 Calcutta 1912) pp. 435-436. উদ্ধৃত, শিপ্রা সরকার, 'ঢাকার শঙ্খ শিল্প : অতীত ও বর্তমান', *এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, পৃ. ৭২।

১২৭. তোফায়েল আহমেদ, *আমাদের প্রাচীন শিল্প*, পৃ. ১১৩।

১২৮. শিপ্রা সরকার, 'ঢাকার শঙ্খ শিল্প : অতীত ও বর্তমান', *এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, পৃ. ৭৪।

১২৯. যতীন্দ্র মোহন রায়, *ঢাকার ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা ২০০৩, পৃ. ১৪৬।

১৩০. B. C. Allen, *Eastern Bengal District Gazetteers, Dacca*, Allahabad. 1912, p. 115. *(NAB)*

১৩১. শিপ্রা সরকার, 'ঢাকার শঙ্খ শিল্প : অতীত ও বর্তমান', *এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, পৃ. ৭৩।

১৩২. James Hornell, 'The Chank Bangle Industry' উদ্ধৃত, শিপ্রা সরকার, ঢাকার শঙ্খ শিল্প : অতীত ও বর্তমান, পৃ. ৭১।

১৩৩. শিপ্রা সরকার, 'ঢাকার শঙ্খ শিল্প: অতীত ও বর্তমান', *এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, পৃ. ৭৯।

১৩৪. দীনেশ চন্দ্র সেন, *বৃহৎ বঙ্গ* (২য় খণ্ড) (প্রঃ পঃ ১৯৩৫) পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৩ দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ৯২৯।

১৩৫. বুদ্ধদেব বসু, *গোলাপ কেন কালো*, (প্র.প্র. কলকাতা ১৯৬৮), দশটি উপন্যাস, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ৭০০৭৩, ২০০৪, পৃ. ৪৬২।

১৩৬. শিপ্রা সরকার, 'ঢাকার শঙ্খ শিল্প : অতীত ও বর্তমান', *এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, পৃ. ৬৭।

১৩৭. মুনতাসীর মামুন : *ঢাকা স্মৃতি-বিস্মৃতির নগরী* ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫১।

১৩৮. শিপ্রা সরকার, 'ঢাকার শঙ্খ শিল্প : অতীত ও বর্তমান', *এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, পৃ. ৬৯।

১৩৯. *Report on the Survey of Cottage Industry in Bengal*, 1929, p. 65. (*NAB*) *(DUL)*

১৪০. *ঐ*, p. 65.

১৪১. D. N. Ghose, *Report on the Button Industry in Bengal*, Bulletin No. 93, Department of Industries, Government of Bengal, 1941, p. 02. *(DUL)*

১৪২. *ঐ*, p. 2.

১৪৩. *Report on the Survey of Cottage & Industry in Bengal*, 1929, p. 65. *(NAB) (DUL)*

১৪৪. D. N. Ghose, *Report on the Button Industry in Bengal*, p. 02. *(DUL)*

১৪৫. *Report on the Survey of Cottage Industry in Bengal* 1929, p. 66. *(NAB) (DUL)*

১৪৬. *ঐ*, p. 66.

১৪৭. *ঐ*, p. 66.

১৪৮. D. N. Ghose, *Report on the Button Industry in Bengal*, p. 3.

Dhaka University Institutional Repository

১৪৯. ঐ, p. 4-5.

১৫০. *Report on the Survey of Cottage Industry in Bengal*, p. 66 *(NAB) (DUL)*

১৫১. D. N. Ghose, *Report on the Button Industry in Bengal*, p. 3.

১৫২. ঐ, p. 6.

১৫৩. *Report on the Survey of Cottage Industry in Bengal*, 1929, p. 67. *(NAB) (DUL)*

১৫৪. D. N. Gosh, *Report on the Button Industry in Bengal*, p. 10.

১৫৫. *Report on the Survey of Cottage Industry in Bengal*, 1929, p. 67.

১৫৬. ঐ, p. 67.

১৫৭. D.N. Ghose, *Report on the Button Industry in Bengal*, p. 9.

১৫৮. ঐ, p. 9.

১৫৯. *Report on the Survey of cottage Industry in Bengal*, 1929, p. 67. *(DUL) (NAB)*

১৬০. শিল্পপতি আনোয়ার হোসেন, *আমার সাত দশক*, একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবলিশার্স লাইব্রেরি, ঢাকা ২০০৮, পৃ. ৭২।

১৬১. D. N. Ghose, *Report on the Button Industry in Bengal*, p. 9.

১৬২. Delwar Hassan (ed), *Commercial History of Dhaka* 2004, p. 374.

১৬৩. D. N. Ghose, *Report on the Button Industry in Bengal*, p. 9.

১৬৪. ঐ, p. 9-10.

১৬৫. *B proceedings*, B # 07, File No. 21-5 of 1948, Sub: Industrial Policy, Branch : Industry, Department : Commerce, Government of Bengal, 1948, p. 2. *(NAB)*

১৬৬. ঐ, p. 1-2.

১৬৭. ঐ, p. 1-2.

১৬৮. আনোয়ার হোসেন, *আমার সাত দশক*, পৃ. ৭১-৭২।

১৬৯. ঐ, পৃ. ৭৩।

১৭০. ঐ, পৃ.৭৩।

১৭১. ঐ, পৃ. ৭৩।

১৭২. D.N. Ghose, *Report on the Button Industry in Bengal*, p. 10, *(DUL)*.

১৭৩. ইফতিখার উল-আউয়াল (সম্পাদিত), *ঐতিহাসিক ঢাকা মহানগরী : বিবর্তন ও সম্ভাবনা*, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ২০০৩, পৃ. ৩০২।

১৭৪. *B Proceedings*, B # 07, File No. 2 I-5 of 1948, Government of Bengal 1948, p. 1. *(NAB)*

১৭৫. ঐ, pp. 1-2.

১৭৬. ঐ, pp. 1-2.

১৭৭. ঐ, pp. 1-2

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

ঢাকার শিল্প-কলকারখানা

(১৯২১-৭১)

শিল্প বিপ্লবের আগে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে শিল্প ছিল কুটির ভিত্তিক এবং তার বাজার ছিল স্থানীয়। ঢাকার কুটির শিল্প ছিল এ সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। এখানকার শিল্পজাত দ্রব্য প্রাচীনকালে দূর-দূরান্তে রপ্তানি হতো। ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের ফলে ইংরেজ আমলে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে ঔপনিবেশিক নীতির স্বার্থে ঢাকার শিল্পোৎপাদন ধ্বংস করা হয়। কিন্তু ভারত সাম্রাজ্যে যেসব আধুনিক শিল্প গড়ে ওঠে তা ছিল ঢাকার বাইরে, ঢাকা তখন অন্যান্য অঞ্চলের কাঁচামালের সংগ্রহকারী এবং সামন্ত জমিদারদের জন্য বিদেশি ভোগ্যপণ্যের বাজারে পরিণত হয়। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে স্বদেশি আন্দোলনের অংশ হিসেবে ও পরে পাকিস্তান সৃষ্টি এবং ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ফলে এ ধারার পরিবর্তন শুরু হয়। ঢাকায় আবার আধুনিক প্রকৌশল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভারি, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প সংগঠিত হতে থাকে। দেশের বিশাল অভ্যন্তরীণ বাজার এ শিল্প সম্ভারের প্রধান বিক্রয়স্থল হয়ে পড়ে।

এই অধ্যায়ে ১৯২১-১৯৭১ সময়কার ঢাকার শিল্পকারখানার অবস্থা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। আলোচ্য সময়ের শুরুতে ঢাকায় তেমন কোনো বড় ধরনের শিল্পকারখানা ছিল না। যতটুকু ছিল তাও আবার কুটির শিল্প পর্যায়ে। তবে আলোচ্য সময়ের শুরু থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত বেশিরভাগ শিল্প-কলকারখানা কলকাতা ও তার আশেপাশে গড়ে ওঠে। যদিও এ প্রক্রিয়া বিশ শতকের আগে থেকেই ছিল। কারণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে যে জমিদার শ্রেণির সৃষ্টি হয়, তাদের এদেশে (পূর্ববাংলা) জমিদারি থাকলেও তারা কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করত । তারা এদেশের অর্থ সম্পদ কলকাতার বিভিন্ন সামাজিক, ধর্মীয় ও ভোগ বিলাসে ব্যয় করত। তারা জমির উন্নতি বিধানে কোনো পুঁজি বিনিয়োগ করত না। বরং মধ্যস্বত্বভোগীর কাছে জমি ইজারা দিয়ে তাদের দায়িত্ব শেষ করত। তারা তাদের পুঁজি শিল্পে বিনিয়োগ করার চেয়ে জমি ক্রয়ে বেশি আগ্রহী ছিল। কারণ এক্ষেত্রে ঝুঁকি ছিল কম এবং মুনাফা ছিল বেশি।

আলোচ্য সময়ের ঢাকার শিল্পকারখানার অবস্থা নিয়ে আলোচনা করার আগে অবিভক্ত বাংলার শিল্পখাত ও শিল্পোদ্যোক্তা শ্রেণি সম্পর্কে আলোচনা করা দরকার। তাহলে ঢাকার শিল্পকারখানার সামগ্রিক অবস্থা বোঝা যাবে।

বাঙালিদের শিল্পখাতে আগ্রহের অভাব সম্পর্কে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মন্তব্য পাওয়া যায়। উনিশ শতকের সত্তরের দশকে ভোলানাথ চন্দ্র 'A Voice for the Commerce and Manufacturers of India' প্রবন্ধে বাংলার সব অর্থনৈতিক উপসর্গের মূল খুঁজে পেয়েছিলেন শিল্পায়নে ভদ্র সম্প্রদায়ের আগ্রহহীনতার মধ্যে। ভদ্র সম্প্রদায়ের নিকট তার আবেদন ছিল তারা যেন শিল্পায়নকে তাদের উন্নয়নের চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে স্থান দেন।[১] শিল্পায়নের এই তাগিদ সমভাবেই অনুভব করেছিলেন যেমন একদিকে রমেশ চন্দ্র দত্তের

Dhaka University Institutional Repository

মতো উদারনৈতিক অর্থনীতিবিদরা, তেমনি অন্যদিকে বিপিন চন্দ্রপাল ও চিত্তরঞ্জন দাসের মত চরমপন্থি রাজনীতিবিদরা।

বাঙালি সম্পদশালী ও শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে শিল্পোদ্যোক্তাসুলভ আগ্রহের অভাব স্বদেশিযুগের বিভিন্ন লেখার প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৮৯০ সালে প্রকাশিত ই. ডব্লিউ কলিন-এর *Report on the Existing Arts and Industries in Bengal* শীর্ষক প্রতিবেদনে বাঙালি ধনাঢ্য শ্রেণির উদ্যমহীনতা এবং নতুন কলকারখানা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ব্যর্থতার অভিযোগ আনা হয়।[২]

বাঙালি শিল্পোদ্যোক্তাদের এই হতদ্দশা নিয়ে বাঙালি হিন্দু ও মুসলিম উভয়ের মধ্যে একই মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। চট্টগ্রামের বাঙালি শিল্পোদ্যোক্তা সম্পর্কে লিখতে গিয়ে হাবিবুর রহমান মন্তব্য করেন যে, 'চট্টগ্রামের ব্যবসায়ীদের একান্ত ব্যবসায়ী মনসতত্ত্ব নিহিত ঝুঁকি না নেয়া এবং দ্রুত ধনিক হওয়ার মানসিকতার মধ্যে। এরা সাধারণত শিল্পখাতে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগে নিরুৎসাহী; তার চেয়ে বরং এরা মনোহরী দোকান অথবা রেস্টুরেন্ট খুলতেই আগ্রহী, যেখানে দ্রুত কেনাবেচা চালানো যায়'।[৩]

এই ধরনের মন্তব্য ছাড়াও প্রশ্ন ওঠে কেন বাঙালি সম্পদশালী শ্রেণি সময়ের বিবর্তনে বৃহদায়তন খাতমুখী স্থায়িত্বশীল এক শিল্পোদ্যোক্তা শ্রেণিতে রূপান্তরিত হতে পারে নি। এখানে উল্লেখ্য যে, বাঙালি শিল্পোদ্যোক্তা শ্রেণি নিয়ে আলোচনা মূলত ঢাকার শিল্পোদ্যোক্তা শিল্পপতিদের নিয়ে। আলোচ্য সময় যেহেতু ব্রিটিশ যুগ অর্থাৎ ১৯২১ থেকে তাই অবিভক্ত বাঙালি শিল্পোদ্যোক্তা শ্রেণি নিয়ে আলোচনা করা একান্ত দরকার। কারণ এই আলোচনা থেকে ঢাকার শিল্পোদ্যোক্তা শ্রেণি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যাবে।

বৃহদায়তন খাতমুখী স্থায়িত্বশীল শিল্পোদ্যোক্তা শ্রেণিতে রূপান্তরিত না হওয়ার জন্য বিনায়েক সেন উল্লেখ করেন যে, এ বিষয়ে মোটা দাগে দুই ধরনের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

১. ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী ও বৈষম্যমূলক নীতি এবং
২. সামগ্রিকভাবে সহায়ক অর্থনৈতিক পরিবেশের অনুপস্থিত। অর্থাৎ আধুনিক শিল্পখাতে প্রবেশ বৈদেশিক বাণিজ্যে পাইকারি ব্যবসা এবং অর্থায়ন খাতের উপর ইউরোপীয় নিয়ন্ত্রণের কারণে বাধাপ্রাপ্ত হয়।[৪]

ক্লিং বলেন যে, 'অর্থনীতির আধুনিক খাতে বাঙালি ব্যবসায়ীদের অবস্থানের অবনতির পেছনে কাজ করেছে 'বাঙালিদের বিরুদ্ধে বেসরকারি ও সরকারি ব্রিটিশদের ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব এবং সামাজিক বঞ্চনা'।[৫]

এক্ষেত্রে Gunnar Myrdal ঔপনিবেশিক অর্থনীতির ৩টি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেন। যা ছিল এ দেশের (পরাধীন) প্রতি বৈষম্যমূলক নীতি। এগুলো হলো[৬]—

১. উপনিবেশকে নিজেদের দেশের শিল্পজাত দ্রব্যের একচেটিয়া বাজারে পরিণত করা (Using the dependent country as a market for the products of its own manufacturing industry).
২. প্রাথমিক দ্রব্য বা কাঁচামালের প্রধান উৎপাদন কেন্দ্রে পরিণত করা (Procuring primary goods from its dependent territory and even in investing so as to produce them in plenty and at low cost).

Dhaka University Institutional Repository

৩. রপ্তানি ও আমদানি দুই ধরনের বাজার গড়ে তোলা (Monopolising the dependent country as far as possible for its own business interests both as an export and import market).

ভারতবর্ষকেও এইভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা তাদের শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানি-রপ্তানির বাজার এবং কাঁচামালের উৎপাদনকেন্দ্রে পরিণত করেন। স্বভাবতই তারা নিজেদের দেশের শিল্পোন্নতির স্বার্থে পরাধীন ভারতের শিল্পোন্নতি কাম্য বলে মনে করেন নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও নতুন যুগের শিল্পবাণিজ্যের স্বাধীন পরিবেশে (এই স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ হলেও) ব্যবসা-বাণিজ্যের ও শিল্পোদ্যোগের যেটুকু সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল, মূলধন থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য প্রদেশের ব্যবসায়ীদের মত ধনী ও মধ্যবিত্ত বাঙালিরা তার সামান্য সদ্ব্যবহার করতে পারে নি। এই অক্ষমতার অর্থনৈতিক কারণ থাকলেও সামাজিক কারণও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

বিনয় ঘোষ বলেন, "ব্রিটিশ বাঙালি সমাজে যে ধনিক শ্রেণি ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ হয় তাঁদের চরিত্র কতকগুলি বিশেষ উপাদানে গঠিত। ইংরেজ শাসক ও বণিকদের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ তারা নানাদিক থেকে পেয়েছিল। এই সান্নিধ্য বিচিত্র কর্মক্ষেত্রে (কলকাতার হাট-বাজারের ইজারাদারি, লবণ ও অন্যান্য বাণিজ্যপণ্যের দালাল, বেনিয়ান ও মুচ্ছদ্দিরূপে ইংরেজপোষণ, দেওয়ান, সরকার, গোমস্তা, মুনসি প্রভৃতি) নানা উপায়ে তাঁদের অর্থোপার্জনের পথ খুলে দিয়েছিল, অধিকাংশ পথই 'enterprise'-এর পথ নয়, অনুগ্রহজীবীর মসৃণ পথ।... এ পথ সৎসাহস, উদ্যম ও স্বাধীনতার বিপদসংকুল অথচ প্রশস্ত পথ নয়"।

তিনি (বিনয় ঘোষ) আরো বলেন, "শিল্পোদ্যম হলো উচ্চ স্তরের সাহস ও উৎসাহযুক্ত কোনো কর্ম : যা কোনো অভিপ্রেত ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী উদ্দেশ্যের সাফল্যের দূরদৃষ্টিতে সমুজ্জ্বল ও অনুপ্রাণিত। তাহলে ধারণা করা হয় যে, অর্থনৈতিকক্ষেত্রে ধনিক ও মধ্যবিত্ত বাঙালিদের কোনো ambitious objective-এর Vision of achievement ছিল না এবং তার দ্বারা অনুপ্রাণিত এমন কোনো কর্মে তারা প্রবৃত্ত হয় নি যাতে high order of vigor প্রয়োজন হয়। পশ্চিম বাংলার দ্বারকানাথ ঠাকুর ও রামদুলালদের মত দু'একজন যাঁরা স্বাধীন শিল্পবাণিজ্যকর্মে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তাদের action ও vision দুই-ই অনেকটা ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের প্রতিবন্ধকতায় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। দ্বারকানাথের মত কেউ কেউ অমিতব্যয় ও অতিবিশ্বাসে অনেক মূলধন ক্ষয় করেছিলেন, জমিদারির নিশ্চিন্ত আয়ের প্রতি প্রলুব্ধ হয়েছিলেন, আবার কেউ কেউ রামদুলালের মত যথেষ্ট বণিক-বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও সামাজিক রীতিনীতি ও প্রথার পাদমূলে অনেক মূলধন উৎসর্গ করেছিলেন।"[৬৩]

সোমপ্রকাশ হিন্দুদের সামাজিক রীতিনীতি সম্পর্কে উল্লেখ করে যে, "হিন্দু সমাজের পুরাতন রীতিনীতি ও প্রথা প্রচলিত থাকাতে যে যৎকিঞ্চিৎ অর্থাগম হইতেছে তাহাতে বিশেষ সাহায্য বোধ হইতেছে না।"[৭] সাধারণত একান্নবর্তিতা, বাল্যবিবাহ, পিতামাতার শ্রাদ্ধ, পুত্রকন্যার বিবাহ, চিরবৈধব্য, জাতিভেদ, জাত্যাভিমান, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ও ঘরমুখোমন বিবাহপ্রিয়তা ও বিবাহবাধ্যতা, কৌলিন্য প্রথা, বংশগত মর্যাদা ও শাস্ত্রোক্ত নিষেধ ইত্যাদি সামাজিক রীতিনীতির কারণে বাঙালির শিল্পোদ্যম বাধাপ্রাপ্ত হয়। যা আধুনিক শিল্পকারখানা গড়ে তোলার প্রতিকূলে কাজ করে। উপরন্তু আধুনিক শিল্পকারখানা গড়ে তুলতে হলে যে

Dhaka University Institutional Repository

ধরনের শিক্ষার প্রয়োজন ছিল তা এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ছিল না বললেই চলে। কেননা এই সম্বন্ধে সোমপ্রকাশে উল্লেখ করা হয়—

> "যে ভাবের শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতে কেবল শূন্যে কেল্লা নির্মাণের বুদ্ধি হয়, বচনে খৈ ফুটাইবার ক্ষমতা হয়, শিমুল ফুলের মত অল্প বাতাসে ফাটিয়া চাটিয়া দেশময় হওয়ার সুবিধা হয়, এরূপ নিষ্ফল শিক্ষায় দারিদ্র্য ও দুঃখের স্রোত প্রবলবেগে বহিবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।"[৭(ক)]

তাছাড়া বিদেশি শাসকরা এদেশের শিল্পোন্নতি ও আর্থিক উন্নতির ব্যাপারে উদাসীন ছিল। তারা এদেশকে কেবল কাঁচামালের উৎস ও তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের বাজারে পরিণত করতে চেয়েছিল। তবে বাংলার শিল্পোন্নতির অন্তরায় হিসেবে সামাজিক কারণের পাশাপাশি অর্থনৈতিক কারণও বিদ্যমান ছিল।

কেননা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যদি ধনতান্ত্রিক কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং রাষ্ট্র ছাড়া যদি ব্যক্তির উপর শিল্পবাণিজ্যের জন্য নির্ভর করতে হয়, তাহলে যেকোনো দেশের শিল্পোন্নতির মুখে যে শিল্পোদ্যোগী পুরুষের দূরদর্শী অভিযানের প্রয়োজন আছে একথাও অস্বীকার করা যায় না। তাইতো অর্থনীতিবিদরা অনেকে ব্যক্তিগত শিল্পোদ্যমের গুরুত্বের কথা স্বীকার করেছেন এবং শুম্পিটার (Schumpeter)-এর মত কয়েকজন শিল্পোন্নতির মূলে ব্যক্তিগত শিল্পোদ্যমের উপর অত্যধিক গুরুত্বারোপ করেছেন।[৮] তিনি (Schumpeter) বলেছেন যে, কোনো দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ প্রাকৃতিক নিয়মে স্বচ্ছন্দে বা অবলীলাক্রমে হয় না। হঠাৎ এক-একটা ঝাঁকুনি ও উল্লম্ফের ভিতর দিয়ে হয়। এই ঝাঁকুনি ও উল্লম্ফের শক্তি যোগান দেন প্রত্যেক দেশের শিল্পোদ্যোগী পুরুষরা, যাঁরা কল্পনা ও একাগ্রতা নিয়ে স্বাধীন শিল্পক্ষেত্রে অগ্রগতির নতুন নতুন পথের সন্ধানে যাত্রা করেন। ইংল্যান্ড, আমেরিকা, এমনকি জাপানের মত শিল্পোন্নত দেশের ইতিহাস আলোচনা করলেও দেখা যায় যে, শিল্পোন্নতির মূলে ব্যক্তিগত শিল্পোদ্যমের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

তাই দেখা যায় যে, উনিশ শতক থেকে বিশ শতক পর্যন্ত অনেক ব্যবসায়ী ছিলেন যারা স্বাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠার উপযোগী পর্যাপ্ত মূলধন সঞ্চয় করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এরা বাণিজ্যমুখী হলেও শিল্পমুখী হন নি। কারণ বেচাকেনার বাণিজ্যে মুনাফার যে নিশ্চয়তা আছে তা শিল্পে নেই।

আবার উনিশ শতকে প্রতিষ্ঠিত বাঙালিদের পারিবারিক ইতিহাস অনুশীলন করলে আরও একটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। ব্রাহ্মণ-কায়স্থ- বৈদ্য প্রভৃতি উচ্চবর্ণের বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে আঠার ও উনিশ শতকে যাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্য করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন, তাদের বংশধররা পরবর্তীকালে পূর্বপুরুষের বাণিজ্যবৃত্তির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে ক্রমে চাকরি ও শিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেছেন।

বিনয় ঘোষ বাঙালির শিল্পোদ্যমে অনগ্রসরতার সমাজতাত্ত্বিক কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখেন যে, সেই সমস্ত সমাজের দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশ হয়েছে, যেখানে সামাজিক শক্তির মূল নৈর্ব্যক্তিক ইনস্টিটিউশন-গত প্রথা-ঐতিহ্য থেকে আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্কের ভিত্তিতে স্থানান্তরিত হয়েছে। অর্থাৎ যে সমাজ যত বেশি ব্যক্তিমুখী এবং ব্যক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বীমুখী, পুরাতন সামাজিক প্রথা-ঐতিহ্যমুখী নয়, সেই সমাজে স্বভাবতই আন্তর্ব্যক্তিক

Dhaka University Institutional Repository

কর্মপ্রতিযোগিতার ভেতর দিয়ে তত বেশি মানুষের কৃতিত্ব প্রবণতা জাগিয়ে তোলে। ঐতিহ্যমুখী সমাজকে অন্তর্মুখী এবং ব্যক্তিমুখী সমাজকে বহির্মুখী বলা যায়।[৯]

জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার (Max Weber) ধর্মগত মনোভাবের সঙ্গে অর্থনৈতিক মনোভাবের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন যে, খ্রিস্টধর্মের মধ্যে প্রটেস্টান্টিজম ও তার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা "helped to deliver the 'spirit' of modern capitalism, its spicific ethos : the ethos of the modern bourgeois middle classes."[১০]

ম্যাক্স ওয়েবার বলেন, আমদানিকৃত পুঁজিবাদ যতবারই সনাতনী ধারাকে ভাঙতে চেয়েছে, ততবারই বর্ণপ্রথা এসে এ ধারাকে টিকিয়ে রেখেছে। ফলে দেখা যায় যে, আধুনিকিকরণের প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার পরও স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সনাতনী মনোবৃত্তি যায় নি। আধুনিক খাতের শিল্পোদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীরা প্রায়শই ফটকাবাজি মনোবৃত্তির পরিচয় দেয়, যা শিল্পপুঁজির বিকাশকে শ্লথতর করে তোলে। একারণে ওয়েবার মনে করেন স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কালক্রমে শিল্পপতি হওয়ার প্রক্রিয়াটি কখনও সম্পন্ন হয় নি।

কেননা যেদেশের প্রধান ধর্ম মানুষের মনকে পার্থিব সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও বৈষয়িক ভোগ লালসার প্রতি বিমুখ করে তোলে, সে দেশে অর্থনৈতিকক্ষেত্রে ব্যক্তিগত কৃতিত্বকামী উদযোগী পুরুষের সংখ্যা কম হওয়াই স্বাভাবিক। ভারতবর্ষে প্রধানত ব্রাহ্মণ্যধর্ম বিরোধী বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে যেমন— জৈন, বৈষ্ণব, পার্সি প্রভৃতি শিল্পোদ্যোগী ব্যবসায়ীর সংখ্যা বেশি দেখা যায়। কারণ এইসব ধর্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে পাশ্চাত্যের ছোট ছোট প্রটেস্টান্ট ধর্মগোষ্ঠীর মনোভাবের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে।

আবার বাংলায় প্রচলিত আচার প্রথাসর্বস্ব হিন্দুধর্মের প্রতিবাদে যে ব্রাহ্মধর্মের বিকাশ হয়েছিল, পাশ্চাত্যে প্রটেস্টান্ট ধর্ম আন্দোলনের সঙ্গে অনেক দিক থেকে তার একটা সাদৃশ্য আছে। প্রটেস্টান্ট ধর্মের মত ব্রাহ্মধর্মেরও লক্ষ্য ছিল লোকচিত্তকে ধর্মের ক্ষেত্রে বহির্মুখী না করে অন্তর্মুখী করা। ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে ধর্মের সঙ্গে বৈষয়িক জীবনের কোনো মিল বিরোধ ছিল না, উভয়ের মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সেতুবন্ধন বেশ দৃঢ় ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্রাহ্মধর্মের উৎপত্তিকেন্দ্র বাংলায় অন্তত ব্রাহ্মধর্মপন্থীদের মধ্যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কিছু achievement oriented শিল্পোদ্যোগী ব্যক্তির বিকাশ হওয়ার কথা, কিন্তু তা হয় নি। এর জন্য বিনয় ঘোষ একাধিক কারণ আছে বলে মনে করেন–

১. হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মধর্মের অনুভূমিক বিস্তার ব্যাপক নয়, খুবই সীমাবদ্ধ। ব্রাহ্মধর্মের মূলতত্ত্ব হিন্দুধর্মের মূলতত্ত্বের স্থলাভিষিক্ত হওয়াতো দূরের কথা, তার গায়ে সামান্য আঁচড়ও কাটতে পারে নি। কাজেই বাংলার হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মধর্মের আত্মিক প্রভাব সমাজের গভীরে প্রবেশ করতে পারে নি। রামমোহন রায় অথবা তাঁর অনুগামীরা লুথার (Luther) ও ক্যালভিন (Calvin) -এর মত ব্যাপক ধর্ম আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে নি।

Dhaka University Institutional Repository

২. হিন্দুসমাজে নতুন প্রেরণা সঞ্চার করতে ব্যর্থ হয়ে ব্রাহ্মধর্মীরা ক্রমেই ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে একটা Sectarian মনোভাবের পরিচয় দেয়।

৩. রামমোহন দ্বারকানাথের যুগে ব্রাহ্মধর্মের অনুসারী যারা হয়েছিলেন তারা অধিকাংশই ছিলেন জমিদারশ্রেণিভুক্ত। প্রাচীন হিন্দুধর্মের ঐতিহ্যের প্রতি আসক্তি তাঁদের এত প্রবল ছিল যে, রামমোহনের সান্নিধ্য অথবা ব্রাহ্মউপাসনার ফলে তার মূল বিশেষ শিথিল হয় নি। হিন্দু সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ভয়ে তাঁরা ব্যক্তিগত ও সামাজিক আচরণে পুরো হিন্দুত্ব বজায় রেখে চলতেন। রামমোহনের অন্তর্বিরোধের ফলে ব্রাহ্মধর্মান্দোলন ক্রমে আরও বেশি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং উনিশ শতকের শেষপর্বে হিন্দু পুনরভ্যুত্থানের ফলে সেই দৌর্বল্য কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয় নি। এই কারণে ব্রাহ্মধর্মের "Individualistic relationship to God" হিন্দু সমাজের individualistic character of man's secular activities-এর জন্য উপযুক্ত মানসিকক্ষেত্র প্রস্তুত করতে পারে নি। তাই ব্রাহ্মদের মধ্যে একমাত্র দ্বারকানাথ ঠাকুর ছাড়া উনিশ শতকে আর কারো কর্মজীবনে শিল্পোদ্যমের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না।[১০(ক)]

এভাবে দেখা যায় যে, বাঙালি বণিকাংশের মধ্যে পুরুষানুক্রমিক রক্ষণশীল, অতি সাবধানী, অনুদার ঐতিহ্যাবদ্ধ মনোভাব বিদ্যমান যা আধুনিক শিল্পযুগের উপযোগী নয়, আর এই কারণে বাংলায় প্রকৃত ধনতান্ত্রিক শিল্পোদ্যোগী বিচিত্র কীর্তি পুরুষের আবির্ভাব হয় নি।

শিল্পোদ্যোক্তা হিসেবে বাঙালি হিন্দুদের নিয়ে আলোচনা করা হলেও বাঙালি মুসলমানদের নিয়ে কোনো আলোচনা করা হয় নি। তার কারণ বাঙালি মুসলমান আধুনিক শিক্ষা ও শিল্প-বাণিজ্য ব্যাপারে ব্রিটিশ আমলে হিন্দুদের অনেক পরে উৎসাহী হয়। সম্পূর্ণ আঠার ও উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত শিক্ষা দীক্ষা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাঙালি হিন্দুরাই ছিলেন প্রধান ও অগ্রগণ্য। তাই উনিশ শতকে অন্তত বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে ব্যক্তিগত শিল্পদ্যোমের প্রকাশ যেভাবে হওয়া উচিত ছিল, তা হয় নি এবং তা না হওয়ার জন্য ব্রিটিশনীতির যত গুরুত্বই থাক বাঙালি হিন্দুদের নিজস্ব সমাজনীতির গুরুত্ব কম ছিল না। এটাই আমাদের প্রতিপাদ্য।

অপরদিকে পূর্ববাংলার ঢাকার দিকে তাকালে দেখতে পাওয়া যায় যে, উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে ঢাকার নবাবরা আব্দুল গণি (১৮৩০-১৯৯৬), আহসান উল্লাহ (১৮৪৬-১৯০৯) বিপুল ধনসম্পত্তির মালিক হওয়া সত্ত্বেও তারা শিল্পে মূলধন বিনিয়োগ করেন নি। বরং তারা বিভিন্ন দান, বিলাস ব্যসন ও জমিদারি কেনায় অর্থ বিনিয়োগ করেন। যেমন — খাজা আলীমুল্লাহকে তার ব্যবসায়ী চাচা হাফিযুল্লাহ মৃত্যুকালে দুটি পরামর্শ দিয়ে যান। একটি হলো ব্যবসা থেকে সব পুঁজি প্রত্যাহার করে জমিদারিতে বিনিয়োগ এবং এক্ষেত্রে জমি যেন চরাঞ্চল হয়। দুই, কৃষক মুসলমান হলে নায়েব যেন হিন্দু হয়, এই উপদেশ মেনে নিয়ে ঢাকা, বাকেরগঞ্জ, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জমিদারি কিনেন। যার বার্ষিক আয় ছিল ৮ লক্ষ টাকা।[১১]

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য তারা কেউই অনুপস্থিত জমিদার ছিলেন না। ঢাকায় অবস্থান করতেন। ঐতিহাসিকদের অনেকেই এই দানধ্যানের প্রশংসা করেন। অধ্যাপক মুসতাসীর মামুন উল্লেখ করেন যে, নবাব আব্দুল গণির দানের তালিকা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, দেশের জন্য যা ব্যয় করেছেন তার থেকে বেশি না হলেও বিদেশি স্বার্থে কম ব্যয় করেন নি। আর স্থানীয়ভাবে যা ব্যয় করেছেন তা নিজের প্রজার বা শহরবাসীর কথা ভেবে নয়, ব্রিটিশ কোনো প্রতিনিধির সে অঞ্চলের পদার্পণকে স্মরণ রাখার জন্য বা ঔপনিবেশিক সরকারের অনুরোধে।[১২]

অথচ পূর্ববাংলা তথা ঢাকা তার সুতিবস্ত্রের জন্য প্রাচীন কাল থেকেই বিখ্যাত ছিল। সমগ্র মুঘল আমলে বাংলার সাথে বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ঢাকার সুতিবস্ত্রের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল এবং বাংলা থেকে ইউরোপীয় কোম্পানিসমূহের রপ্তানিপণ্যের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ঢাকার সামগ্রী। খ্রিষ্টীয় প্রথম দিকের শতাব্দীগুলোতে ঢাকায় তাঁতশিল্প গড়ে ওঠে। কিন্তু মুঘলযুগে ইউরোপীয় কোম্পানিসমূহের রপ্তানিবৃদ্ধির কারণে ঢাকায় এ শিল্প দ্রুত প্রসার লাভ করে। কিন্তু কোনো কোনো এলাকার তাঁতিগণ অত্যন্ত বেশি পারদর্শিতা অর্জন করে এবং সেসব এলাকা মূলত সূক্ষ্ম মসলিনের উৎপাদন কেন্দ্রে পরিণত হয়। এই সূক্ষ্ম মসলিনের জন্য ঢাকা বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করে। অথচ শিল্প বিপ্লবের ফলে এদেশে বস্ত্রশিল্প ধ্বংস হয়। অর্থাৎ বিলেতি কলকারখানার সস্তা সুতি কাপড়ের সাথে প্রতিযোগিতা করে ঢাকাই মসলিন টিকে থাকতে পারে নি। ১৮৪৪ সালে ঢাকার অস্থায়ী কমিশনার মি. ডানবার ঢাকার মসলিন শিল্পের অবনতির কারণ সম্পর্কে বলেন, "বিলেতি বাষ্পীয় শক্তির আবিষ্কার ও বস্ত্রশিল্পে কলকজার ব্যবহার ঢাকার বস্ত্র শিল্পের ধ্বংসের প্রধান কারন।"[১৩]

তাহলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, ঢাকায় যেসব প্রতাপশালী জমিদার ছিলেন তারা এ ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ নেন নি। বরং বিলেতের সস্তা কাপড়ে ঢাকার বাজার ছেয়ে যায়। উপরন্তু বস্ত্র শিল্পের জন্য উন্নত কোনো কলকারখানাও প্রতিষ্ঠা করেন নি।

সুতরাং হিন্দু জমিদারদের মত ঢাকার জমিদাররাও শিল্পে মূলধন বিনিয়োগে কোনো আগ্রহ দেখান নি। যা বুদ্ধদেব বসুর *গোলাপ কেন কালো* (১৯৬৮) গ্রন্থ থেকে দেশভাগের আগের ঢাকার শিল্প প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে জানা যায়— "ঢাকার লোকেরা ইন্ডাস্ট্রি মাইন্ডেড নয়, ঝাড়কে– ঝাড় চাকুরে, সেই মামুলি 'গাভমেন্ট পেপার' ছাড়া কিছু বোঝে না, জমিদার শ্রেণি বংশানুক্রমে তুলোর বাক্সে জীবন কাটাবার ফলে পাই–পয়সা রিস্ক নিতে নারাজ, আর সাহা-বসাকদের মধ্যে যারা লাখ টাকার কারবারি তারা এখনো ঘরে ঘরে সিঁদুর লেপা গণেশ বসানো সিন্দুকে পাঁজা–পাঁজা নোট রেখে দেয়, আর ব্যবসা বলতেও তাদের মৌরসিপাট্টা শাঁখা, শাড়ি মনোহরি দোকানই বোঝে শুধু। কি হবে এই দেশের—যেখানে মেডিয়াভল অন্ধকার বিরাজমান, যেখানে এখনো কারো কারো ধারণা যে ইলেক্ট্রিক আলোয় চোখ খারাপ হয়, যেখানে বিপুল পরিমাণ টাকা গণেশের ভুঁড়ির মধ্যে পৌঁছে যায়, আর মেয়েদের গায়ের কিংবা হাতবাক্সের সোনা হয়ে আটকে থাকে? ভারত-ললনাদের স্বর্ণালংকার কেড়ে নিয়ে ইন্ডাস্ট্রিতে খাটানো উচিত, তাহলে দেশে আর অভাব থাকবে না।"[১৩(ক)]

Dhaka University Institutional Repository

আবার এটাও দেখা যায় যে, বিশ শতকের প্রথম দশকে স্বদেশি আন্দোলন চলাকালে আধুনিক ধারায় শিল্প স্থাপনের বাঙালি শিল্পোদ্যোগের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বিনায়েক সেন উল্লেখ করেন যে, "স্বদেশি চেতনার শেকড় ১৮৭০-এর দশকে খুঁজে পাওয়া গেলেও অর্থনৈতিক স্বদেশি ভাবনা সর্বপ্রথম অভিব্যক্তি লাভ করে বিশ শতকের প্রথম দশকে। ... স্বদেশি ভাবনার গোড়ার দিকে ক্ষয়িষ্ণু ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্পের ব্যাপারে গভীর উৎকণ্ঠা থাকলেও ১৯০৫-০৭ সালের স্বদেশি চেতনায়-এর আপেক্ষিক গুরুত্ব হ্রাস পেতে থাকে। এর পাশাপাশি আধুনিক ধারায় শিল্প স্থাপনের প্রচেষ্টা প্রবল হয়ে ওঠে। ... এ সময় কুটির শিল্প থেকে শহুরে আধুনিক শিল্পকেই বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়।"[১৪]

তবে স্বদেশি যুগে যেসব শিল্প-কলকারখানা গড়ে ওঠে তার বেশিরভাগ কলকাতা ও তার আশেপাশে গড়ে ওঠে। এসব শিল্প বেশিদিন টিকে থাকে নি। এর একাধিক কারণ ছিল —

১. শিল্প প্রতিষ্ঠান চালানোর চেয়ে জমিক্রয়ের প্রতি বেশি আগ্রহী হয়ে ওঠে। যেমন— এ.সি. লায়েক এবং যাদব ব্যানার্জী। তারা ঝারিয়ার কয়লা খনি কিনেন। ১৯১১ সালে এদের প্রতিষ্ঠানকে অসচ্ছল ঘোষণা করা হয়। তার কারণ তাদের ছেলে ও নাতিরা কয়লা খনি চালানোর চেয়ে জমিক্রয়ে বেশি আগ্রহী ছিল।

২. বাঙালি বিত্তশালী শ্রেণির দ্রুত বড়লোক হওয়ার মানসিকতা।

৩. প্রযুক্তি, বাজার ও শিল্পোদ্যোগের প্রচেষ্টা ইত্যাদি সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান ছিল না।

৪. বাঙালি ব্যবসায়ীদের শিল্পে দীর্ঘ মেয়াদী বিনিয়োগের কোনো মানসিকতা ছিল না। হিন্দু ও মুসলিম বিনিয়োগকারীদের জন্য ব্যাপারটা সমভাবে প্রযোজ্য।

৫. বাঙালিরা বিনিয়োগে কিছুটা আগ্রহী হলেও সেসবক্ষেত্রে অবাঙালি বিশেষত মাড়োয়ারি পুঁজি মুখ্য প্রতিযোগিতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এর প্রধান কারণ বাঙালি ব্যবসায়ীদের পুঁজি অল্প আর মাড়োয়ারিদের পুঁজি বেশি ছিল। প্রভাবশালী মাড়োয়ারি পাট ব্যবসায় শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। পুঁজি বেশি থাকায় সে একই সঙ্গে মহাজন ও আড়তদারের কাজ করত। কলকাতাভিত্তিক পাটকলগুলোতে একজন সরবরাহকারী হিসেবে ভূমিকা পালন করত। এমনকি ডান্ডিভিত্তিক পাট প্রস্তুতকারকদের কাছে সে কাঁচাপাট রপ্তানি করত। আর. এস. রুংটা উল্লেখ করেন যে (১৯৭০) "মাড়োয়ারিদের কান মাটিতে ছিল বিধায় তারা শেয়ারবাজারে প্রভাব সৃষ্টিকারী খবর সবার আগে পেত এবং গুঞ্জন ছড়িয়ে বাজারে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার কাজে তাদের সাথে কেউ পেরে উঠত না"।[১৫] সুতিবস্ত্রকলের তুলনায় পাটকলের শেয়ারের ব্যাপারে অধিকতর আগ্রহ ছিল একারণে যে, সে সময় কলকাতার শেয়ার বাজারে পাটকলের শেয়ার নিয়ে বেশ জোরালো লেনদেন হতো।

আবার মাড়োয়ারিদের পুঁজির উত্থান সম্পর্কে প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের স্মৃতিচারণে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। "প্রায় এ সময়ে (১৮৯১-৯২) আরেকটি বিষয় আমার চিন্তাকে গভীরভাবে আচ্ছন্ন করতে শুরু করে। ... দুঃসাহসী অবাঙালিরা বিশেষ করে রাজপুতানার বন্ধ্যা মরুভূমি থেকে আগত মাড়োয়ারিরা শুধু কলকাতা নয়, বরং বাংলার অভ্যন্তরে ঝাঁকে ঝাঁকে প্রবেশ করেছিল এবং আমদানি ও রপ্তানির সকল গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নিচ্ছিল।"[১৬]

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ববঙ্গের ক্ষেত্রেও দেখতে পাওয়া যায় যে, জুট প্রেসিং মিলেরক্ষেত্রে মাড়োয়ারিরা ছিল দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্যবসায়ী গোষ্ঠী। পূর্ববঙ্গে কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ চালকলের মালিক ছিল মাড়োয়ারি।

সুতরাং উনিশ শতক-বিশ শতকের প্রথম দশকের স্বদেশি আন্দোলন পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায় যে, এই সময় যত মাঝারি, বড় শিল্প গড়ে ওঠেছে তার বেশিরভাগ কলকাতা এবং এর অধিকাংশের মালিক ছিল অবাঙালি। আবার এর উদ্যোক্তা বাঙালিরা থাকলেও বেশিরভাগক্ষেত্রে তারা ব্যর্থ হয়। যেহেতু গবেষণার বিষয় ঢাকা সেহেতু উপরের আলোচনা থেকে সহজেই ঢাকার শিল্পকারখানার অবস্থা বোঝা যায়। অর্থাৎ এ সময় পূর্ববাংলা তথা ঢাকায় কোনো উল্লেখযোগ্য শিল্প-কলকারখানা ছিল না বললেই চলে। আর যা ছিল তা নাজুক অবস্থায় ছিল।

নানারকম সমস্যা থাকা সত্ত্বেও বিশ শতকের প্রথম দশকে ঢাকা শহরে কিছু ছোট আকারের শিল্পকারখানা গড়ে ওঠে, যার উল্লেখ বিভিন্ন রিপোর্টে পাওয়া যায়। ১৯১২ সালের *Eastern Bengal District Gazetteers*-এ উল্লেখ করা হয় যে, ঢাকা শহর থেকে একটু দূরে স্টিম অয়েল মিল, ১টি সাবান ফ্যাক্টরি, একটি ট্যানারি, একটি আয়রন ইন্ডাস্ট্রি এবং একটি রেলওয়ে ওয়ার্কসপ ছিল। এই ওয়ার্কসপে ৪০০ লোক কাজ করত।[১৭]

আবার আলোচ্য সময়ের শুরুতে অর্থাৎ ১৯২১-২৩ সালে ঢাকা শহরে যেসব ফ্যাক্টরি ছিল তা নিম্নবর্ণিত তালিকায় উল্লেখ করা হলো[১৮]—

সারণি-১

সাল	ফ্যাক্টরির সংখ্যা
১৯২১	৩২
১৯২২	৩৫
১৯২৩	৩৩

অথচ কলকাতায় ১৯২২ সালে ফ্যাক্টরির সংখ্যা ছিল ১২২টি এবং ১৯২৩ সালে ফ্যাক্টরির সংখ্যা ছিল ১২৭টি।[১৯]

সরকারি আরেকটি নথিতে ১৯২২ সালের ঢাকার ফ্যাক্টরির তালিকা এবং কর্মচারীদের সংখ্যার তালিকা পাওয়া যায়[২০]—

সারণি-২

Sl. N0.	Industry	Enumeration of Factories	Average daily number of Person employed by different industries
1.	Government and Local Fund Factories :		
	a. Engineering workshops	2	224

Dhaka University Institutional Repository

	b. Railway workshop	1	442
	c. Wollen Mill	1	150
2.	All other Factories General Engineering	3	624
3.	Chemical Dyes etc. Oil Mill	1	26
4.	Industry a. Cotton, Ginning, Cleaning and pressing works	1	542
	b. Jute, Press	26	7005

অনুরূপভাবে সরকারি আরেকটি রিপোর্ট/ নথিপত্রে ১৯২৩ সালে ঢাকা শহরে যেসব ফ্যাক্টরি ছিল এবং এসব ফ্যাক্টরিতে কতজন লোক কাজ করত তারও একটি পরিসংখ্যান পাওয়া যায়। যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো[২১]—

সারণি-৩

Sl. No.	Industry	Enumeration of Factories	Average daily number of person employed
1.	Government and Local fund Factories		
	a. Engineering workshop	2	248
	b. Railway workshop	1	437
	c. Wollen Mills	1	150
2.	All other factories a. General Engineering	3	361
3.	Chemical dyes etc. Oil Mill	1	26
4.	Gins and Press :		
	a. Cotton ginning, cleaning and pressing works	1	515
	b. Jute Press	24	7,963

উপরের তালিকায় দেখতে পাওয়া যায় যে, ঢাকায় ১৯২২ সালে ৩৫টি ফ্যাক্টরি ছিল এবং ৯০১৩ জন এই ফ্যাক্টরিতে নিয়োজিত ছিল। ১৯২৩ সালে ফ্যাক্টরির সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ৩৩ এবং ৯৭০০ জন কর্মচারী নিয়োজিত অর্থাৎ ১৯২৩ সালে ফ্যাক্টরির সংখ্যা কম হলেও ১৯২২ সালের চেয়ে বেশি লোক নিয়োজিত ছিল। অপরদিকে ঢাকার চেয়ে

Dhaka University Institutional Repository

কলকাতায় ফ্যাক্টরির সংখ্যা বেশি ছিল। আবার ঢাকায় এসব ফ্যাক্টরি থাকলেও কলকাতা ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে উপরে উল্লিখিত ফ্যাক্টরি ছাড়াও অন্যান্য ফ্যাক্টরিও ছিল। যেমন—

Arms and ammunition, Dock yards, Electrical Engineering, Electrical station, Jute Mill, Mathemetical Instrument factories, Mints, Pumping Station, Printing Presses, Tanneries, Telegraph works ইত্যাদি। এসব ফ্যাক্টরি ঢাকায় ছিল না।

১৯১৯ সালের পর স্বদেশি এবং বাঙালি স্বনির্ভরতার আন্দোলনের ফলে ঢাকা শহর এবং শহর থেকে একটু দূরে নারায়ণগঞ্জ এলাকায় বোম্বাইয়ের প্রতিযোগী হিসেবে কয়েকটি আধুনিক বস্ত্র মিল প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯২৭ সালে শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে গঠিত হয় ঢাকেশ্বরী কটন মিল। ১৯৩০-এর দশকে শেষ নাগাদ ঢাকেশ্বরী কটন মিল বাংলার সবচেয়ে লাভজনক মিলগুলির অন্যতম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯২৯ সালে গঠিত হয় চিত্তরঞ্জন কটন মিল, ১৯৩২ সালে লক্ষ্মীনারায়ণ কটন মিল, ১৯৩৬ সালে বান্ধব সুগার ও কটন মিল, ১৯৩৭ সালে ঢাকেশ্বরী কটন মিলের দ্বিতীয় মিল চালু হয় এবং ১৯৩৯ সালে ঢাকা কটন মিল স্থাপিত হয়। এছাড়া একটি দিয়াশলাই ফ্যাক্টরিও স্থাপিত হয়।[২২]

উল্লেখ্য এসমস্ত সুতিবস্ত্রমিলের প্রায় সবই বাঙালি মালিকানাধীন ও হিন্দু নিয়ন্ত্রণাধীন। ঢাকা কটনমিল ছাড়া প্রায় সবই নারায়ণগঞ্জে অবস্থিত।

১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে অল্প কিছু সংখ্যক শিল্প-কলকারখানা ছিল। দেশভাগের আগে পূর্ব পাকিস্তানকে (পূর্ববাংলা) পশ্চাদপদ দেশ হিসেবে মনে করা হতো। তাই কাঁচামাল ও শ্রমিক সরবরাহকারী দেশ হিসেবে কলকাতা ও তার আশেপাশের অঞ্চলে শিল্পকারখানা স্থাপিত হয়। এমনকি দেশভাগের পরেও প্রথম কয়েকবছর শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে কোনো উন্নতি দেখা যায় না। কারণ এসময় মূলধনের স্বল্পতা ও শিল্পোদ্যোক্তার অভাব ছিল। যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রদেশে (পূর্ব পাকিস্তান) তথা ঢাকায় শিল্পোন্নয়নের উদ্যোগ নেয়া হয় Pakistan Industrial Development Corporation (PIDC)-এর মাধ্যমে। শিল্পায়নের জন্য বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি আমদানি করার জন্য বৈদেশিক বিনিময় বণ্টন ও শিল্প অনুমোদনের বিষয়ে সরকারের সচেতন প্রচেষ্টা দ্বারা এটা (PIDC) করা হয়েছিল। এমনকি পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রথম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা (First Five Year Plan 1955-60) গ্রহণ করা হয় এবং এ বিষয়ে জনগণের উপর জোর দেয়া হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাতেও এই প্রদেশের শিল্পোন্নয়নের উপর সরকার কর্তৃক জোর দেয়া হয়। এসময় যে পদক্ষেপ নেয়া হয় তা একটি রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়—

"Special measures like liberalised imports of and lower duties on machinery, spares and raw materials, tax holidays, creation of National Investment Trust with a view to mobilising, the savings of the small man for industrial investment, a separate investment schedule for East Pakistan, bifurcation of P. I. D. C., etc., taken by Govt. after the revolution generated the momentum, particularly in the Private Sector, for setting up of industries in East Pakistan."[২৩]

Dhaka University Institutional Repository

মূলত ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর ঢাকা পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী হিসেবে গড়ে ওঠায় আধুনিক শিল্প নগরী সৃষ্টির এক অপূর্ব সুযোগ এনে দেয়। কেননা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে শিল্পজাত দ্রব্য এখানে আনতে জাহাজ ভাড়া ছিল ইউরোপ বা জাপান থেকে আমদানি করা খরচের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ।[২৪]

অর্থাৎ এই সময় থেকে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্প-কলকারখানা ও এলাকা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয়। উল্লেখ্য যে, ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে পূর্ব পাকিস্তানের ১২টি কটন মিল (৯৭০০০ স্পিন্ডল, ২৫৮৩ লুম), ৫টি চিনির মিল, ১১৫টি চায়ের ভূ-সম্পত্তি, ১টি সিমেন্ট ফ্যাক্টরি এবং ২টি ম্যাচ ফ্যাক্টরি এই প্রদেশের শিল্প সম্পত্তি হিসেবে গণনা করা হয়।[২৫]

যে কোনো দেশের আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সুনির্দিষ্ট জায়গা থাকা একান্ত দরকার। William Bredo, Industrial Estates কে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে—

"An industrial estate is a tract of land which is subdivided and developed according to a comprehensive plan for the use of a community of industrial enterprises. The plan must make detailed Provision for streets and roads, transportation facilities and installation of utilities. The plan may provide for the erection of factory buildings in advance of sale or lease to occupants.

The plan must ensure adequate control of the site and buildings through zoning, through private restrictions incorporated as legal requirements in deeds of sale or leases, and through the provision of continuing management, all with a view to protecting the investments of both the developer of the estate and tenants."[২৬]

ইংল্যান্ড ও অন্যান্য দেশের শিল্পায়তন ও লোকবলের মধ্যে যে পার্থক্য দৃশ্যমান; তা নিম্নের উদ্ধৃতির মাধ্যমে তুলে ধরা হলো।

William Bredo শিল্প এলাকার আয়তন সম্পর্কে বলেন "The size of an industrial estate may be measured by the total area of the site, developed or undeveloped, or by the total number of workers employed. ... For example, the density on British estates ranges mostly between 40 and 80 workers per gross acre."[২৭]

তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, "The largest British industrial estate is Trafford Park, which occupies a site of 1200 acres. In 1939 when the estate had reached full development, about 50,000 people were employed there. ... The largest unit in the united states is the Crab Orchard National Wildlife Refuge in Illinois, a light manufacturing area of 19,000 acres. The average size of organized industrial districts in the united states as reported in a 1957 study, is about 492 acres. Some 31 industrial districts, or 10 per cent of the total, are 1,000 acres or over."[২৮]

Dhaka University Institutional Repository

এটা পরিষ্কার যে, একটি শিল্প এলাকার অনুকূল আয়তন হবে পরিমিত। সাধারণত অনুকূল আয়তন নির্ভর করে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা ও সেবার উপর। যা ঐ এলাকায় স্থাপন করা হয়।

এই সময় ব্রিটিশ বোর্ড অফ ট্রেড যে রিপোর্ট দেয় তাতে বলা হয়—

The General Manager of the North- Eastern Trading Estates Ltd. believes "that from the administrative point of view 30 acres is the minimum size .... and that both on the basis of administrative and industrial consideration 100 acres would appear to be the optimum size".[২৯]

সুতরাং দেখা যায় যে, উন্নত বিশ্বে নির্দিষ্ট শিল্প এলাকা ছিল। এবং তা ছিল পরিকল্পিত, ফলে এসব দেশ আধুনিক শিল্পের জন্ম দেয়। আর আধুনিক শিল্প-কলকারখানার উৎপাদিত দ্রব্য দিয়ে বাজার দখল করে ফেলে। যেমন ইংল্যান্ডের তৈরি দ্রব্য এদেশের স্থানীয় দ্রব্যকে বিতাড়িত করে নিজেদের দ্রব্য দিয়ে বাজার দখল করে ফেলে। আর এটি সম্ভব হয়েছে পরিকল্পিত শিল্প এলাকা গড়ে তোলায়।

উল্লেখ্য আলোচ্য সময়ে উন্নত বিশ্বে বিশেষ করে ইংল্যান্ড ও আমেরিকার শিল্প এলাকার আয়তন তুলে ধরা হলো এ কারণে যে, একটি আধুনিক শিল্প এলাকা গড়ে তুলতে যে ধরনের উপকরণ প্রয়োজন বা যে ধরনের শর্ত থাকা উচিত তা এই দুটি দেশে বিদ্যমান ছিল। আর এটা থেকে ঢাকার শিল্প-এলাকা সম্পর্কে তুলনামূলক ধারণা পাওয়া যাবে।

১৯৪৭ সালের দেশভাগের আগে পূর্ববাংলা তথা ঢাকায় কোনো পরিকল্পিত শিল্প এলাকা ছিল না। কিন্তু দেশভাগের পরে পাকিস্তান সরকার এই ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়। ঢাকা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (Dacca Improvement Trust) কর্তৃক ৫৯০ একর জমির মধ্যে ৩৯০ একর জমির উপর তেজগাঁও শিল্প এলাকা স্থাপন করে। প্রত্যেকটি এক একর করে মোট ৩৪০টি প্লট ছিল। প্রত্যেক প্রাপককে কমপক্ষে এক বিঘা করে প্রদান করা হয়। হালকা ও মাঝারি শিল্পের জন্যই এই এলাকা বরাদ্দ দেয়া হয়।

অন্যদিকে ঢাকা বিমানবন্দর থেকে কয়েকমাইল দূরে টঙ্গীতে আরেকটি বৃহৎশিল্প এলাকা গড়ে ওঠে এবং এখানে অনেক বৃহৎ শিল্প-কলকারখানা গড়ে ওঠে।

১৯৫০ সালের একটি নথিতে দেখা যায় যে, পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প এলাকা স্থাপনের জন্য যেসব পদক্ষেপ নেয়া হয় তার চূড়ান্ত অনুমোদনলিপিতে বলা হয়— "At Tejgaon an area of 590 acres has been developed as an industrial area. At Hazaribagh about 20 acres has been set apart by Government for Tannaries. A separate area has been required for Amin Bros. for setting up large Tannery at Demra. An area comprising 200 acres of land has been acquired and made over to the Admjee Jute Mills and another area of 10 acres has been provided for B.O.C. at Sidderganj for Bulk Petrol Depo."[৩০]

পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকা শহরে শিল্পাঞ্চল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে *ঢাকা প্রকাশে* (১৯৪৯ সালের ১ জানুয়ারি) উল্লেখ করা হয় যে, "ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানাদি

Dhaka University Institutional Repository

স্থাপনের উদ্দেশ্যে সরকার ঢাকা শহরের নিকটবর্তী তেজগাঁও এলাকায় একটি বিরাট ভূ-খণ্ড নির্বাচিত করিয়াছেন। সরকার তথায় রাস্তাঘাট নির্মাণ, জল বিদ্যুৎ সরবরাহ করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত সমগ্র অঞ্চলব্যাপী শুধু শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপন করা হবে। বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকগণ ইচ্ছা করিলে সরকারের নির্বাচিত জমি হইতে অংশবিশেষ ইজারা লইতে পারিবেন। উক্ত জমির বিলিব্যবস্থার জন্য সরকার একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন।

ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকগণ জমির অংশ ইজারা লইতে হইলে একটাকা মূল্যের নির্ধারিত আবেদনপত্রে দরখাস্ত করিতে হইবে।

এই সম্পর্কে বিভিন্ন নিয়ম-প্রণালি অবগত হইবার জন্য দরখাস্তকারিগণকে পূর্ববঙ্গ সরকারের ইন্ডাস্ট্রিয়াল এডভাইজারের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতে বলা হইয়াছে।"[৩১(ক)]

বেশিরভাগ পশ্চিমা দেশগুলোতে বিশেষকরে ইংল্যান্ডে অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে শিল্পায়ন হয়েছে তা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে হয়েছিল। তখন পরিকল্পনা ছিল অজ্ঞাত। কোনো ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ছাড়াই সরাসরি উৎপাদন ও লাভের জন্য উৎপাদকরা উৎসাহী ছিল। কিন্তু বিশ শতকে এসে শিল্পপতিরা বৈজ্ঞানিকভাবে/ পরিকল্পিতভাবে উৎপাদনের চেষ্টা করে। ফলে তারা বিদ্যমান কারখানাকে টিকিয়ে রাখার জন্য বা সম্প্রসারণ করার জন্য অথবা উৎপাদিত দ্রব্য এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বিক্রির ব্যবস্থা ইত্যাদি পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এর ফলে তারা কতগুলো প্রশ্নের সম্মুখীন হয়—

১. কিভাবে দ্রুত উপযুক্ত বাড়ি বা জমি পাওয়া যাবে ?

২. পর্যাপ্ত শ্রমিক আছে কি ?

৩. যথেষ্ট যোগাযোগ ব্যবস্থা আছে কি ?

৪. কারখানাটি প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম কি-না ?

৫. বিপুল বাজার আছে কি ?

৬. শ্রমিকদের জন্য উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা ও আবাসস্থল আছে কি না ?

৭. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারবে কি ?

৮. শিল্পায়িত এলাকার অবস্থার উপর কী ধরনের পরামর্শ দেয়া হবে ?

উপরন্তু একটি শিল্প কী ধরনের হওয়া উচিত সে সম্পর্কে ১৯৫০ সালের একটি নথিতে উল্লেখ করা হয় এভাবে—

"There types of factory should be made available and within their range is the whole field of light industry.

a. The standard factory :

It has three outstanding features—low rent, modern constructions, and ease of expansion.It has an area of 5000 square feet and three or four standard factories grouped together will form a standard block.

Dhaka University Institutional Repository

Thus with minimum out-lay a business can be established to expand almost indefinitely. The building can grow with the firm. Within the limits of a single block, the tenant can cover up to 15000 or 20,000 square feet; and if more elbow-room is needed, he can spread to the next block.The process of expansion is as easy as enlarging a library by using a sectional bookcase.

Nor need decisions be taken in advance. The tenant can wait to see which way the cat jumps. Any lease signed with the Estate Authorities should be capable of being broken at any time to allow for expansion in this way.

Even within the limits of a single unit, extra space may be created. By building over the yard at the back, each bay 14 feet 6 inches deep adds 725 square feet to the floor space (encroaching only slightly on the yard, which in the average factory is 80 feet deep) ; and if still more space is wanted, the whole yard may be built over to within 35 feet of the centre of service road.

All space in a standard factory is efficient space. Thus in a typical brick and steel roof truss type of construction, a three-unit block of 15,000 square feet has only for internal columns, and a four-unit block of 20,000 square feet only six—an outstanding example of the ingenuity which goes into the planning.

There are offices, cloackrooms, and lavatories in the front part of each unit, and their lay-out can be modified to suit individual tenants.

Every unit faces a main road with a carriage-way 20 feet wide and with two footpaths 7 feet 6 inches wide. Between the road and the front wall is a parking place, which may be flanked by grass verges. Each yard has access service road 16 feet wide.

b. Special Factories :

This is the second type. The standard factory has a fixed design, but in some processes, special features may be required a higher roof, wider doors, an unusual layout. Or it may be that a private site is wanted, a site chosen by the manufacturer, even sometimes away from the Estate. In cases of this kind, the Estate Company will build a special factory to meet the special ease and let it at a suitable rental. An additional capital charge incurred in the building may be paid over a period up to the first break in the lease.

c. The nest factory :

And last, the nest, the small man's factory. Here again the same principles apply-low rent, modern construction, ease of expansion.

Dhaka University Institutional Repository

The nest factory has a floor-space of 1200 square feet. This is the nett size of the working space; but in addition, lavatories for both sexes are provided and there is a yard at the back for loading and storage. The yard may be built over if the tenant wishes to expand in that direction. Each unit faces either a main road or a service road.

The services provided for these factories and the methods and materials used in their construction, are in all ways similar to those already described. They are factories in miniature, small but efficient; it is an essential that they be offered at a low rental, for this creates one important advantage for the young business-capital which might have been swallowed by expensive building is left untouched to be used at the time when the business needs it most, at the beginning. This type of factory offers one final advantage. It is ideal for the transfer of small slum-type factories from densely populated areas in cities and large towns, where they operate as a rule under the worst possible conditions.

এই নথিতে কারখানার আকার ও নির্মাণশৈলী সার্ভিস (সেবা) কেমন হবে তাও উল্লেখ করা হয়—

The standard unit is normally 100 feet deep by 50 feet wide. The flat roofed section at the front covers the Entrance office space and lavatories and is 12 feet high, whereas the workshop area is 15 feet high, to the tie level of the roof trusses. Normally some backyard space is Provided, its depth depending on the site, sizes and conditions.

Generally the units are built in blocks of not less than four and the framed constructions allow the blocks to be increased by the additions of further units on either side or by extending one or more of the units into the backyard space.

In the small 'Nest' factory unites the size of the workshop is 40 feet deep by 30 feet wide and the height to the tie level of the trusses is 15 feet. At the back of the workshop is a flat roofed projection of 200 square feet which accommodates a rear entrance and two lavatories. Where space is available, each block of nest units will have a common back-yard.

b. Construction :

All foundations are of mass concrete reinforced as and if required. The buildings are steel-framed as indicated on the drawings.

The external walls are generally of brick built in two 4.5 inch thicknesses with a 2 inch cavity between. Internal partitions are also generally of brick, 9 inches thick in the case of partitions between units and 4.5 inches elsewhere.

Dhaka University Institutional Repository

The roofs of the workshops are pitched and glazed as indicated. Generally these roofs are either of the span type as illustrated or of the North-light type. The standard roof covering is asbestos cement sheeting, but again circumstances may make it necessary to adopt other materials such as protected steel sheeting.

The flat roofs over offices etc. are contructed *[Sic]* with precast R. IC. units finished on top with screeding and rock asphalt (or built up bituminous roofing).

All windows are of seel of standard 1.3/8 inch sections with opening parts as indicated. Generally all ashes to the workshops are glazed with rough cast glass.

Front entrance doors are 5 feet wide by 7 feet high and in two leaves; Doors to workshops are generally 9 feet wide by 11 feet, 6 inches high, two leaved and top hung to slide on inside of wall.

c. Service :

Services of water and electricity will be brought to all factories. The rates and conditions of supply made by the various supply authorities can be ascertained from them.

বিদ্যুতের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নেয়ার কথা বলা হয় —

1. Electricity—For each factory of 500 square feet the following provisions are made. Lighting points in workshops- sufficient to ensure an intensity of 10 foot candles at bench level; 5 points in entrance hall, office and lavatories; 2 external points; in factories where an upper floor is featured there are 4 additional lighting points.

The points are tubed and wired to ceiling roses and from these flexible cable and lampholders are suspended. Lamps and lighting fittings will not be supplied by the Estate company.

Cables for a three—phase power supply are taken to each factory. A power switchboard and all the necessary power wirings are the tenant's responsibility.

For each 'Nest' factory (1400 square feet) the following provisions are made:- lighting points; In workshops—sufficient to ensure an intensity of 10 foot candles at bench level, 3 points in lavatories and one external point."[৩২]

নথির উল্লিখিত বিষয় থেকে বোঝা যায় যে, একটি আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সুনির্দিষ্ট এলাকা থেকে শুরু করে এর নির্মাণ শৈলী, গঠন, বিভিন্ন সেবা যেমন—পানি ও বিদ্যুতের যথাযথ ব্যবহার, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকা একান্ত দরকার। যাহোক পাকিস্তান আমলে পাকিস্তান সরকার সীমিত পরিসরে হলেও ঢাকায় এরূপ একটি প্রকল্প গ্রহণ

Dhaka University Institutional Repository

করেন। এছাড়া আরো দেখা যায় যে, পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পের সম্প্রসারণের জন্য ১৯৪৮ সালে যে Industrial policy গ্রহণ করে, তাতে শিল্পক্ষেত্রে করারোপের উপর নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নেয়া হয় —

1. New industrial undertakings using power-driven machinery and employing more than 50 men in Pakistan would during the first five years be exempt from income-tax, super-tax and Business profits tax on so-much of their profits as do not exceed 5 per cent of the capital employed.

2. Concession of allowance of initial special depreciation of 15 per cent in respect of the year of erection of new buildings has been extended up to 31.3.53.

3. Initail special depreciation of 20 per cent which was allowed only on new machinery and plant has been extended to machinery and plant which is brought into use for the first time in Pakistan even if it has been previously used elsewhere.[৩৩]

গবেষণার এই পর্যায়ে পাকিস্তান আমলে ঢাকায় যেসব শিল্প-কলকারখানা গড়ে উঠেছিল ও পূর্বে যেসব ফ্যাক্টরি ছিল সেগুলো পাকিস্তান আমলে কেমন পর্যায়ে ছিল তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে ঢাকা শহরে যেসব কলকারখানা অবস্থিত ছিল আমরা মূলত সেগুলো নিয়েই আলোচনা করেছি। আবার কিছু ফ্যাক্টরি/কলকারখানা রয়েছে যেগুলো ঢাকা শহরের শিল্প-কলকারখানারই অংশ কিন্তু এই কারখানাগুলো ঢাকা থেকে একটু দূরে অবস্থিত। সেগুলো নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথমে ঢাকা শহরের বস্ত্র শিল্প সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বিশ শতকের শুরুতে অন্যান্য জেলায় তাঁত শিল্প নিম্নগামী হলেও ঢাকা জেলার তাঁতিদের ঐতিহ্য তখনও বিনষ্ট হয় নি। ঢাকার তাঁতিরা ধুতি, শাড়ি ও অন্যান্য কাপড় তৈরির মাধ্যমে তাদের উৎপাদনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে যাচ্ছিল। এইসব কাপড় গরিব জনগণের ব্যবহার উপযোগী ছিল। কেননা উন্নত বা আমদানিকৃত বিলাসবহুল কাপড় ব্যবহার করার ক্ষমতা তাদের ছিল না। ১৯০৬ সাল থেকে ১৯২২ সালের স্বদেশি আন্দোলন তাঁতশিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। খণ্ড কাপড়ের চাহিদাও ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। উন্নত সূক্ষ্ম তাঁতের কাপড় দক্ষ ও অভিজ্ঞ তাঁতি দ্বারা তখন তৈরি হতো। তবে মূল্য অধিক থাকায় এর বাজার সীমিত ছিল। ১৯০৬-১৯০৭ সালের দিকে ঢাকায় ইউরোপীয় পণ্য আমদানি হ্রাস পায়। ১৯০৫-১৯০৬ সালে ১,২০,৫৭৩ মণ ইউরোপীয় পণ্য আমদানি করা হয়। কিন্তু ১৯০৬-০৭ সালে তা ৯৪,৭১৮ মণে নেমে আসে। পরবর্তী বছরগুলোতে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) চলাকালীন জাহাজ চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। ফলে অবস্থার অবনতি ঘটে। ১৯১৯ সালের পর স্বদেশি আন্দোলন ও বাঙালি স্বনির্ভরতার আন্দোলনের ফলে বিদেশি মালামাল ও সুতা আমদানিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। দেশীয় চাহিদা পূরণ উপযোগী বোম্বের মিলগুলোতে প্রচুর কাপড় তৈরি হতো। ফলে এই সময় এই মিলের প্রতিযোগী হিসেবে ঢাকায় কয়েকটি আধুনিক বস্ত্র মিল গড়ে ওঠে। ১৯৪৭

Dhaka University Institutional Repository

সাল পর্যন্ত ঢাকায় স্থাপিত মিলগুলোর একটি তালিকা দেয়া হলো। এই তালিকা থেকে দেশভাগের পূর্বে বস্ত্রমিলের একটি পরিসংখ্যান পাওয়া যায়।

সারণি-৪

ক্রমিক নং	বস্ত্রমিলের নাম	স্থান	স্পিন্ডল (spindles)	তাঁত (Loom)
১.	ঢাকেশ্বরী কটন মিল (১)	নারায়ণগঞ্জ	২৮,৫০০	৭৮০
২.	ঢাকেশ্বরী কটন মিল (২)	নারায়ণগঞ্জ	২১,২৮০	৫১১
৩.	চিত্তরঞ্জন কটন মিল	ঐ	৯,৭২০	১৫০
৪.	লক্ষ্মীনারায়ণ কটন মিল	ঐ	-	-
৫.	ঢাকা কটন মিল	পোস্তগোলা	৩,৩০০	১২৪
৬.	বান্ধব সুগার এবং কটন মিল	চরসিন্ধু, ঢাকা	১,৬৬৮	-
৭.	লক্ষ্মী স্পীনিং এ্যান্ড উইভিং	নারায়ণগঞ্জ	২,৪০০	-

উৎস : S.N.H Rizvi, *East Pakistan District Gazetteers, Dacca*, 1969, p. 169.

এ সমস্ত মিলের স্থাপনা, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণে অধিকাংশই ছিল বাঙালি ও হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক। দেশভাগের পর এই সমস্ত হিন্দু এই প্রদেশ থেকে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে পাড়ি জমায়। ফলে মিলগুলির দুর্দিন ঘনিয়ে আসে। অপর দিকে মিলের মালিকরা পুঁজি প্রত্যাহার করে নিলেও মিলগুলি ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। তখন সরকার এগুলো রক্ষার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

আবার ১৯৪৮ সালের রিপোর্টে দেখতে পাওয়া যায় যে, ঢাকা জেলায় ৬টি কটন মিল ছিল। এর মধ্যে ১টি ঢাকা শহরে অবস্থিত। বাকিগুলো ঢাকা শহর থেকে একটু দূরে নারায়ণগঞ্জে অবস্থিত। এই রিপোর্টে মিলের মূলধন ও মিলে নিয়োজিত কর্মচারীর সংখ্যা উল্লেখ করা হয়[৩৪]—

সারণি-৫

Sl. No.	Name & Address of the Factory	Capital outlay	Manpower employed
1.	Dacca Cotton Mills, P.O. Faridabad, Dacca	66,0225/-	390
2.	Luxmi Narayan Cotton Mills Ltd., Narayanganj	22,56000/-	950
3.	Dhakeswari Cotton Mills, Narayanganj	-	-
4.	Adarsha Cotton Mills, Nrayanganj	-	-

Dhaka University Institutional Repository

5.	Chittaranjan Cotton Mills, Narayanganj	37,00,000/-	1200
6.	Luxmi Spinning and Weaving Mills, Narayanganj	18,50,000/-	194

১৯৪৮ সালের এই একই নথিতে ঢাকাসহ সমগ্র পূর্ববাংলায় বিদ্যমান কটন মিলের তাঁত (Loom), সুতাকাটার টাকুর (Spindles) সংখ্যা এবং নতুন করে যে তাঁত ও টাকু বণ্টন করা হয় তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো[৩৩] —

সারণি-৬

Sl. No.	Name & Address of Mill	Existing Looms	No. of Spindles	New Allocation	
				Looms	Spindles
1.	Dhakeswari Cotton Mills Ltd., No.1, Dhamgorh, Narayanganj	780	28,500	-	-
2.	Ditto	510	21,280	-	-
3.	Luxminarayan Cotton Mills Ltd., Godnyle, Narayanganj	222	5,628	106	9000 (F)
4.	Chittaranjan Cotton Mills, Godnyle, Narayanganj	150	9,720	286	8000 (c)
5.	Luxmi Spinning & Weaving Mills, Habiganj, Narayanganj	-	2,400	110	6000 (c)
6.	Dacca Cotton Mills Ltd., Postagolla, Faridabad, Dacca	124	4,500	-	-
7.	Bandhab Sugar & Cotton Mills, Ltd., Charsindur, Dacca	-	1,968	-	-
8.	Mohini Mills Ltd., Kustia	527	19,288	-	1,152
9.	Acharya Gafulla Chandra Cotton Mills Ltd., Kushtia	110	-	140	8000 (c)
10.	Bagerhat Co-operation Weaving Mills Ltd., Bagerhat, Khulna	50	-	-	-
11.	National Cotton Mills Ltd., Halishohar, Chittagong.	-	-	150	6,476 (c)
12.	Adarsha Spinning & Weaving Mills Ltd., Narayanganj	-	-	200	9000 (f)

`f' Indicate Fine and `c' Coarse

Dhaka University Institutional Repository

দেখা যায় যে, ১৯৪৮ সালে সমগ্র পূর্ববাংলায় ১২টি কটন মিলের মধ্যে ঢাকা শহরে ১টি, নারায়ণগঞ্জে ৬টি, কুষ্টিয়ায় ২টি, ১টি খুলনায় এবং ১টি ময়মনসিংহে অবস্থিত ছিল।

আবার ১৯৫৮ সালের একটি রিপোর্টে ঢাকায় অবস্থিত বিভিন্ন কটন মিলের উৎপাদন ক্ষমতা, শ্রমিক সংখ্যা এবং কী ধরনের শক্তি ব্যবহৃত হতো সে সম্পর্কে জানা যায়। তালিকাটি নিম্নে বর্ণিত হলো[৩৬]—

সারণি-৭

Sl. No	Names and Addresses of Factories	Power used	Annual production capacity	Average number of workers employed daily during the Year 1956
1.	The Dhakeswari Cotton Mills No.1, P.O.Dhakeswari Mills, Narayanganj, Dacca	Electricity	10,500,000 yds. cloth and 3,640826 lbs of yarn	327
2.	The Dhakeswari Cotton Mills, No.2,Godnyle, Narayanganj, Dacca	Do	10,166775 yds. of cloth and 1419,360 lbs. of yarn	2,043
3.	Olympia Textile Mills Ltd., No.11	Do	1007,440 yds. of cloth	325
4.	The Adarsha Cotton Spinning and Weaving Mills Ltd., 36, Hatkhola road, Dacca	Do	1,368000 lbs of yarn	718
5.	Chittaranjan Cotton Mills Ltd., Godnyle, Narayanganj, Dacca	Do	7,000,000 yds. of cloth and 3000.000 lbs. of yarn	1672
6.	Luxmi Narayan Cotton Mills Ltd. , No.1, Tongi, Dacca	Do	2,500,000 yds. of cloth and 2,150,000 lbs. of yarn	1,603
7.	Olympia Textile Mills Ltd., No.1, Tongi, Dacca	Do	2,500,000 yds of cloth and 1,500,000 lbs. of yarn	1,603
8.	Dacca Cotton Mills Ltd. ,	Do	2,444,317 Yds.	612

Dhaka University Institutional Repository

	Faridabad, Dacca		of cloth and 1,199,286 lbs. of yarn	
9.	Dacca Handloom Factory, 31,Haricharan Roy road, Faridabad, Dacca	Do	120 Pieces daily	125
10.	Muslin Cotton Mills, Kaliganj, Dacca	Do	6,042,400 lbs of yarn	1,794
11.	The Eastern Textile Industries, Narsingdi, Dacca	Diesel Oil	2,070,000 pairs of cloth calendering	45

এখানে উল্লেখ্য যে, এ সমস্ত সুতিবস্ত্র মিলের প্রায় সবগুলো পুরোপুরি বাঙালি মালিকানাধীন ছিল।[৩৭]

আবার ১৯৬০-এর দশকের একটি রিপোর্টে দেখতে পাওয়া যায়, পূর্ব পাকিস্তানে মোট ৪৬টি টেক্সটাইল মিল ছিল। যার মোট স্পিন্ডল (টাকু) হলো ৭,৫৭,৯০৬ এবং ৬,৫০০ লুম (তাঁত), এই ৪৬টি টেক্সটাইল মিলের মধ্যে ৩৩টি তখনও কার্যকরী ছিল বাকিগুলোর কাজ শুরু করার প্রক্রিয়াধীন অবস্থায় ছিল। ফলে প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ স্পিন্ডল ও ৪,৮৬৭টি তাঁত তখনও সচল ছিল।[৩৮]

ষাটের দশকে পূর্ব পাকিস্তানে মোট সুতার চাহিদা ছিল ৪,৮০,০০০ বেল। যার মধ্যে মাত্র ৮০,০০০ বেল পূর্ব পাকিস্তানে উৎপাদিত হতো এবং বাকি অংশ পশ্চিম পাকিস্তান ও অন্যান্য দেশ থেকে আমদানি করা হতো।[৩৯]

১৯৫০ সালের একটি নথিতে দেখতে পাওয়া যায় যে, পূর্ব পাকিস্তানে যেসব বস্ত্রমিল ছিল সেগুলো দেশীয় চাহিদা পুরোপুরি মেটাতে পারত না। ফলে বিভিন্ন দেশ থেকে সুতা, বিভিন্ন ধরনের কাপড় আমদানি করা হতো। এই নথিতে ঢাকার বাজারের কাপড়ের খুচরা মূল্য ও পাইকারি মূল্য উল্লেখ করা হয়।[৪০]

সারণি-৮ [পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন]

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-৮

WHOLESALE AND RETAIL PRICES OF CONSUMER GOODS IN DACCA AS ON 9th AUGUST, 1950

Commodities	Specification	Unit	Wholesale Price				Unit	Retail Price			
			Nawabpur area		Moulvibazar area			Nawabpur area		Moulvibazar area	
			Present price	Last month price	Present Price	Last month price		Present price	Last month price	present price	Last month price
1. Cloth and yarn : a. Yarn	(i) Hank (U.K) 20 counts	10 Lbs each	N. Q.	N.Q.	25-8-0	25-0-0	10 Lbs each	N.Q.	N.Q.	26-0-0	25-8-0
	(a) " Italy	"	"	"	26-0-0	25-8-0	"	"	"	27-0-0	26-0-0
	(b) " India	"	"	"	25-0-0	25-0-0	"		"	25-8-0	25-8-0
	(ii) Cups (U.K) 20 counts	"	"	"	25-0-0	24-8-0	"	"	"	25-8-0	25-0-0
	(a) " Italy	"	"	"	23-8-0	23-0-0	"	"	"	24-0-0	23-8-0
	(b) " India	"	"	"	23-8-0	23-12-0	"	"	"	24-0-0	24-4-0
(b) Long cloth	Trade No. 5050 place of origin Japan	42 Yards piece	"	65-0-0	N. Q.	65-0-0	Per yard	2-0-0	1-10-0	2-0-0	1-12-0
(c) Shirting	Width 32" Steel Bros. England	40 yards piece	97-8-0	95-0-0	100-0-0	95-0-0	"	2-12-0	2-8-0	2-10-0	2-8-0
(d) Coating	Width 54" Steel Bros. U.K.	"	95-0-0	73-0-0	98-0-0	73-0-0	"	2-10-0	2-0-0	2-12-0	2-0-0
(e) Saree	Trade No.4550. Prova Mills. India	Per Piece	7-0-0	7-0-0	7-0-0	7-0-0	Each	7-4-0	7-8-0	7-6-0	7-8-0

উৎস : *B proceedings*, B # 76, File No. 4P-4/49, Branch : Commerce, Department : C. L & I, Government of East Bengal, 1950, p. Appendix (4) 5.

Dhaka University Institutional Repository

ষাট দশকের রিপোর্টে আরো বলা হয় যে, এই সময় মোটামুটিভাবে পূর্ব পাকিস্তানে বার্ষিক মোট কাপড়ের চাহিদা ছিল ৭২,৫০,০০,০০০ গজ (yards)। কিন্তু কাপড়ের চাহিদার চেয়ে উৎপাদন অপর্যাপ্ত ছিল। তাই কাপড় (cotton cloth) এবং সুতার (cotton yarn) ঘাটতি পূরণ করতে ১০ লক্ষ স্পিন্ডল এবং ৭০০০ লুম অনুমোদনের জন্য তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী Third Five Year Plan (1965-70) পরিকল্পনা করা হয়।

নিম্নে ১৯৫৮ সাল থেকে পূর্ব পাকিস্তানের (ঢাকাসহ সমগ্র প্রদেশ) বস্ত্র শিল্পের অগ্রগতি একটি পরিসংখ্যানের মাধ্যমে দেখানো হলো :

সারণি-৯

Year	No of Reporting Mills at the end of the period	Installed the end spindles (000)	Capacity of the period looms (000)	Consumption of raw cotton during the period (000Ibs)	Total product during the period (000 Ibs)	Total production of cloth (000 yds)
1958	-	320	3	49,144	40,115	65,217
1959	18	346	3	55,950	45,391	63,872
1960	18	359	3	59,614	48,605	64,761
1961	-	378	3	62,975	51,289	69,372
1962	24	403	3	63,321	54,362	62,765
1963 Up to Oct. 1963	27	488	3	56,655	48,368	40,813

উৎস : 1. *C.S.O. Bulletin*

2. East Pakistan Cotton Mills Association

উদ্বৃত, *Economic Survey of East Pakistan (1963-64)*, East Pakistan Govt. press, 1964, p. 27.

দেশ স্বাধীনের পর (১৯৪৭) পূর্ব পাকিস্তানের স্পিনিং সেক্টরে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়। যা নিম্নের সারণিতে ১৯৫৮ সাল থেকে Cotton Fabrics-এর পরিসংখ্যান দেখে বোঝা যায় —

Cotton Fabrics Statistics of East Pakistan

সারণি-১০

(In thousand)

Year	Total	Fine	Medium	Coarse
1958	65,217	25,116	37,587	2,514
1959	63872	20,625	41,669	1,578
1960	64,761	22,692	41,966	103
1961	69,372	22,250	47,122	Nil

Dhaka University Institutional Repository

1962	62,765	13,651	49,113	Nil
1963 up to 10 october	36,887	11,522	29,507	27

উৎস : *Economic Survey of East Pakistan* 1963-64

East Pakistan Govt. press 1964, p. 27.

১৯৬৯ সালের *ঢাকা গেজেটিয়ারে* উল্লেখ করা হয় দেশ বিভাগের পর ঢাকায় আরো ১৩টি মিল প্রতিষ্ঠিত হয়। এরফলে মিলের সংখ্যা দাঁড়ায় ২০টি।[৪১] উৎপাদনক্ষমতাসহ নিম্নে এই সমস্ত মিলের অতীত ও বর্তমান তালিকা দেয়া হলো :

সারণি-১১

Sl. No	Name of Cotton Mills	Location	Spindle	Loom
1.	Adarsha Cotton Spinning and Weaving Mills	Narayanganj	11,432	145
2.	Ahmad Bawany Textile Mills No. 1 and No.2 1953	Demra	25,000 15,000	436
3.	Ashraf Textile Mills, 1962	Tongi	12,000	-
4.	Chand Textile Mills, 1957	Kadamtoli	12,600	205
5.	Chittagong Cotton Mills, 1929	Narayanganj	19,864	255+141
6.	Bandhav Sugar and Cotton Mills, 1936	Mirerbag	10,000	-
7.	Dacca Cotton Mills, 1939	Postagola	13,440	138+86
8.	Dhakeswari Cotton Mills, No.1, 1927	Narayanganj	30,440	810
9.	Dhakeswari Cotton Mills, No.2, 1937	Do	21,280	554
10.	East Pakistan Textile Mills	Do	12,400	207
11.	Fine Cotton Mills, 1962	Tongi	12,400	-
12.	Gausia Cotton and Spinning Mills	Murapara	12,400	176
13.	Luxmi Narayan Cotton Mills, 1932	Narayanganj	15,996	306
14.	Megha Textile Mills	Tongi	12,400	176
15.	Monno Textile Mills	Do	15,700	-
16.	Muslim Cotton Mills, 1954	Kaliganj	48,000	500
17.	Olympia Textile Mills old and new units, 1954	Tongi	25,440	317

Dhaka University Institutional Repository

18.	Quaderia Textile Mills. 1963	Do	7,290. 12,400	136 176
19.	Shamin Textile Mills	Rupshi	12,400	176
20.	Zenat Textile Mills	Tongi	25,200	430

উৎস : S.N.H, Rizvi, *East Pakistan District Gazetteer, Dacca*, 1969, p. 198.

উপরের তালিকায় দেখা যায় যে, ঢাকা শহরসহ ও তার আশেপাশের শহরে বেশকিছু বস্ত্রকল গড়ে ওঠে। যার মাধ্যমে এদেশীয় জনগণের বস্ত্রের চাহিদা মেটানো হতো। যদিও এই সময় বাইরে থেকে বিশেষ করে পশ্চিম পকিস্তান থেকে বেশি কাপড় আমদানি করা হতো। উল্লেখ্য তালিকায় দেখা যায় যে, মুসলিম কটন মিল নামে কালিগঞ্জে কোনো মিল প্রতিষ্ঠিত হয় নি বরং মসলিন কটন মিল প্রতিষ্ঠিত হয়।[৪২] আবার নারায়ণগঞ্জে ১৯২৯ সালে চিটাগাং কটন মিল নামে কোনো মিল প্রতিষ্ঠিত হয় নি। বরং চিত্তরঞ্জন কটন মিল প্রতিষ্ঠিত হয়। যার উল্লেখ বিভিন্ন রিপোর্টে পাওয়া যায় এবং তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

ঢাকেশ্বরী কটন মিল

ঢাকেশ্বরী কটন মিল লি., ঢাকা তথা বাংলার গৌরব ছিল। ১৯২৭ সালে শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে নারায়ণগঞ্জে প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকেশ্বরী কটন মিলের প্রতিষ্ঠাতা ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন বাবু রজনীমোহন বসাক।[৪৩] বিনায়েক সেন উল্লেখ করেন যে, ঢাকেশ্বরী কটন মিল (গোদনাইল) চিত্তরঞ্জন কটন মিল (ধানঘর) এবং লক্ষ্মীনারায়ণ কটন মিল ৪টির মালিক ছিলেন সূর্য কুমার বসু।[৪৪] ১৯২৯ সাল পর্যন্ত মিল ম্যানেজার ছিলেন শ্রীযুক্ত রায়। *ঢাকা প্রকাশে* উল্লেখ করা হয় যে, তাকে নাকি এই সময় বরখাস্ত করা হয়।[৪৫] যাহোক ঢাকেশ্বরী কটন মিল তখন পূর্ববাংলার জনগণের কাপড়ের চাহিদা মেটাতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখত। বিভিন্ন সময়ে এর উৎপাদন ক্ষমতা, কর্মচারীর সংখ্যা এবং স্পিন্ডল ও তাঁতের হিসাব এবং কী ধরনের শক্তি ব্যবহৃত হতো তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তবে ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ঢাকেশ্বরী কটন মিল লিমিটেড–এর বার্ষিক আয়-ব্যয়ের একটি হিসাব পাওয়া যায় *ঢাকা প্রকাশে*। *ঢাকা প্রকাশে* এভাবে উল্লেখ করা হয় যে, "আমরা সম্প্রতি ঢাকেশ্বরী কটন মিল লিমিটেড কোম্পানির ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দের আয়-ব্যয়ের হিসাব সম্বলিত বার্ষিক কার্যবিবরণীর একখণ্ড রিপোর্ট সমালোচনার্থে প্রাপ্ত হইয়াছি। কোম্পানির ডিরেক্টরগণের রিপোর্ট, ব্যালেন্স-সিট এবং আয়-ব্যয় ও লাভের হিসাব আমরা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। এবং নিম্নে এ সম্বন্ধে আমাদের অভিমত প্রকাশিত হইল :

কোম্পানির ব্যালান্স-সিটে দেখা যায়, পূর্ববর্তী বৎসরসমূহের রিজার্ভ তহবিলসহ আলোচ্য বৎসরে মোট প্রায় ৬৪,৫২৭ টাকা ১১ পাই রিজার্ভ তহবিল দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু পৃথকভাবে এই তহবিলের কোনো সংস্থান নাই, সমগ্র চলতি মূলধন ও ব্যবসায়ের অন্যান্য চলতি সংস্থানের মধ্যে নিহিত আছে। আমরা পূর্বেও বলিয়াছি এবং বর্তমানেও বিশেষ দৃঢ়তার সহিতই বলিতেছি যে, রিজার্ভ তহবিল কোম্পানির প্রাণস্বরূপ, কোম্পানির কোনো অপ্রত্যাশিত বিপদের সম্মুখীন হওয়ার উদ্দেশ্যেই রিজার্ভ তহবিলের প্রয়োজন। অন্যথা

Dhaka University Institutional Repository

কোম্পানির আর্থিক দুর্বলতাই সূচিত হইয়া থাকে। কাজেই চলতি মূলধন ও ব্যবসায়ের অন্যান্য চলতি সংস্থানে রিজার্ভ তহবিলের নিয়োগ কোনো অবস্থায়ই সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। আমরা এ বিষয়ে কোম্পানির ডিরেক্টরবর্গকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতেছি।

চারি দফায় বন্ধকী ঋণের পরিমাণ প্রায় ২৪,৯৬,৩২৫ টাকা ১১ পাই। তন্মধ্যে সেন্ট্রাল ব্যাংক অব ইন্ডিয়া হইতে গৃহীত ঋণ দুই দফায় প্রায় ১,১৯,৯৫২ টাকা ৯ পাই এবং দুই দফায় ইম্পেরিয়াল ব্যাংক অব ইন্ডিয়া হইতে প্রায় ১২,৯৬,৮০১ টাকা ২ পাই।

কোম্পানির অবন্ধকী ঋণের পরিমাণ প্রায় ৭,৩৬,৯৭২ টাকা ৯০ আনা ইহার মধ্যে প্রায় পৌনে দুই লক্ষ টাকা ডিরেক্টরগণ ঋণস্বরূপ প্রদান করিয়াছেন। ইহা হইতে দেখা যায়, কোম্পানির মোট পরিশোধনীয় ঋণের পরিমাণ প্রায় ৩২,৩৬,২৯৭ টাকা ১১ পাই। কিন্তু এই বিরাট দেনার প্রতি সংস্থান হিসাবে প্রায় ১৪,২৬,৮৬৯ টাকা ৩ পাই মূল্যের তুলা, প্রায় ৩,৫৭,১৬৩ টাকা ৫ পাই মূল্যের অন্যান্য মাল-মসলা এবং প্রায় ৮,৯৯,৭৪১ টাকা ৯৯ পাই মূল্যের কাপড়, সুতা ইত্যাদিতে মোট প্রায় ২৬,৮৩,৭৭ টাকা ৫ পাই এবং বাজারে প্রাপ্য মোট প্রায় ৪,১৪,২০৫ টাকা ৫ পাই সর্বসুদ্ধ মোট প্রায় ৩০,০৯৭৯ টাকা ১০ পাই পাওয়া যাইতেছে (এক্ষেত্রে কয়লার মূল্য প্রায় ৫৯,২৬১ টাকা ৩ পাই ধরা হয় নাই)।

...আলোচ্য বৎসরে কোম্পানির গ্রোস লাভের পরিমাণ প্রায় ৫,৫২,৬৫৭ টাকা ৭ পাই, এবং নিট লাভের পরিমাণ প্রায় ৩৬,৬৪৬ টাকা ১০ পাই হইয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসরের গ্রোস লাভের পরিমাণ প্রায় ৮,৪৭,০০০ টাকা ছিল। গ্রোস লাভের পরিমাণে প্রায় তিন লক্ষাধিক টাকা হ্রাস পাওয়ার কারণস্বরূপ ডিরেক্টরগণ তুলার মূল্যবৃদ্ধি তদ্ধেতু কাপড়ের মূল্যবৃদ্ধি, অজন্মার দরুন অর্থ ক্লিষ্ট জনসাধারণের ক্রয় করিবার ক্ষমতা হ্রাস প্রভৃতি এবং ২নং মিলের ব্যয়বৃদ্ধি ইত্যাদি উল্লেখ করিয়াছেন।

কোম্পানির ডিরেক্টরগণ এবারও শতকরা ১০ টাকা হিসাবে লভ্যাংশ প্রদান ঘোষণা করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এ বিষয়ে আমরা ডিরেক্টরগণের সহিত একমত হইতে পারিতেছি না। কোম্পানির ব্যালান্স-সিট ও আয়-ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত হিসাব দৃষ্টে যতদূর বুঝা যায়, তাহাতে কোম্পানি এই লভ্যাংশ প্রদান আগামী বৎসরসমূহে একরূপ রাখিতে পারিবেন কিনা, তদ্বিষয়ে আমরা কোনোরূপ নিশ্চিত অভিমত পোষণ করিতে পারিতেছি না। আমাদের মনে হয়, কোম্পানি এবার লভ্যাংশ প্রদানের পরিমাণ হ্রাস করিয়া শতকরা ৬ টাকা ০ আনা করিলে অত্যন্ত শোভন হইত। ইহাতে হয়ত কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন। কিন্তু লভ্যাংশ প্রাপ্তির প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, কোম্পানির ব্যবসায় ও আর্থিক সংস্থানের উপর ভিত্তি করিয়া বিষয়টি চিন্তা করিলেই আমাদের কথায় যৌক্তিকতা উপলব্ধি করা যাইবে"।[৪৬]

উপরের আলোচনা হতে বোঝা যায় যে, ঢাকেশ্বরী কটন মিল আর্থিকভাবে অসচ্ছল ও বিপুল পরিমাণে ঋণী ছিল। পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১৯৩৮ সালে লাভের পরিমাণ কম ছিল। এছাড়া অন্যান্য কারণের মধ্যে তুলার মূল্যবৃদ্ধি, কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধি এবং জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস এবং ২নং মিলের ব্যয়বৃদ্ধি ইত্যাদি। উপরন্তু শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক ছিল না। যা একটি মিলের সাফল্যের জন্য একান্ত

Dhaka University Institutional Repository

দরকার। ফলে বিভিন্ন কারণে অন্যান্য সমস্যা দেখা দিলে ঢাকেশ্বরী কটন মিলের শ্রমিকরা ধর্মঘট আহ্বান করে। এ বিষয়ে *ঢাকা প্রকাশ* উল্লেখ করে যে,

"গত ৬ই মাঘ শনিবার ঢাকেশ্বরী কটন মিলের প্রায় ৩ হাজার শ্রমিক ধর্মঘট করিয়াছে। ২শত ধর্মঘটকারী শ্রমিক মিল-গেটে পিকেটিং করিতেছে। মিল অঞ্চলে পুলিশ মোতায়ন আছে। ১নং মিলের ধর্মঘটকারী শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া ২নং মিলের শ্রমিকগণও ঐ দিবস অপরাহ্নে ধর্মঘট করিয়াছে। ধর্মঘটকারী শ্রমিকদের দাবিসমূহ নিম্নে উদ্ধৃত হইল —

১. শ্রমিক ইউনিয়নকে মানিয়া লওয়া
২. অবিলম্বে সাতজন কর্মচ্যুত শ্রমিকের কার্যে পরিণত করা
৩. গত ধর্মঘটের আপোষ মীমাংসায় শর্তাবলি কার্যে পরিণত করা
৪. নানাবিধ অভিযোগের প্রতিকার করা
৫. শতকরা ৩৩ $\frac{১}{৩}$ টাকা হারে বেতন বৃদ্ধি করা,
৬. শ্রমিকের সংখ্যা কমান বন্ধ করা।"[৪৭]

এছাড়া শেয়ার হোল্ডারদের বিভিন্ন অভিযোগও *ঢাকা প্রকাশে* প্রকাশিত হয় এভাবে—

"গত ১৯২৩ সালের ১লা জুলাই তারিখের একখণ্ড প্রোস্পেক্টাস দ্বারা জনসাধারণকে আহ্বান করেন। শেয়ার বিক্রয়ের সময় যে সকল প্রলোভন দেওয়া বিক্রয়ের পক্ষে আবশ্যক, কর্মকর্তাগণ সে সকল অনুষ্ঠানের কোনো ত্রুটিই করেন নাই। বোম্বাইর বড় ছোট সমুদয় মিলের মূলধন ও লভ্যাংশের এক তালিকা ও আহম্মদাবাদ মিলগুলির লভ্যাংশের তালিকা প্রকাশ করিয়া কর্মকর্তারা দেশবাসীর চিত্তে লাভের একটা ভাবী মনোরঞ্জন চিত্র আঁকিয়া দিয়াছিলেন। যদিও লিমিটেড কোম্পানির উপর নানা কারণে বিশ্বাস খুব শিথিল, তথাপি ঢাকেশ্বরী কটন মিলের প্রোস্পেক্টাস দর্শনে অতি মাত্রায় প্রলুব্ধ হইয়াছিলাম। লিমিটেড কোম্পানি অনেকগুলিই সশরীরে স্বর্গ লাভ করিয়াছেন এবং স্বর্গ প্রয়াসের সময় তাঁহারা একরাশি ঋণ দেখাইয়া কর্মকর্তাগণের প্রশংসা ত্যাগ ও নির্লোভ অতিরিক্ত শ্রমের দুন্দুভিবাদন করিতে ভুল করেন নাই। তথাপি ঢাকার একটা অত বড় অনুষ্ঠানের সহিত নিজেকে সংযুক্ত রাখার আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল। একদিকে বোম্বাই ও আহম্মদাবাদ মিলের কলওয়ালাদের মত লাভের সম্পাদন এই দুই আকর্ষণে মুগ্ধ আমি ২০০ টাকার শেয়ার ক্রয় করিয়াছিলাম। জানি যে, "শতমারী ভবেৎ বৈদ্য" ও "সহস্রমারী চিকিৎসক" মিল বা দোকান পরিচালনে যে যত বেশি ফেল মারিতে পারে সে যে ততবেশি যোগ্য, ইহা অস্বীকারের উপায় নাই। পুনঃপুনঃ পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ ছাত্রের অভিজ্ঞতা যে বেশি ইহা আমরা জানি। এই মিলের কর্মকর্তাগণের মধ্যে তেমন অভিজ্ঞ ব্যক্তিও আছেন কিনা, একবার জানিবার ইচ্ছা যে না হইয়াছিল এমন নহে। এমন কি দুর্ভিক্ষের সময়ে জনসাধারণের জন্য সংগৃহীত চাউলের অপব্যবহার সম্বন্ধেও অনেক কানাঘুষা সংবাদ বড় বড় নেতার বিরুদ্ধে দেশময় রাষ্ট্র হইয়া থাকে। এমন সব বড় বড় মানুষ ও অভিজ্ঞগণকে আমরা যে ভয় করিয়া চলি, তাহাতে সংশয় নাই।

Dhaka University Institutional Repository

এতসব অন্তরায়ের বিরুদ্ধেও ৪ বৎসর পূর্বে আমি ২০০ টাকার শেয়ার কিনিয়া প্রশংসাসুলভ ফলের আশায় চাহিয়া রহিলাম। বিশেষত শ্রীযুক্ত রজনীমোহন বসাকের নামটি ম্যানেজিং ডিরেক্টরের মধ্যে দেখিয়া অনেকটা আশাও হইয়াছিল। টাকা দেওয়ার পর হইতেই লাভের আশায় চাহিয়া আছি। কর্মকর্তারা বর্ষে বর্ষে তাহাদের জমা খরচ দেখাইতে কোনোরূপ কার্পণ্য করেন নাই। কিন্তু আমাদের পকেটে দিবার জন্য তাহাদের হাতে এক মুষ্টি ছাইও দেখা গেল না।

অতঃপর ১৯২৮, ৩১শে ডিসেম্বর ৬ষ্ঠ বার্ষিক রিপোর্ট ও আয় ব্যয়ের হিসাব পাইলাম। কাগজে প্রায় ১,৪৭,০৫৯ টাকা ১১ পাই লাভের 'সন্তো' জনক অঙ্ক দেখিয়া আমাদের চিত্ত অজানা রাজ্যে একটা প্রকাণ্ড লাফ মারিল। কিন্তু কলকজার বাড়তি পড়তির অদ্ভুত খরচা প্রায় ৮১,৯৮৪ টাকা ৯৬ পাই দেখিয়াই চক্ষু স্থির। টাটকা নতুন কলেই যদি বছরে ৮২ হাজার টাকার মতন ঝড়তি পড়তি নামক খরচা পড়ে,—

মিলের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে এই সকল জনসাধারণযোগ্য ব্যয় ও অসম্ভব রকমে বাড়িয়া যাইবে। কর্মকর্তারা অংশীদারগণকে লভ্যাংশের কর্পদ্দকও না দেওয়ার জন্য যে সকল সদ্যয় দেখাইয়া সদুপদেশ ও ভরসা দিয়াছেন, তাহাতে বিস্ময়ের যথেষ্ট কারণ বর্তমান আছে। নেট মুনাফা প্রায় ৫৭,০৭৫ টাকা ৫ পাই-এর অংশ মত যদি কিঞ্চিৎ অর্থও আমাদের হাতে আসিত। আমরা কর্মকর্তাগণকে ধন্যবাদ দিতে ত্রুটি করিতাম না। কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টরগণের প্রাপ্তির কোনোরূপ ঘাটতি যদি না পড়ে, তাহা হইলে মিল পরিচালকগণের আনন্দের কারণ হইতে পারে; কিন্তু অংশীদারগণ সেজন্য উচ্চ পুচ্ছ হইয়া নৃত্য করিতে রাজী নহেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি, যে টাকা অংশীদারগণের প্রাপ্য, তাহা তাহাদিগকে না দিয়া বেতনভোগী ডিরেক্টরেরা প্রায় ৫৮৪ টাকা ৬ পাই লইয়া গেলেন কেন! তাহারা রিক্ত হস্ত, লাভের বেলায় শঙ্করাকে কেন! কর্মকর্তাগণ আমাদিগকে শীঘ্রই যাহাতে লভ্যাংশ দিতে পারেন এজন্য যথাসাধ্য যত্ন ও চেষ্টা করিতেছেন এবং তাহারা আশা করেন শীঘ্রই এ বিষয়ে সফলকাম হইবেন। কিন্তু আমাদের আশঙ্কা তাঁহাদের আপাত-মনোহর বাক্যে মোটেই দূর হইতেছে না।

তাঁহারা আয় ও ব্যয়ের তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন, অডিটারগণ "হিসাব নির্ভুল" লিখিয়া দস্তখত করতঃ, ৫০০ টাকা ফি লইয়া গিয়াছেন, জিজ্ঞাসা করি, গুদামে মজুত কাপড়, সুতা ও তুলার পরিমাণ কি তাঁহারা জানেন? তাঁহারা কিভাবে ঐ মজুত জিনিসের মূল্য প্রায় ২,৫১,৯৩৫ টাকা ০ আনা ধার্য করিলেন, আমরা তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?

এই সম্বন্ধে আমাদের অন্যান্য বক্তব্য বারান্তরে আলোচনা করিব। আশা করি আমাদের মত ভুক্ত ভোগা ও আমাদের সহিত সহানুভূতিশীল অংশীদার মহোদয়গণ তাঁহাদের বক্তব্য জানাইবেন"।[৪৮]

—জনৈক অংশীদার

এভাবে দেখা যায় যে, ঢাকেশ্বরী কটন মিল নানারকম সমস্যার মধ্য দিয়ে তার উৎপাদন চালিয়ে যাচ্ছিল। শ্রমিক অসন্তোষ, অংশীদারদের অসন্তোষ, কমকর্তাদের দলাদলি, বিদ্বেষ, একাধিপত্যের আকাঙ্ক্ষার ফলে মিলটি ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। যা *ঢাকা প্রকাশে*ও উল্লেখ করা হয় এভাবে—"ঢাকেশ্বরী কটন মিল ঢাকার তথা বাঙ্গালার গৌরব। মিলের প্রতিষ্ঠা হইতে ইহার কার্যাদি সুপরিচালিতই হইতেছিল। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সহিত ইহা বলিতে

Dhaka University Institutional Repository

হইতেছে যে, আজ কয়েক বৎসর যাবৎ এই প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তৃপক্ষের সুশৃঙ্খল কার্যপ্রবাহে নানা গোলযোগ দেখা দিয়াছে। কর্মকর্তৃপক্ষের সুবিধা ও ইচ্ছামত বিভিন্ন সময়ে মিলের প্রাথমিক নিয়মাবলির (Articles of Association) নানারূপ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করার সুযোগের ফাঁকেই বোধ হয় ক্রমে বর্তমান দলাদলি, বিদ্বেষ ও একাধিপত্যের আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি ও প্রসার লাভ হইয়াছে। দিনের পর দিন যেভাবে মামলা ও বিদ্বেষ প্রচার চলিতেছে তাহাতে এই গোলযোগের পরিণতি যে কি হইবে বলা কঠিন। যাহা হউক, অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে অংশীদারগণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্প্রতি আমাদের গোচরে আসিয়াছে। অংশীদার সাধারণের অবগতি সুবিধার জন্য ক্রমে ঐগুলির আলোচনা করা যাইবে। বিভিন্ন মতবাদের পর্যালোচনা করিয়া যেটুকু সত্য বলিয়া অনুমিত হইতেছে তা রূপ-পরিগ্রহ করিলেও ভবিষ্যৎ ভয়াবহ বলিয়া মনে হয়"।[৪৯]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত সত্ত্বেও এ মিল তার উৎপাদন চালিয়ে যাচ্ছিল। বিদেশি কাপড় বর্জন, স্বদেশি কাপড় গ্রহণের প্রতিযোগী হিসেবে পূর্ববাংলায় স্বদেশি যুগে যে কটি কাপড়ের মিল প্রতিষ্ঠিত হয় তার মধ্যে ঢাকেশ্বরী কটন মিল প্রথম আধুনিক মিল। এবং তা আলোচ্য সময়ের শেষ পর্যন্ত উৎপাদন চালিয়ে যাচ্ছিল।

ঢাকা কটন মিল (The Dacca Cotton Mills) :

১৯৩৯ সালে ঢাকা কটন মিল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫০ সালের সরকারি একটি চিঠি থেকে জানা যায় যে, ১৯৫০ সালে ঢাকা কটন মিল ৫০০০ স্পিন্ডল ও ১২০ পাওয়ার লুম এবং ১২৩ হ্যান্ড লুম নিয়ে গঠিত ছিল।[৫০] আবার ১৯৪৯ সালের একটি চিঠি থেকে জানা যায় যে, ১৯৪৯ সালের এপ্রিল থেকে প্রায় ৬ মাস এ মিল বন্ধ ছিল। বন্ধ থাকার কারণ হলো মিলের কয়েকটি মেশিন-পুরাতন হওয়ায় অকেজো হয়ে পড়েছিল। চিঠিতে শ্রমিকরা উল্লেখ করে যে, ঢাকা কটন মিলে বছরে প্রায় ৩৬,০০,০০০ গজ কাপড় উৎপাদিত হতো। এই মিলের তাঁত ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি ঢাকার অন্য মিল থেকে শ্রেষ্ঠ ছিল। উল্লেখ্য যে, তারা জাপান থেকে এই নতুন মেশিন আনার জন্য আবেদন করে।[৫১] ***(পরিশিষ্ট-২ক ও ২খ-এ দেখুন)***

আবার ১৯৫৩ সালের আরেকটি নথি থেকে জানা যায় যে, মিলটি ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রোডের উপর গেণ্ডারিয়ায় অবস্থিত। ১৩ বিঘা জমির উপর অবস্থিত (including Land Building, Factory, Godown, Staff quarter etc.)। ২৫৩৯টি স্পিন্ডল, ৯২টি পাওয়ার লুম, এবং একটি ক্যালিনডারিং মেশিন (calendering machine) নিয়ে গঠিত। তবে ১৬টি লুম পুরাতন ও কাজের অনুপযুক্ত। প্রতিদিন এই মিলে বিভিন্ন ধরনের শাড়ি প্রায় ৬০০ জোড়া, উৎপাদিত হতো। যা ৩ বেলের সমান। স্পিনিং মেশিনে প্রতিদিন ১৫,০০০ Ibs. সুতা লাগত। অপরদিকে ১১,৫০০ Ibs পরিমাণ সুতা বা ৪০ কাউন্ট (সেলাই করার সুতা) উৎপাদিত হতো। ১৯৫২ সালের ৫২০ জন লোক এই মিলে কাজ করত। যার মধ্যে মুসলমানরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ।[৫২]

এই রিপোর্টে আরো বলা হয় ১৯৫০-১৯৫২ সালে মিলের অবস্থা ভালো ছিল। কেননা ১৯৫২ সালের ২ জানুয়ারি টেক্সটাইল ইন্সপেক্টর মি. ইদ্রিস পোস্তাগোলার 'ঢাকা কটন মিল' পরিদর্শন করে এ মিল সম্পর্কে যে বর্ণনা দেন তা নিম্নে বর্ণিত হলো—

Dhaka University Institutional Repository

"I found the mill on working condition Mr. F.S. Rathore, the General Manager of the Mill showed me round all the sections of the mill.

Blow room

All the blow room machinery are working except one finisher scutcher which is lying idle for want of some spare parts. It is reported by the manager that the spare parts are being procured and the machine will work very soon.

Carding shed

The mill has 13 cards in all of which 4 are found in working condition. The rest 9 are remaining idle for want of fillets. It is understood that for fillets of the idle cards they have already placed an order with Messrs. The English card clothing Co. Ltd.(Whose, sole Agent in Pakistan is M/s. Jumes Findley & Co., Chittagong) 15/ Trades Road zardeo P.O. Box No. 4006 Grand Road, Bombay-7. It is reported by the Manager that the supplying firm (M/s. James Finley) has informed that the fillets was to reach Chittagong by Dec/51. However, they are expecting the actual position of their order within a very short time. The Manager has been instructed to let us know their latest development regarding their orders with M/s. James Finlay otherwise attempt will be made to Procure these fillets from other firmes through Government effort.

Spinning Section

The Spinning Section works in 2 shifts a day and its prduction is 250 lb per shift per day the counts being 30^s & 40^s. All these yarns are used as weft only as reported by them. There are 4500 spindles in this mills of which 2385 are found in working condition. Of remaining idle 3717 spindles about 1332 are in workable condition but can not work until all the carding machine are running. Because cards are supposed to be feeding machinery to the spindles. The rest 780 spindles are too old and requires through overhanling if the authority desires production from them.

Weaving Section including sizing, warping, Dying, Calendering etc: There is no such complaint in the weaving section. This Section works in 3 shifts per day. There are in all 120 looms in this section of which 100 are found working on my date of inspection. The rest 20 idle looms, are under repair and will commence working as soon as the yarn production of mill improves. It is, however reported that these 20 looms will start work within a month or two with imported yarn if the fillets

Dhaka University Institutional Repository

are impossible to procure. The average production of one loom per shift is 3 pairs of sarees/dhuties.

From the previous reports submitted to Govt. by this Directorate as well as from my present one it will appear that the mill is gradually increasing the production. The authority is also taking more interest in running this mill in full swing. I also understand from the manager as well as from the owner of the mill (who happens to be present on the day of my inspection) that they have placed an order with some Japanese firm for certain new spindles as well as for some automatic looms.

Under these circumstances, it is suggested that the question of requisition of this Mill may for the present be dropped and if such action is necessary in future, the Government will be advised accordingly in due course."[৫৩]

সুতরাং দেখা যায় যে, ঢাকা কটন মিল লি: ১৯৫০-এর দশকে অন্যান্য মিল থেকে শ্রেষ্ঠ ছিল এবং দিন দিন উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। যা উপর্যুক্ত বর্ণনা থেকে বুঝা যায়।

উল্লেখ্য, ১৯৫৩ সালের রিপোর্ট থেকে ঢাকা কটন মিল লিমিটেড-এ যারা শেয়ার হোল্ডার ছিলেন, তাদের নামের তালিকা দেয়া হলো[৫৪]—

সারণি-১২

Sl.No	Name of share-holders	Numbers of shares
1.	Mrs. Shamunnessa Qureshi	20
2.	Ghuni Lal Podder, Joy sree Hosiery, Narayanganj	20
3.	Jashada Lal Podder, -Do-	20
4.	Shyam Lal Seha, Mera Hosiery, Narayanganj	200
5.	Nitya Gopal Podder, for Hani Madhab Nitya Gopal Podder	12
6.	Sree Shishu Bala Seha, C/o.Mohini Seha, Amoapara	60
7.	Nitya Gopal Dey, Nabiganj, Sylhet	6
8.	B. M. Dutta do do	40
9.	S. M. Seha, 24/1, Restemji Street, Calcutta	40
10.	Krishna Lal Dome, Postagalla Burning Ghat, Dacca	4
11.	Parbati Charan Paul, 21, Basants K. Das Road, Dacca	50

Dhaka University Institutional Repository

12.	Chinta Haran Sarkar, 28/1, Kagajitola, Dacca	4
13.	Tarak Nath Das, 56m. Rupchand Lane, Dacca, C/o. Ram Ballov Goverisuram, Narayanganj, Dacca	8
14.	Sree Mati Suniti ,Bala Das 5/1, Kali Charan Seha Road	10
15.	Nani Gopal Seha, 30, Lal Mohon Podder Lane, Dacca	40
16.	Sree Renu Bala Das, 62, Rupchand Lane, Dacca	10
17.	Sree Raj Mohan Paul, 12, Kagajitola, Dacca	40
18.	Sree Gopal Ch. Paul, Do	22
19.	Priyanath Das, 48, Dinanathsen Road, Dacca	10
20.	A. L. Gregory, Gachirhet Nickly, Mymenshing	500
21.	Dwarka Nath Dutta & Aparna Charan Dutta, Feni, Noakhali	20
22.	Mahim Co. Banik, Feni, Noakhali	20
23.	Sree Lal Mohon Seha, Fulgaji, Noakhali	400
24.	Sree Bapin Chandra Nath, Feni Bazar, Noakhali	4
25.	Monorenjan Banik, Feni, Noakhali	20
26.	Sree Jagabandhu Seha & Seshi Bhussan Seha for Lal Mohon Seha, Fulgaji, Feni, Noakhali	800
27.	Kali Peda Bose, C/o. Chittagong & Co. Ltd. Chandpur, Tippera	200
28.	A. B. Seha, Feni, Noakhali	20
29.	Amar Chand Dutta, Brahamberia, Tippera	20
30.	S.K. Das, Feringi Bazar, Dacca	200

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য ১৯৫৩ সালের এই রিপোর্ট থেকে ঢাকা কটন মিলের Managing Agents সম্পর্কেও জানা যায়—

"The Managing Agents orginally were Messrs. Jagadish Ch. Ambica Ch. Mitra; and sons, Ramesh Ch. Jogesh Ch. dsa and sons, and T. C. Dey and sons, and they have transferred their right title and interest in the Managing Agents firm and none of the orginal partners of the said Managing Agents firm is now continuing as partner therein.

The present Managing Agents firm who style themselves as Messrs. Gajraj gangwal, Madan Lal Sarogi, Ghamandi Lal, Kishori Chand, Sova Chand, Nihal Chand gangwal is Composed of outsiders."[৫৫]

মসলিন কটন মিল (Muslin Cotton Mill) : ১৯৫০-এর দশকে বস্ত্রশিল্পের উপর সরকারি নীতি শিথিল হওয়ায় এ শিল্পটি বেসরকারি উদ্যোগে চলে যায়। সুতার স্বল্পতার কারণে তাঁত শিল্পে চরম প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হলে সরকার পূর্ব পাকিস্তানে তাঁতিদের সুতা সরবরাহের উদ্দেশ্যে একটি টেক্সটাইল মিল স্থাপনের উদ্যোগ নেয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৫৪ সালে ঢাকার কালিগঞ্জে "মসলিন কটন মিল" নামে একটি মিল স্থাপিত হয়। সরকার ১৯৬৩ সালে এই মিলে কাপড় উৎপাদনের জন্য ৫০০ লুম অনুমোদন করে। পরে এই মিল EPIDC (East Pakistan Industrial Development Corporation)-এর কাছে হস্তান্তর করে। ১৯৫৪ সালে সরকার ২০.০০ মিলিয়ন রুপি ব্যয়ে ৪৪,০০০ স্পিন্ডল নিয়ে মিলটি তৈরি করে। ১৯৫৯ সালে ২০.০০ মিলিয়ন রুপি পরিশোধ করার পর পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত করা হয়। EPIDC ৫১% অর্থাৎ ১০.২০ মিলিয়ন রুপি চাঁদা দেয় এবং অবশিষ্ট ৪৯% তথা ৯.৮০ মিলিয়ন পূর্ব পাকিস্তানের সরকার দেয়। ১৯৬৪-৬৫ সালে এই মিলের উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৭২.১৭ লক্ষ lbs এবং ১৯৬৩-৬৪ সালে-এর ক্ষমতা ছিল ৬৮.১৮ লক্ষ lbs.।[৫৬]

মসলিন কটন মিল সম্পর্কে *ঢাকা প্রকাশে* উল্লেখ করা হয় যে, "চলতি বৎসরের শেষভাগে সরকারি মসলিন কটন মিল প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হইবে। এই দিনটি পূর্ব পাকিস্তান তথা সমগ্র পাকিস্তানের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

মসলিন কটন মিলের নক্সা প্রণয়নের কাজ সমাপ্ত হইয়াছে এবং চলতি মাসের মাঝামাঝি উহার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। এই মিলে ২৫ হাজার তাঁত ও ৫০ হাজার টাকু থাকিবে।

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ববঙ্গ সরকার এই উদ্দেশ্যে ৩ কোটি টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। এই মিল স্থাপনের জন্য ইতিমধ্যেই এখান হইতে ১৪ মাইল উত্তর পশ্চিমে কালিগঞ্জে ৭৫ একর জমি দখল করা হইয়াছে।

পূর্ব পাকিস্তান সরকার এ সম্পর্কে দুইজন জাপানি বিশেষজ্ঞকে আনার ব্যবস্থা করিয়াছেন। মসলিন বস্ত্র শিল্প এককালে প্রাচ্যের গৌরব ছিল। কিন্তু বৃটিশ আমলে তাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। পূর্ববঙ্গ সরকার এই প্রাচীন কুটিরশিল্পের লুপ্তগৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য যে আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে তাহা সকল মহল হইতেও অভিনন্দিত হইবে বলিয়া মনে হয়।"[৫৬(ক)]

সরকারি একটি রিপোর্টে দেখা যায় যে, এই মিলের আধুনিকায়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয় এবং বলা হয়[৫৭]—

"Balancing and Modernisation of the Mill has been completed in 1964-65 at a cost of Rs. 2.92 Million. This Programme has been financed out of the Company's own resources and provided for the following addition :-

1. 4000 additional spindles
2. Pressure Dying Plant
3. Mercerising Plant
4. Air Conditioning Plant
5. 4 doubling frames for Producing folded yarn, besides Preparatory machines, winding and reeling frames, water softening plant".

সুতরাং দেখা যায় যে, ১৯৫০-এর দশকে এই মিলটি স্থাপনের পর থেকে এটিকে বিভিন্নভাবে আধুনিকায়নের ব্যবস্থা করা হয় এবং উৎপাদনক্ষমতাও ছিল সন্তোষজনক। মাঝারি ও ভালো মানের কাপড় এই মিলে উৎপাদিত হতো।

পূর্ব পাকিস্তানে এসব মিল গড়ে উঠলেও পাকিস্তান আমলে ব্যাপক পরিমাণে কাপড় আমদানি করা হতো। ঢাকার একজন বিখ্যাত শিল্পপতি আনোয়ার হোসেন ১৯৬০-এর দশকে ঢাকার কাপড় ব্যবসা সম্পর্কে বলেন— "ঢাকার বড় বড় কাপড় ব্যবসায়ীরা শার্টিং-স্যুটিং এমনকি শাড়ি লুঙ্গিও আমদানি করতে শুরু করে। বিশেষ করে জাপানি কাপড়ের ডাইং ফিনিশিং উন্নতমানের হওয়ায় ক্রেতারা দেশীয় কাপড় বাদ দিয়ে আমদানি করা কাপড়ের দিকে ঝুঁকে পড়তে থাকে। ক্রেতাদের এই আগ্রহ আমদানিকারকদের আগ্রহ বাড়িয়ে দেয়। এই সময় সুদূর ইংল্যান্ড থেকেও দামি কাপড় আমদানি করা হতো। আর এই অবাধ আমদানির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হতো ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা। ফলে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে শুরু করে ঢাকার ব্যবসা-বাণিজ্যে"। তিনি আরো বলেন, "এই সময় কলকাতাবাসীরা নিজেদের দেশীয় কাপড় ব্যবহার করত; প্রয়োজন ছাড়া আমদানি করত না। শিল্পপতি আনোয়ার হোসেন মনে করেন— কোনো দেশের ব্যবসাকে টিকিয়ে রাখতে হলে নিয়ম হচ্ছে দেশে যে জিনিসের অভাব আছে, সে অভাব মেটানোর বিকল্প কোনো ব্যবস্থা নেই—শুধু সেসব জিনিসই আমদানি করা উচিত। কখনই বিলাসদ্রব্য আমদানি করা উচিত নয়।"[৫৮]

Dhaka University Institutional Repository

দেশের এই রুগ্‌ন পোশাক শিল্পকে চাঙ্গা করার জন্য তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫৬ সালে নিজের বাড়িতেই 'ফেমাস প্রিন্টিং মিলস' নামে ছোট একটা কাপড়ের ছাপাখানা চালু করেন। এই ছাপাখানায় দেশীয় কাপড় কিনে নিজস্ব ডিজাইনে ডাইং প্রিন্টিং ও ফিনিশিং করে উন্নত শাড়ি তৈরি করা হতো। এই শাড়ির নাম ছিল "ফেমাস প্রিন্ট শাড়ি"। এই শাড়ির ব্যাপক চাহিদা ও জনপ্রিয়তা ছিল।

১৯৬৮ সালে "আনোয়ার সিল্ক মিল" নামে আরেকটি মিল চালু করেন। এই মিলে যে শাড়ি উৎপাদিত হতো তার নাম ছিল মালা শাড়ি (ফেমাস শাড়ির নাম পরিবর্তন করে)। এই শাড়ির পূর্ব পাকিস্তান তথা ঢাকায় ব্যাপক চাহিদা ছিল। ফলে দেশে তখন এমন কোনো দোকান ছিল না, যেখানে মালা শাড়ি বিক্রি হতো না। ভ্রাম্যমান ব্যবসায়ীরাও মালা শাড়ি বিক্রি করত।"[২৯]

শিল্পপতি আনোয়ার হোসেন এ শাড়ির জনপ্রিয়তা সম্পর্কে বলেন, ক্রেতার চাহিদার মান ও মূল্যের সমন্বয় সাধন। এই সময় বিদেশি শাড়ি বিশেষত ভারত ও পাকিস্তান থেকে আমদানি করা বেনারসি শাড়ির দাম বেশি ছিল বলে তা এই দেশের মধ্যবিত্তের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে ছিল। কিন্তু মালা শাড়ি ছিল সবার ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে।

এসব মিল ছাড়াও আরো কয়েকটি মিলের নাম উল্লেখ করেন। এগুলো হলো অল্লিয়া টেক্সটাইল মিলস (অবাঙালি), কামাল টেক্সটাইল মিলস (বাঙালি), শাহজাহান উইভিং মিল (বাঙালি) এবং কাশেম টেক্সটাইল মিল (বাঙালি) ইত্যাদি। উল্লেখ্য আনোয়ার সিল্ক মিল ছিল বাঙালি মালিকানাধীন প্রথম পূর্ণাঙ্গ সিল্ক মিল।

নিউমার্কেটের একজন কাপড় ব্যবসায়ী আতাহার আহমেদ তাহের বলেন, ১৯৫৫ সাল থেকে তিনি কাপড় ব্যবসা করছেন। প্রথমে তিনি নিউমার্কেটের অন্যের দোকানে কর্মচারী হিসেবে ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি নিজেই দোকানের মালিক হন। হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালের মালিক আহমেদ শাহ-এর কাছ থেকে ৪২৫ টাকায় আর. সি. কোং দোকান ক্রয় করেন। দোকানটিতে মূলত ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য বিক্রি হতো। আর. সি. কোং আরেকটি দোকান ছিল হক সাহেবের। তিনি হক সাহেবের কাছ থেকে এই দোকানটিও কিনে নেন। ফলে দুটি দোকানের সমন্বয়ে তার দোকানের নাম দেন তাহের এ্যান্ড কোং, দোকান নং ৩৭১ ও ৩৭২। নিউমার্কেটের প্রতিটি দোকানের আয়তন ২১০ ফুট। তিনি উল্লেখ করেন যে, তার দোকানে মূলত স্যুট, প্যান্ট ও টেইলারিং কাপড় বিক্রি হতো। তিনি এই কাপড় সংগ্রহ করতেন ইসলামপুরের পাইকারি দোকান থেকে। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, পাকিস্তান আমলে দেশীয় কাপড়ের চেয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের কাপড় বেশি বিক্রি হতো। এই সময় নিউমার্কেটে কোনো উল্লেখযোগ্য দোকান ছিল না। বেশিরভাগ দোকান ছিল টেইলারিংয়ের দোকান। অন্যান্য যেসব দোকান ছিল তারমধ্যে হোটেল, মিষ্টির দোকান, ইলেকট্রিক্যাল, স্টুডিও এবং ২টি স্বর্ণের দোকান। কাঁচা বাজার, মুদির দোকান থাকলেও তা নিউমার্কেটের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

তিনি বলেন, পাকিস্তান আমলে নিউমার্কেট ছিল ঐতিহ্যবাহী আধুনিক বাজার এবং সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রথম বাজার। পূর্ব পাকিস্তানের সকল অঞ্চল থেকে এমনকি বাইরে থেকেও মানুষ এই বাজারে কেনাকাটা করার চেয়ে বাজারটি ঘুরে বেড়াতে বেশি আসত।

Dhaka University Institutional Repository

কারণ মার্কেটটি অনেক আকর্ষণীয় ছিল। এরকম গেটসমৃদ্ধ বাজার সমগ্র পূর্বপাকিস্তান তথা ঢাকা শহরের অন্য কোথাও ছিল না।[৬০]

তেলের কারখানা : বিশ শতকের প্রথম দিকে ঢাকায় যদুনাথ বসাক এ্যান্ড ব্রাদার্স নামক একটি মাত্র তেলের কারখানা ছিল। এতে মাসিক সর্বমোট ২০০০ রুপি লাভ হতো। ব্যবহৃত সরষে কেনা হতো প্রতিমণ ৬ রুপি ৬ আনা এবং প্রতিমণ তেল বিক্রি হতো ১৮ রুপিতে এবং প্রতিমণ oil cake বিক্রি হতো ১-৮ রুপিতে।

পরবর্তী পর্যায়ে দুলিচাঁদ ওমরাওলাল ইমামগঞ্জে একটি তেলের মিল প্রতিষ্ঠা করে এবং পোস্তাগোলায় স্থাপিত হয় সায়কা ওয়েল মিল (Swaika Oil Mill)। মাড়োয়ারি স্থাপিত এই দুটি মিল পাকিস্তান অভ্যুদয়ের পরেও টিকে ছিল। এছাড়া আরো কিছু মিল ছিল। কিন্তু এগুলোর বেশিরভাগ দেশবিভাগের পর বন্ধ হয়ে যায়। কারণ এই মিলগুলোর মালিক ছিল হিন্দুরা। দেশভাগের পর তারা ভারত চলে যায়। পরবর্তীতে ভারত থেকে আগত অবাঙালি মুসলমানরা সেইস্থান পূরণ করে।

১৯৬০ সালের রিপোর্টে ঢাকা ও তার আশেপাশে এমনি ১৭টি মিলের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে রিপোর্টে ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়। এগুলো হলো[৬১]—

সারণি-১৩

Sl. No.	Name of Mills	Location
1.	Duli Chand Omrao Lal Oil Mills	Imamganj, Dacca
2.	Macca Oil Dal and Flour Mills	7, Sitalakhya, Narayanganj, Dacca
3.	Madan Mohan Oil Mills	Chakdala, P.O. Faridabad, Dacca
4.	Madina Oil Mill	Nitaiganj, Narayanganj, Dacca
5.	National Oil Mill	157, Distillery Road, Dacca
6.	Noor Oil Mills	Bhagabanganj, Narayanganj, Dacca
7.	Habib Oil Mills	Postagola, Faridabad, Dacca
8.	Ramna Oil Mills	Mirkadim, Dacca
9.	Khawja Oil Mills	65/2 Shuklal Das Lane, Dacca
10.	Crescent Saw and Oil Mills	5/A Champatali Lane, Dacca
11.	Shamim Oil Mill	Aliganj, Fatullah, Dacca
12.	The Dacca Oil Mills Ltd.	Aliganj, Fatullah, Dacca
13.	The Mohammadia Oil Mills	3, Kacharighali Road, Narayanganj, Dacca

Dhaka University Institutional Repository

14.	Narayanganj Oil Mills	A. K. Mitra Road, Narayanganj, Dacca
15.	Rahmat Oil Mills	237, Tejgaon Industrial Area, Dacca
16.	Pakistan Oil Mills	30, Debidasghat Road, Dacca
17.	The Star Oil Mills	Station Road, Dacca.

আবার ১৯৫৮ সালের একটি রিপোর্টে রেজিস্ট্রিকৃত পূর্ব পাকিস্তানের ফ্যাক্টরি এ্যাক্টের অধীনে বার্ষিক উৎপাদন এবং তেল উৎপাদনে ব্যবহৃত শক্তি ও কর্মচারী বা শ্রমিকদের সংখ্যার একটি পরিসংখ্যান পাওয়া যায়। যা নিম্নে দেয়া হলো[৬২] —

(List of factories registered under the factories Act in East Pakistan and classified industrywise with particulars relating to power used, Annual productive capacity, and average number of workers)

সারণি-১৪

Sl. No.	Names and Addresses of Factories	Power used	Annual production capacity	Average no. of workers employed daily during the year 1956
1.	Macca Oil Dal and Flour Mills, Narayanganj Dacca	Elctricity, Oil and Steam	250 tons of Mustard and coconut oils	20
2.	Helal Oil and Rice Mills, Amjad Ali Road, Dacca	Electricity	700 maunds	9
3.	Madina Oil Mill, Netaiganj, Narayanganj, Dacca	Do	10,800 maunds	-
4.	Mahammadi Oil Mills, 3, Kacherigully, Narayanganj			-
5.	Dulichand Oil Mills, Das Lane, Dacca	Do		-
6.	Pakistan Oil Mills, Das Lane, Dacca	Oil Engine	25,000 ,,..	22
7.	Habib Oil Mills, Postagola, Dacca	Diesel	45,000 ,,..	28
8.	Dacca Oil Mills Ltd. Alamganj, Dacca	Electricity	6000 tons	35

Dhaka University Institutional Repository

9.	Nur Oil Mills, Narayanganj, Dacca	Oil	20,400	20
10.	National oil mills, Ltd., 157 Distillery Road, Gandaria, Dacca	Do	-	-
11.	Ramna Oil Mills, Ramna, Dacca	Diesel	12,480 maunds	24
12.	M.M. Oil Mills, Faridabad, Dacca	Steam Oil and Electricity	3,600 maunds	50
13.	Dacca Oil Mills, Imamganj, Dacca	Do	11,000	20

ঢাকা গেজেটিয়ারে উল্লেখ করা হয়, ১৯৭০-এর দশকের পূর্বে ঢাকা ও তার আশেপাশে ১৫টি মিল ছিল। যা এই প্রদেশের তথা পূর্ব পাকিস্তানের তেলের বা ঢাকার তেলের ব্যবসা সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত।

নিম্নে ১৫টি মিলের তালিকা দেয়া হলো[৩৩] —

সারণি-১৫

Sl. No.	Name of Mills	Location
1.	Crescent Oil Mills	Imamganj
2.	Dacca Oil Mills	Imamganj
3.	Dulichand Oil Mills	Imamganj
4.	Khwaja Oil Mills	Dacca
5.	Habib Oil Mills	Faridabad
6.	M. M. Oil Mills	Faridabad
7.	Madina Oil Mills	Narayanganj
8.	Muhammadi Oil Mills	Narayanganj
9.	National Oil Mills	Dacca
10.	Premier Oil Mills	Imamganj
11.	Rahmat Oil Mills	Tejgaon
12.	Ramna Oil Mills	Mirkadim
13.	S. Wakil Oil Mills	Imamganj
14.	Salim Industries Corporation	Hazaribag
15.	Swaika Oil Mill	Postagola.

Dhaka University Institutional Repository

উল্লিখিত তালিকায় দেখা যায় যে, পাকিস্তান আমলে ঢাকায় বেশকিছু তেলের কারখানা গড়ে ওঠে। ১৯২২ ও ১৯২৩ সালে ঢাকায় একটি কারখানা থাকলেও পরবর্তীকালে তথা পাকিস্তান আমলে বেশ কিছু কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। যা এই অঞ্চলের তেলের চাহিদা মেটাতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখত। নিজস্ব মিলে তেল উৎপাদন করা হলেও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ভোজ্য তেল আমদানি করা হতো। ১৯৬০-এর দশকের একটি রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে, ১৯৬০ সালে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ৩,১৪২ হাজার রুপির ভোজ্য তেল আমদানি করা হয়।[৬৪] অপরদিকে নারকেল তেল ও ক্যানথাড্রিন হেয়ার ওয়েল (Canthradrin Hair Oil) কলকাতার বাধগাটি থেকে আমদানি করা হতো। প্রতি ফাইল নারকেল তেলের খুচরা দাম ঢাকা শহরে ছিল ২ রুপি ৮ আনা এবং প্রতি ডজনের পাইকারি মূল্য ছিল ২৮ রুপি। অপরদিকে প্রতি ফাইল ক্যানথাড্রিন তেলের খুচরা মূল্য ছিল ২ রুপি ৬ আনা এবং প্রতি ডজনের পাইকারি মূল্য ছিল ২৫ রুপি ৮ আনা।[৬৫]

কাচ শিল্প : ঢাকার কাচ শিল্পের সূচনা খুব বেশি দিনের নয়। বিশ শতকের সূচনায় ঢাকায় শুধু কাচের চুড়ি তৈরি হতো। কাচের অন্যান্য সামগ্রী বিদেশ থেকে আমদানি করা হতো। জাতীয় পর্যায়ে হরদেও কাচের কারখানা হচ্ছে প্রথম প্রতিষ্ঠান। যেখানে অন্যান্য কাচের সামগ্রী/দ্রব্য তৈরি হতো। এটি ছিল পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র কাচের কারখানা, যা বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের প্রথম দিকে প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যান্য শিল্পের মত কাচ শিল্পও দেশবিভাগের পর নতুনরূপে গড়ে ওঠে।

১৯৪৮ সালের সরকারি নথিতে দেখা যায় যে, পূর্ববাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানে ৫টি কাচের কারখানা ছিল। এরমধ্যে ৪টি ঢাকায় এবং একটি চট্টগ্রামে। নিম্নে ৪টি গ্লাস ফ্যাক্টরির বা কাচের কারখানার উৎপাদনের পরিসংখ্যান দেয়া হলো[৬৬]—

Sl. No	Name and Address	Name of Proprietor	Year of Establishment	Labour Employed	Annual Production Capacity	Actual Production per year
1.	Hardeo Glass Works, Tikatulli, Dacca	1. Babu C.N. Todi, 2. Babu R.D. Todi 3. Babu B.L. Todi	1928	454	4320 ton	2880 tons
2.	Dacca Glass Works Gandaria, Dacca	Mr. G.S. Rajwany	1948	300-400	5000 tons	2000 tons
3.	The Bose's Glass Works, Narayanganj	The Adarsha Cotton Spinning & Weaving Mills, Ltd., Mg. Agent -Eskebasu & sons Ltd.	1938 (Regd. on June 10, 1938)	300	936 tons	240 tons
4.	The Jamal Glass & Silicate Works, Kalirbazar, Narayanganj	1. Abdul Gafur Mia 2. Abdul Rashid Mia 3. Abdul Sabhan Mia	1947	460	36,000 Gross	14,400 Gross [1Gross= 12 Dozen 12×12= 144]

Dhaka University Institutional Repository

এই একই নথিতে আবার মূলধনের পরিমাণ উল্লেখ করা হয়[৬৭]—

সারণি-১৭

Sl. No.	Name & Address of the Factory	Capital outlay	Manpower employed
1.	Hardeo Glass Works, Dacca	Rs. 2,00,000/-	500
2.	Boses Glass Works, Narayanganj	Rs, 2,75,000/-	300
3.	Jamal Glass Works, Narayanganj	Rs, 2,75,000/-	460
4.	Dacca Glass Woks, Faridabad, Dacca	Rs, 5,00,000/-	400

১৯৫০ সালের আরেকটি নথিতে উল্লেখ করা হয় যে, পূর্ববাংলায় যে ৫টি কাচের কারখানা ছিল তাতে প্রধানত ৬০০০ টনের কাছাকাছি Tumbler (পানপাত্র) এবং অন্যান্য সামগ্রী উৎপাদিত হতো। এই সময় কাচের টিউব এবং পাত্র (Neutral Sheet) অথবা পাইরেক্স গ্লাস (Pyrex Glass) তৈরির জন্য কোনো যন্ত্রপাতি ছিল না। অপরদিকে ল্যাবরেটরির যন্ত্রপাতি (Apparatus) স্থায়ীভাবে সংযোজিত বস্তুসমূহ (Fittings) কাচের আধার বিশেষ (Amplus) তথা বাণিজ্যিকভাবে কাচের সামগ্রী তৈরির জন্য এই সময় আর কোনো প্রতিষ্ঠান ছিল না।[৬৮]

আবার ১৯৫৮ সালের আরেকটি রিপোর্টে পূর্ব পাকিস্তান ফ্যাক্টরি আইনের অধীনে ঢাকার কাচের কারখানা সম্পর্কে যে তালিকা পাওয়া যায় তাতে কারখানায় ব্যবহৃত শক্তি, বার্ষিক উৎপাদন, ১৯৫৬ সালে প্রতিদিন কারখানায় কর্মরত শ্রমিকের গড় সংখ্যা সম্পর্কে জানা যায়। নিম্নে তা দেয়া হলো[৬৯]—

সারণি-১৮

Sl. No.	Name & Address	Power used	Annual production capacity	Avarage No. of workers employed daily during the year 1956
1.	Jamal Glass Silicate works, P.O. Bander. Dacca	Steam	720 tons silicate of soda	8
2.	Boses Glass Works, 36,Hatkhala Road, Dacca	Steam	30,000 Gross	62
3.	Imperial Glass Industries, P.O. Subhadya, Dacca	Fuel Oil	180 tons	49
4.	Hardeo Glass Works, 43/1, Hatkhola Road, Dacca	Electricity	7,200 tons	879
5.	Dacca Glass Works, Faridabad, Dacca	Do	2,000 tons	115

Dhaka University Institutional Repository

এসব কারখানায় অনেক লোক কাজ করে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে এবং ঢাকার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

অপরদিকে *ঢাকা গেজেটিয়ারে* ১৯৭০ দশকের পূর্বে তথা ১৯৬০-এর দশকের শেষ পর্যন্ত ঢাকায় যেসব কাচের কারখানা ছিল তাদের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা উল্লেখ করা হয়।[৭০]

সারণি-১৯

Sl. No.	Name of Factory	Annual Production
1.	Hardeo Glass Works	1200 tons a year
2.	Boses Works	450 tons a year
3.	Imperial Works	300 tons a year
4.	Latif Works	300 tons a Year
5.	Sattar Works	300 tons a year
6.	Bhandari Works	300 tons a year
7.	Dacca Works	300 tons a year
8.	Eastern Works	300 tons a year
9.	Neutral Works	300 tons a year
10.	Majid Glass Bangles Works	-
11.	Muslim Glass Bangles Works	-

উপরের তালিকায় দেখা যায় যে, ১৯৪০-৫০-এর দশকের তুলনায় ১৯৬০ দশকে কাচের কারখানার সংখ্যা বাড়লেও উৎপাদন সে অনুপাতে বাড়ে নি। যেমন— ১৯৪০-এর দশকে তথা ১৯৪৮ সালে হরদেও গ্লাস ওয়ার্কসের যেখানে বার্ষিক উৎপাদন ছিল ৪,৩২০ টন, সেখানে আবার ১৯৫০-এর দশকে বার্ষিক উৎপাদন ছিল ৭,২০০ টন। কিন্তু ১৯৬০-এর দশকে ১৯৬৯ সালে এর বার্ষিক উৎপাদন ছিল ১২০০ টন।

লোহার কারখানা : বাংলার কামাররা যারা শহর এবং গ্রামের মানুষদের জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী তৈরি করত, তারা ঔপনিবেশিক শাসন আমলে লোহা ও ইস্পাত আমদানি এবং রেলওয়ের সূচনা ও সম্প্রসারণের ফলে তাদের পেশা হারাতে শুরু করে। কারণ ইউরোপীয় লোহা দেশীয় লোহার চেয়ে শক্ত ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের বেশি উপযোগী। এসব সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও কিছু কামার ও শিল্পোদ্যোক্তা দেশীয় পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট কিছু দ্রব্য নির্মাণের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। এগুলো হলো কৃষিজাত ব্যবহৃত হাতিয়ার, ছুরি, কাচি, বাদাম ভাঙার কল, ইস্পাতের ট্রাঙ্ক, লোহার আলমারি, ডাস্টবিন, খঞ্জর (ছোরা), আখের রস নিংড়ানোর যন্ত্র, টিউবস (নল বা চোঙ্গা) এবং বিভিন্ন ধরনের ইঞ্জিনিয়ারিং মেশিন।

এই সময়কার প্রধান প্রধান কোম্পানিগুলোর শাখা হলো "Sikdar & Co.", "Subal Factory", "India Cutlery Mfg. Co.", "Bhowani Eng. Works", "Maya

Dhaka University Institutional Repository

Eng. Works" এবং কলকাতার "Betjan & Co.", কুমিল্লার "House of Labourers and Pioneer Iron Works", চব্বিশ পরগনার "The Great Eastern Galvanising Works", "Ghatak Iron Works", "KL. Mukherjee, Hind Machinerier Ltd." এবং হাওড়ার "The India Machinery Co.".

এসব কারখানায় বিভিন্ন ধরনের দ্রব্য তৈরি হতো। যেমন— Peeling, dipping, Splint-levelling, Match making machines, drilling-milling, grinding lathe presses, shearing, printing, পাট ও বস্ত্র মিলের জন্য তৈরি হতো weighing machines ইত্যাদি।

জমিদার বাবু রাজেন্দ্রলাল শর্মার ১৯০৬ সালে ২৫,০০০ রুপির মূলধন নিয়ে "শর্মা আয়রন ওয়ার্কস" শুরু করার মধ্য দিয়ে ঢাকায় লোহা ও ইস্পাত বা স্টিল কারখানার যাত্রা শুরু হয়। এই শর্মা আয়রন ওয়ার্কস পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল কানাইলাল কর্মকার। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি পূর্ববঙ্গ রেলওয়ের একটি কারখানা ছিল। সেখানে ইঞ্জিন, কোচ এবং ওয়াগনের ছোটখাট মেরামত করা হতো। দেশবিভাগের সময় (১৯৪৭) ঢাকায় আর কোনো লোহা বা স্টিলের কারখানা ছিল না। পরবর্তীতে পাকিস্তান সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় অনেক লোহা কারখানা গড়ে ওঠে এবং সমৃদ্ধি লাভ করে। ১৯৫০-এর দশকে ঢাকায় নিম্নবর্ণিত লোহার কারখানা ছিল। এখানে ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপে ব্যবহৃত শক্তি, বার্ষিক উৎপাদন, নিয়োজিত কর্মচারীর সংখ্যা উল্লেখ করা হলো[৭১]—

সারণি-২০

Sl. No.	Names and Addresses of Factories	Power used	Annual production capacity	Average No. of workers employed daily during the year 1956
1.	Rashid Motor Works Ltd. , Motijheel, Dacca	Electricity	Motor Engineering	55
2.	Momin Motor Works, Haranath Ghosh Road, Dacca	..	Ditto	50
3.	Messrs Narayanganj Iron Works, Narayanganj,Dacca	Electricity	Casting works Rs.7,50,000 worth	68
4.	Dienfa Motor Ltd. , Dacca	Do	Motor Engineering	61
5.	East Pakistan Government Aircraft workshop,Tejgaon, Dacca	Do	Repair of Aircrafts	62
6.	604, Combined Workshop, P.E.M.E., Dacca Cantonment, Dacca	Do	Repair work	406
7.	Eureka Engineering Co. ,	Do	Worth Rs.	14

Dhaka University Institutional Repository

	Patuatully, Dacca		100,000	
8.	Sonachara Workshop (I.G.N. Railway Company Ltd., and R.S.N Company Ltd.), P.O.D.C. Mills	Do	Marine Engineering and Ship repairs	614
9.	Pak Engineering Works, Pilkhana, Dacca	Oil	Worth Rs. 500,000	65
10.	Modon Mohon Iron Works, Western Road, Narayan-ganj, Dacca	Do	Repairing Works Rs. 200,000 worth	36
11.	Messrs I.G.N & Rly. Co. , Narayanganj, Dacca	Electricity	Repair works	600
12.	Modern Engineering Works, Narayanganj, Dacca	Do	Machinery parts (48 tons yearly)	7
13.	Ordnance Depot. , Dacca Cantonment, Dacca	Manual	Machinery parts	458
14.	Dockyard and Engineering Works, P.I.D.C. Narayanganj, Dacca	Steam, Electricity and Motor	Shipbuilding and ship repairing	470
15.	Government Central Workshop, Tejgaon, Dacca	Electricity	Motor repairing	115
16.	Dacca E.B. Railway Workshop, Ramna, Dacca	steam and electricity	Maintenance of locomotives, wagons, etc.	291
17.	Allen Berry and Company Ltd., Tejgaon, Dacca	Elaectricity	3 to 4 lakhs of drums	40
18.	James Finaly & Co. Ltd. , Nawab Road, Narayanganj, Dacca	Do	Motor Repairing	29

আবার ১৯৭০-এর দশকের পূর্বে ঢাকায় নিম্নবর্ণিত লোহা ও ইস্পাতের কারখানা ছিল। যা ঢাকা গেজেটিয়ারে উল্লেখ করা হয়[৭২]—

Iron and Steel Materials :

1. Bengal steel Mills, Tejgaon
2. Dacca Re-Rolling Mills, Tejgaon

Dhaka University Institutional Repository

3. Prince Iron and Steel Industries, Mirpur.
4. Rahim Steel Rolling Mills, Faridabad.
5. Rahim Metal Industries, Tejgaon
6. Tejgaon Re-Rolling Mills, Tejgaon

Machine Drilling :

1. Tejgaon Engineering, Tejgaon

Machine for Soap Making :

1. National Engineering Works, Patuatoli

Spare Parts :

1. Al-Hafez Industries
2. Diamond Engineering Works
3. Dewan Engineering Works.

Rolling Shutter and Collapsible Gates :

1. Batali Iron and Steel Industries, Dacca
2. Eastern Metal Products, Tejgaon
3. Evergreen Industries, Dacca
4. General Iron Safe Products, Dacca
5. L. Metal Industries, Dacca
6. Starlit Metal Industries, Dacca
7. Steelman Industries, Dacca.

Automobile Accessories :

1. Dacca Engineering Works, Bangshal
2. Pak. Engineering Works, Dacca

Bandsaw Machines :

1. National Foundary and Engineering Works, Faridabad.

Foundary Products :

1. Decent Industries, Tejgaon
2. Dewan Engineering Works, Narayanganj.
3. Diamond Engineering Works, Faridabad.
4. Fabrication Foundary and Engineering, Tejgaon.
5. Madan Mohon Iron Works, Narayanganj.
6. Narayanganj Iron Works, Narayanganj.

Dhaka University Institutional Repository

Lathe Machines :

1. National Foundary Engineering Works, Narayanganj
2. Tejgaon Engineering Company, Tejgaon.

Tube-wells and Water Pump :

1. Fabrication Foundary and Engineering Works, Tejgaon.
2. Narayanganj Iron Works, Narayanganj.
3. Modern Engineering Works, Narayanganj.
4. Quality Iron and Steel Co. Tejgaon.

Launch-making, repairs and Docking :

1. Mahboob Industries Amlapara, Narayanganj.
2. Narayanganj Dock Ltd. Amlapara, Narayanganj.
3. Narayanganj Dock and Engineering Works (E.P.I.D.C), Narayanganj.

Agricultural Impliments :

1. Bengal Iron and Steel Works, Tejgaon.
2. Government Agricultural Workshop, Tejgaon.
3. Narayanganj Iron Works, Narayanganj.

Cast Iron Pipes :

1. Dhaleswari Iron Works, Narayanganj.
2. Fabrication Foundary and Engineering Works, Tejgaon.
3. Minco Casting Industries, Tejgaon.
4. Minco Engg. Works and Factory, Bangshal
5. Md. Ilyas & Co. Tejgaon.
6. National Foundary and Engineering Works, Faridabad.
7. Pakistan Light Casting, Tejgaon.

দিয়াশলাই কারখানা : বিশ শতকের প্রথম ২৫ বছরে অবিভক্ত ভারতে জাপান ও হল্যান্ড থেকে প্রয়োজনীয় সমস্ত নিরাপদ দিয়াশলাই আমদানি করা হতো। স্বদেশি আন্দোলনের (১৯০৬-১১) সময়ে কলকাতার কিছু কিছু যুবক হাতে চালিত কল/মেশিনের সাহায্যে দিয়াশলাই তৈরি করার চেষ্টা করে। কিন্তু *ঢাকা গেজেটিয়ারে* এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয় যে, ঢাকায় এরকম প্রচেষ্টা চালান নি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে ঢাকায় দিয়াশলাই কারখানা স্থাপন শুরু হয়।[৭৩] কিন্তু এ তথ্যটি সঠিক নয়। বিশ শতকের বিশের দশকের একটি

Dhaka University Institutional Repository

রিপোর্টে দেখতে পাওয়া যায় যে, ঢাকায় এই সময় তিনটি কারখানায় নিরাপদ দিয়াশলাই তৈরি হতো। এগুলো হলো :

1. Govinda Match Factory, Paikpara, Narayanganj.
2. The Narayanganj Industrial Company, Narayanganj.
3. The Bharat Mata Match Factory, Dacca Town.[৭৪]

এই রিপোর্টে আরো উল্লেখ করা হয় যে, এই কারখানাগুলোতে ড. নন্দী কর্তৃক উদ্ভাবিত হাতকলের সাহায্যে দিয়াশলাইয়ের পাত (Splints) এবং বাক্স তৈরি হতো। এই কারখানাগুলোতে প্রায় ৬০ জন শ্রমিক কাজ করত (৩টি কারখানায়)। সাধারণত শ্রমিক ছাড়াও গ্রামের গরিবদের একটা অংশ বিশেষ করে নারী ও শিশুরা ঘণ্টা অনুসারে (Price work) এসব কারখানায় কাজ করত।

দিয়াশলাইয়ের কাঠি ও বাক্স তৈরির জন্য ছাতিয়ান (Chatian), কদম (Kadam), দেবদারু (Debdaru), বরুন (Barun), শিমুল (Simul) গাছের কাঠ ব্যবহৃত হতো। সাধারণত তিনটি মেশিন (যন্ত্র) ব্যবহৃত হতো। ব্যবহারিকভাবে এগুলো প্রধানত একই ধরনের। প্রথম মেশিন (যন্ত্র) দিয়ে দিয়াশলাইয়ের কাঠির ঘনত্ব অনুসারে কাঠগুলোকে ফালি করে কাটা হতো। এরপর ফালিগুলোকে দ্বিতীয় মেশিনে রেখে কাঠি কাটা হতো। এরপর তৃতীয় মেশিনে দিয়াশলাইয়ের বাক্স তৈরির জন্য কাঠগুলোকে ফালি করে এমনভাবে কাটা হতো যে, বাক্সের চারদিকে ভাজের জন্য জায়গা রাখা হতো। বড় কাঠের টুকরো থেকে দিয়াশলাইয়ের কাঠিগুলো এমন ভাবে কাটা হতো যাতে একটি কাঠি থেকে দুইটিরও বেশি কাঠি তৈরি করা যেত। এরপর কাঠগুলোকে শক্ত করে রাধা হতো এবং একটি উত্তপ্ত লোহার পাতের প্রান্তকে পোড়ানো হতো। এরপর দিয়াশলাইয়ের কাঠির এক-দুটি প্রান্তকে এক ইঞ্চির মত প্যারাফিনে (Paraffin Wax) ডুবিয়ে রাখা হতো। এরপর কাঠির বান্ডিলকে (Bundle) একত্রিত করা হতো এবং বিস্ফোরক পদার্থের পেস্ট তৈরি করে কাঠিগুলোর এক প্রান্তে লাগানো হতো। আর এই বিস্ফোরক পদার্থগুলো হলো —

১. ম্যাঙ্গানিজ ডাই অক্সাইড (Manganese Dioxide)
২. পটাশিয়াম ক্লোরেট (Potassium Chlorate)
৩. সালফার (Sulphur)
৪. সূক্ষ্ম বালি (Fine Sand)
৫. শিরিশের আঠা।

বিস্ফোরক পদার্থ লাগানোর পর কাঠির প্রান্তকে শুকানো হতো এবং কাঠিগুলোকে সমান করে কাটা হতো। তৈরিকৃত কাঠিগুলোকে রোদে শুকানোর পরে বাক্সে ঢুকানো হতো। বাক্সের বাইরের দিকে লাল ফসফরাস, ম্যাঙ্গানিজ-ডাই-অক্সাইড এবং শিরিশের আঠা দিয়ে পেস্ট তৈরি করা হতো। বাজারে বিক্রি করার পূর্বে তৈরিকৃত দিয়াশলাই একমাস অথবা তারও বেশি দিন মজুদ রাখা হতো। প্রতিদিন ৮-১০ গ্রোস উৎপাদন করা হতো।[৭৪ক]

বিশ শতকের বিশের দশকে দিয়াশলাইয়ের কাঠি নির্মাণের এই প্রক্রিয়া অত্যন্ত কষ্টকর বা শ্রমসাধ্য এবং বিরক্তিকর ছিল। এসময়কার দিয়াশলাইয়ের কাঠির মাথাগুলোর ঘর্ষণের

Dhaka University Institutional Repository

বহির্ভাগ স্যাঁতস্যাঁতে ছিল। যখন দিয়াশলাইয়ের বাক্সের বাইরের দিকে ঘষা হতো তখন এর মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে যেত। আবার অনেক সময় দিয়াশলাইয়ের কাঠিগুলো ৩ বা ৪ মাস মজুদ রাখা হতো। এর ফলে দেখা যেত যে, দিয়াশলাইয়ের কাঠিগুলো স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে যেত এবং ময়লা পড়ত। ফলে এগুলোর ঔজ্জ্বল্য হ্রাস পেত এবং কাঠিগুলোর উপর ছত্রাক পড়ত।

সাধারণত কারখানার মালিকরা বিভিন্ন জায়গা থেকে এক বছরের জন্য কাঠ সংগ্রহ করত। কাঠ পাওয়ার পরে এগুলোকে শুকানো হতো। এবং এই কাঠ থেকে কাঠি কাটা হতো।

সুতরাং দেখা যায় য, বিশ শতকের বিশের দশকে দিয়াশলাই শিল্প কুটির পর্যায়ে ছিল। হাত মেশিনের সাহায্যে দিয়াশলাই তৈরি করা হতো। ফলে ছোট কারখানাগুলো আধুনিক যন্ত্র ও বাষ্পচালিত বড় কারখানার সাথে টিকে থাকতে পারে নি।

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর ঢাকায় কয়েকটি দিয়াশলাই কারখানা স্থাপিত হয়। ১৯৪৮ সালের সরকারি একটি নথিতে দেখা যায় যে, পূর্ববাংলায় ৬টি দিয়াশলাই কারখানা ছিল। যার মধ্যে ঢাকা শহরে ৩টি কারখানা ছিল। নিম্নে তালিকাটি দেয়া হলো[৭৫]—

সারণি-২১

Sl. No.	Name and Address of the Factory	Owner	Annual production capacity in Gross	Capital invested
1.	Prasanna Match Factory, 18, Dewanbazar, Dacca	Proprietorship	3,60,000/-	Rs, 3,00,000/-
2.	Jagannath Match Factory, Faridabad, Dacca	-Do-	2,50,000/-	Rs, 15,000/-
3.	The Ujala Match Factory, 13/1A Chotakatra, Dacca	Partnership	1,50,000/-	Rs, 75,000/- (block Capital)
4.	The Standard Match Factory, Nutonbazar, Chandpur	Jt. Stock	93,600/-	Rs, 3,50,000/-
5.	The Llewellyn Match Factory, Khepupara,Bakerganj	-Do-	31,200/-	-
6.	The Habib Match Factory, Bogra	ProPrietorship	31,200/-	-

Dhaka University Institutional Repository

একই নথিতে আবার ঢাকার এই কারখানাগুলোতে কতজন লোক কাজ করত তা উল্লেখ করা হয়। নিম্নে তা দেয়া হলো[৭৬] —

সারণি-২২

Sl. No.	Name and Address	Capital outlay (Rs)	Manpower employed
1.	Jagannath Match Factory, Faridabad, Dacca	15,000/-	12
2.	Ujala Match Factory, 13/1A, Chotakatra	75,000/-	35
3.	Prassanna Match Factory, 18, Dewan Bazar Road, Dacca	66,225/-	390

আবার ১৯৫৮ সালের আরেকটি নথিতে দেখা যায় যে, এই সময় ঢাকায় ৬টি দিয়াশলাই কারখানা ছিল। নিম্নে এই কারখানার ব্যবহৃত শক্তি, বার্ষিক উৎপাদন, প্রতিদিন গড় শ্রমিকের সংখ্যার একটি তালিকা দেয়া হলো [৭৭]—

সারণি-২৩

Sl. No.	Name and Address of the Factory	Power used	Annual production capacity	Average No. of workers employed daily during the year 1956
1.	Amin Match Works, 20, K.M. Azam Lane Begum Bazar, Dacca	Electricity	50,000 gross of Match boxes	89
2.	Jagannath Match Factory, 18, Lalmahon podder Lane, Faridabad, Dacca	Steam and electricity	98,000 Ditto	29
3.	Prasanna Match Factory, 18, Dewan Bazar Road, Dacca	Electricity and Oil	2,70,000 Ditto	176
4.	Dacca Match Factory, Faridabad, Dacca	Electricity	12,00,000 Ditto	992
5.	Ujala Match Factory, 13/1A, Chota Katra, Dacca	Electricity	100,000 Ditto	178
6.	Sattar Match Works, Shampur, Dacca	Do	900,000 Ditto	650

উপরে উল্লিখিত Dacca Match Factory সম্পর্কে পরিশিষ্ট-৩ দেখুন।

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং ১৯৫০-এর দশকে দিয়াশলাই শিল্পে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়। এরপর থেকে দিয়াশলাইয়ের মান ও উৎপাদন বেড়ে যায়। কেননা ১৯৫০-৬০ সালের এই দশকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছিল ৫% (১৯৫০-৫১)–৩৩% (১৯৫৯-৬০)।[৭৮] এই সময় যেসব দ্রব্য পূর্ব পাকিস্তান হতে রপ্তানি করা হতো সেগুলোর মধ্যে পাটজাত দ্রব্য, কাগজ, নিউজপ্রিন্ট, চা, চামড়া, দিয়াশলাই, তামাক পাতা ও পান পাতা। সুতরাং রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যের মধ্যে দিয়াশলাই ছিল অন্যতম।

১৯৬০-এর দশকের একটি রিপোর্টে দেখতে পাওয়া যায় যে, পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে বিপুল পরিমাণে দিয়াশলাই রপ্তানি করা হতো। তার একটি পরিসংখ্যান নিম্নে বর্ণিত হলো[৭৯]—

সারণি-২৪

সাল	মূল্য (মিলিয়ন রুপি)
১৯৬০-৬১	২৬.৩ মিলিয়ন
১৯৬১-৬২	৩০.৯ মিলিয়ন
১৯৬২-৬৩	২৪.৯ মিলিয়ন
১৯৬৩-৬৪	২৮.৫ মিলিয়ন
১৯৬৪-৬৫	২৬.২ মিলিয়ন
১৯৬৫-৬৬	৩৯.০৬ মিলিয়ন

আবার একটি রিপোর্টে ১৯৬৫-১৯৭১ সাল পর্যন্ত দিয়াশলাই কারখানার শ্রমিক সংখ্যা এবং শ্রমিকদের বার্ষিক মজুরির পরিসংখ্যান পাওয়া যায়।[৮০]

সারণি-২৫

Manufacture of Match Industry (Major)

Year	Number of Workers	Average Annual Wages of worker
1965	8,331	1,268 Rs.
1966	8,327	1,280 Rs.
1967	10,088	1,389 Rs.
1968	12,000	1,485 Rs.
1969	12,000	1,792 Rs.
1970	11,300	2,276 Rs.
1971		

এখানে উল্লেখ্য যে, উপরের পরিসংখ্যানে ঢাকাসহ সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের হিসাব দেয়া হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সবশেষে *ঢাকা গেজেটিয়ারে* উল্লেখ করা হয় যে, ১৯৬০-এর দশকের শেষের দিকে তথা ১৯৬৯ সালে ঢাকা শহরে ৭টি দিয়াশলাইয়ের কারখানা ছিল। এসব দিয়াশলাই কারখানার উৎপাদনক্ষমতা নিম্নে দেয়া হলো—

সারণি-২৬

Sl. No.	Names of Match Factories	Location	Production (gross box per annum)
1.	Sattar Match Works	Dacca	12,00,000
2.	Dacca Match Works	-Do-	9,00,000
3.	Habib Match Works	-Do-	9,00,000
4.	Prasanna Match Works	-Do-	2,70,000
5.	Ujala Match works	-Do-	1,80,000
6.	Amin Match Works	-Do-	75,000
7.	Jagannath Match Works	-Do-	75,000

উৎস : S.N.H. Rizvi : *East Pakinstan District Gazetteers, Dacca*, 1969, p. 207.

উপরের আলোচনা থেকে দেখতে পাওয়া যায় যে, আলোচ্য সময়ের শুরুতে ৩টি দিয়াশলাই কারখানা ক্ষুদ্র পরিসরে থাকলেও পরবর্তীতে বিশেষ করে দেশভাগের পর আধুনিক ৭টি দিয়াশলাই ফ্যাক্টরি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এগুলো উৎপাদন ক্ষমতা অনেক বেশি ছিল বিধায় বাইরে রপ্তানি করা হতো। যা থেকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হতো। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে ঢাকা শহরে পূর্বের ফ্যাক্টরিসহ ৮টি ফ্যাক্টরির হিসাব পাওয়া যায়। সুতরাং এই শিল্পের আর কোনো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয় নি। তবে এটি ছিল ঐতিহ্যবাহী শিল্প, কুটির থেকে আধুনিক পর্যায়ে আসার ফলে এ শিল্পকে কেন্দ্র করে অনেক লোকের কর্মসংস্থান হয়। যা দেশের বেকার সমস্যা সমাধান ও অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিল।

সাবান শিল্প

ঢাকায় সাবানের প্রস্তুত প্রণালি সম্ভবত মুসলমানরাই সর্বপ্রথম প্রচলন করে। আরবি শব্দ 'সাবুন' হতে সাবান শব্দের উৎপত্তি।[৮১] ঢাকার সাবান এক সময় ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সাবানের অভাব মোচন করত। এমনকি সুদূর বসরা ও জেদ্দার বন্দরেও পর্যাপ্ত পরিমাণে ঢাকার সাবান বিক্রি হতো।

দেশীয় কাপড় ধোয়ার সাবান উৎপাদনে ঢাকা অনেক আগে থেকেই খ্যাতি অর্জন করেছিল। কেদারনাথ মজুমদার উল্লেখ করেন যে, ঢাকায় সাবান শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল ১৯০৫ সালে।[৮২]

Dhaka University Institutional Repository

গোলাকার কাপড় ধোয়ার এই সাবানের খ্যাতি ছিল সবচেয়ে বেশি। ১০০ জনেরও বেশি মুসলিম কারিগর এই কাজে নিয়োজিত ছিল। তিলের তেল, পশুর চর্বি, চক পাউডার ও রাসায়নিক দ্রব্য মিশিয়ে বড় স্টিলের গামলায় সিদ্ধ করে গোলাকার সাবান তৈরি করা হতো। বিশের দশকের রিপোর্টে (১৯২৯) দেখা যায় যে, ঢাকা শহরের ইমামগঞ্জ, নারিন্দা, বাবুবাজারে এই সাবান উৎপাদিত হতো। এই সময় এখানে ৬০ জন লোক কাজ করত। তারা সাধারণত অশোধিত কাপড় ধোয়ার এই সাবান তৈরি করত। স্থানীয়ভাবে এই সাবানের নাম ছিল 'বাংলা সাবান'। ডাকশিন মায়সুন্দির (Dakshen Maisundi) বাবু মধুসূদন সাহা ভৌমিক এবং মানিকগঞ্জের দাশের গ্রামের বাবু নিশিকান্ত রায় এই সাবান উৎপাদনের ব্যবসা করত। এই সময় (বিশের দশক) একজন সাবান কারখানার শ্রমিক মাসে ৩০ রুপি আয় করতে পারত।

বাংলা সাবান তৈরির জন্য প্রধান উপাদান হলো —

১. চর্বি এবং তেল (Fat and Oil)

২. ক্ষার (Caustic Soda)

৩. সিলিকেট সোডা (Silicate of Soda)

৪. কাপড় ধোয়ার সোডা (Washing Soda)

৫. অভ্র এবং চীনা মাটি (Talc and china clay)। এগুলো কলকাতা থেকে আমদানি করা হতো।[৮৩]

আবার যতীন্দ্রমোহন রায় উল্লেখ করেন, 'বাংলা সাবান' নিম্নলিখিত উপাদানে প্রস্তুত হতো।[৮৪]

সারণি-২৭

শামুক চূর্ণ	১০ মণ
সাজি মাটি	১৬ মণ
লবণ	১৫ মণ
তিল তৈল	১২ মণ
ছাগ চর্বি	১ মণ ১ সের
মোট :	৫৩ মণ ১৫ সের

বিশ শতকের বিশের দশকে "বাংলা সাবান" তৈরির জন্য যেসব উপাদান ব্যবহৃত হতো সেগুলো হলো [৮৪(ক)]—

১. লোহার তাওয়া বা টাটু (Single- Bottomed Iron Pans)

২. লোহার তৈরি হাত প্যাডেল (Hand Paddles made of Iron)

৩. লোহার কোদাল ও কর্নিক (Iron Spades and Trowels)

৪. মাটির তৈরি পেয়ালা (Earthen Cup)

Dhaka University Institutional Repository

যে প্রক্রিয়ায় সাবান তৈরি হতো তা এই দশকের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়। বলা হয়—

"At Dacca as wood fuel is much cheaper than coal, it is used commonly to feed the fires. Big iron pans or cauldrons are used for boiling the oil and fat. They generally make use of the cheapest oils and fats, e.g., mowha oil, mustard oil, coconut oil, in fact any oil or fat which can be obtained cheaply in the market. These oils and fats are never purified. They put the oil or fat into the boiling pans, as they are obtained from the market. Caustic soda solution is gradually poured over the oil and fat after they are heated.

This caustic soda is of low grade quality and of varying strength. The soap-makers never make use of any hydrometer to measure its strength. They have just a rough idea about the quantity of caustic soda required to be used for a given quantity of fat and oil. No heed is paid to the purity of water used in making the caustic solutions. As soon as the caustic soda solution is poured into the heated oil and fat, the contents in the pan is constantly stirred to prevent 'fobbing'. The soap is then allowed to boil for 7 hours. Occasional stirring is necessary to prevent the soap from getting charred by excessive heat. When the boiling is nearly complete, they subject it to a rough test and as required the oil or soda solution is added and the boiling is continued. When the boiling is nearly complete the fire is put out and the soap is allowed to settle. No salting is done at all. After a day or two the fire is kindled again and the soap is heated. Then filling materials, e.g., silicate of soda, washing soda, talc or china clay are mixed with the soap according to the quality of the soap required. Small quantities of the semi-solid soap is put into earthen moulds to give it the necessary shape. These washing soaps, far from being neutral, contain all the impurities originally contained in the ingredients."[৮৫]

এভাবে সাবান প্রস্তুত করার পর তাদের নিজস্ব দোকানে এগুলো বিক্রি করা হতো। এই দোকান থেকেই তারা পাইকারি ও খুচরা ব্যবসা করত। তারা দালালদের মাধ্যমেও সমগ্র পূর্ববাংলায় তাদের সাবান বিক্রি করত। ঢাকা, ময়মনসিংহ ও আসামে তাদের সাবান বিক্রির বিশাল বাজার ছিল।

পাকিস্তান আমলেও এই কাপড় ধোয়া সাবানের জন্য ঢাকা বিখ্যাত ছিল। ফরিদাবাদ ও ফরাশগঞ্জ এলাকায় অধিকাংশ মুসলিম কারিগর কুটির শিল্প হিসাবে প্রায় ১০০টি কারখানা পরিচালনা করত। কিন্তু পরবর্তীতে যন্ত্রে তৈরি কাপড় ধোয়ার সাবান বাজারে আসলে, কুটির শিল্পের এসব কারখানা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৮ সালের সরকারি নথিতে দেখা যায় যে, পূর্ববাংলায় কুটির পর্যায়ের প্রায় ১১৪টি সাবান কারখানা ছিল। নিম্নে সাবান কারখানার তালিকা দেয়া হলো (জেলা অনুযায়ী)[৮৬]—

ঢাকা-	৫৫টি (ঢাকা শহরে ৩৫টি এবং ২০টি নারায়ণগঞ্জ)
ময়মনসিংহ-	১টি
ফরিদপুর-	২টি
রাজশাহী-	২টি
দিনাজপুর-	৪টি
রংপুর-	১০টি
বগুড়া-	৬টি
পাবনা-	৩টি
খুলনা	২টি
কুষ্টিয়া-	৩টি
চট্টগ্রাম-	১০টি
নোয়াখালি-	৩টি
ত্রিপুরা-	৫টি
সিলেট	২টি
মোট=	১১৪টি

১৯৪০-এর দশকে পূর্ববাংলার কাপড় ধোয়ার সাবান উৎপাদনের পরিমাণ ছিল আনুমানিক ৪৩,২০০ মণ প্রতি তিন মাসে। সাবানের আকার নির্ভর করত কসটিংয়ের পরিমাণের উপর।[৮৭]

অন্যদিকে তিনমাস পর পর বা মাথাপিছু মাসে সাবানের চাহিদা ছিল ১/২০সের। যার মোট পরিমাণ ছিল ৫০,০০০ মণ প্রায়।[৮৮]

ইম্পেরিয়াল কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজের (Imperial Chemical Industries) হিসাব অনুসারে, পূর্ববাংলায় প্রয়োজনীয় কসটিক সোডা প্রতিমাসে ১৫০ টন অথবা প্রতি তিন মাসে প্রায় ৩৫০ টন ব্যয় হতো। এই সময় (১৯৪৮) কসটিক সোডা বিনিয়ন্ত্রিত হয়েছিল বলে উৎপাদনের উপর প্রভাব পড়ে।[৮৯]

প্রসাধন সাবান (Toilets)

ঢাকায় প্রসাধন সাবানের প্রথম কারখানাটির নাম ছিল গেণ্ডারিয়ার 'বুলবুল সোপ ফ্যাক্টরি'। এটি ১৯০৬-১৯০৭ সালে ভারতীয় শিল্প প্রদর্শনীতে প্রথম পুরস্কার হিসাবে স্বর্ণপদক লাভ করেছিল। এর মালিক ছিল কৃষ্ণচন্দ্র সাহা, সত্য মোহন দাস ও অক্ষয় দাস।[৯০] টোকিওর সিম বাসু সোমা সোপ ফ্যাক্টরিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুরেন্দ্র গুহ এটি পরিচালনা করতেন। এই কারখানায় (বুলবুল সোপ ফ্যাক্টরি) জাপানি সাবান প্রস্তুতকারী মি. এম. ডব্লিউ তাকিদা

Dhaka University Institutional Repository

চাকুরি করতেন। পরে তিনি (মি. এম. ডব্লিউ) হাটখোলায় (Hatkhola)[৯০ক] নিজের কারখানা স্থাপন করেন। বিভিন্ন রংয়ের ও ছায়ার সুগন্ধি সাবান তৈরি করতেন। এই সাবান তৈরি করা হতো কলকাতা থেকে আমদানিকৃত নারকেল তেল ও কসটিক সোডা দিয়ে। সিদ্ধ করার জন্য কিছু চাটু এবং কাটার জন্য হাত মেশিন এবং ছাপ দেয়ার জন্য কাঠের ফলক ব্যবহার করা হতো। এই সাবানের মান মোটামুটি ভালো ছিল এবং দামে সস্তা ছিল। এই সাবান মধ্যবিত্ত ও গরিবদের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে ছিল। অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন উল্লেখ করেন যে, "বুলবুল সোপ ফ্যাক্টরিতে প্রায় ২৩ রকমের সাবান উৎপাদিত হতো (বিজ্ঞাপন অনুসারে)। এরমধ্যে ১২/১৩ রকমের চাহিদা ছিল বেশি। সব ধরনের সাবানের মধ্যে বিখ্যাত ছিল ড্যাফোডিল সুগন্ধী সাবান। এর চাহিদা ছিল বেশি। এক বাক্স ড্যাফোডিল সাবানের দাম ছিল পনেরো আনা। বাক্সে থাকত তিনটি সাবান"।[৯১] সরকারি সূত্র অনুসারে সবধরনের সাবানের মূল্য ছিল কম।

বুলবুল সাবানের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও পুঁজির অভাবে এর উৎপাদন বাড়ে নি। শুধু তাই নয়—কলকাতায় স্থাপিত নতুন কারখানা, যেমন—অরিয়েন্টাল বেঙ্গল, ন্যাশনাল, নর্থওয়েস্ট সোপ ফ্যাক্টরির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আর টিকে থাকতে পারে নি বুলবুল সোপ ফ্যাক্টরি। ঢাকায় তখন এর একক আধিপত্য কিন্তু ঢাকার বাইরে পুরানো আধিপত্য লোপ পাচ্ছিল।

এখানে বুলবুল সোপ ফ্যাক্টরির পরিপ্রেক্ষিতে সামগ্রিকভাবে সাবান শিল্প নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সাবান শিল্প কেন বিকশিত হলো না তার কারণ খোঁজা হয়েছে। অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন উল্লেখ করেন যে, "সরকারি তথ্য অনুসারে সাবান শিল্পের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর ছিল কমিশন ব্যবস্থা। কমিশন প্রথাকে সরকার আত্মঘাতী হিসাবে আখ্যা দিয়েছে। বাজার দখল করার জন্য কারখানার মালিকরা এজেন্টদের কমিশন হার বাড়িয়ে দেয় এবং কখনও কখনও তা ৩০ থেকে ৩৫ ভাগে দাঁড়ায়। যেমন—ড্যাফোডিল যদি কমিশন প্রতিযোগিতায় না পড়ত তাহলে এর দাম হতো ৯ আনা। কমিশনের কারণে তা হয়ে দাঁড়ায় ১৫ আনা। এতে যে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ক্রেতা বা ভোক্তারা তা উল্লেখ করে নি। রিপোর্টে আশঙ্কা করা হয়েছে যে, কমিশন ব্যবস্থার বিদ্যমান ধারা অব্যাহত থাকলে বিদেশি সাবানের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দেশি সাবান মার খাবে, কার্যত তাই হয়েছে।"[৯২]

তাই দেখা যায় দেশভাগের সময় পর্যন্ত কলকাতা ও বিদেশি সাবান বাজার দখল করে ফেলেছিল। ১৯৫০ সালের সরকারি নথিতে দেখতে পাওয়া যায় যে, Lux ও Pears সাবান ঢাকা শহরের বাজারে বিক্রি হতো। প্রতি পিস Pears সাবানের খুচরা মূল্য ছিল ১৯৫০ সালের জুন মাসে ১ রুপি এবং পূর্বে ছিল ১ রুপি অপরদিকে জুন মাসে পাইকারি মূল্য ছিল প্রতি ডজন ১১ রুপি, পূর্বে ছিল ১২ রুপি। প্রতি পিস লাক্স সাবানের খুচরা মূল্য ছিল জুন মাসে ৮ রুপি, পূর্বে ছিল ১০ রুপি এবং পাইকারি মূল্য ছিল প্রতি ডজন ৭ রুপি ৪ আনা, পূর্বে ছিল ৫ রুপি ৮ আনা।[৯৩]

১৯৬১ সালের একটি রিপোর্টে দেখা যায় যে, ১৯৬০ সালে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ৩০৪ হাজার রুপির সাবান আমদানি করে।[৯৪]

Dhaka University Institutional Repository

তবে পাকিস্তান আমলে কিছু আধুনিক কারখানা স্থাপিত হয়। ১৯৫৪ সালের নথিতে এরূপ ৭টি সাবান কারখানার নাম পাওয়া যায়।[৯২] এগুলো হলো—

সারণি-২৮

ক্রমিক নং	সাবান কারখানার নাম	মালিকের নাম	ঠিকানা
১.	লাকী সোপ ফ্যাক্টরি	মোঃ মন্দুর	১১, ছোট কাটরা, ঢাকা
২.	সান-সাইন সোপ ফ্যাক্টরি	হাজী মোঃ হোসাইন	তেজগাঁও, ঢাকা
৩.	হুমায়ূন ব্রাদার্স	মোঃ হুমায়ূন	৪৮/৫৩, হাকীম হাবীবুর রহমান রোড, ঢাকা
৪.	প্রিমিয়ার সোপ ফ্যাক্টরি	আবু সাঈদ	২/১, ইমামগঞ্জ, ঢাকা
৫.	হাজী মোঃ ফয়েজ হোসেন এ্যান্ড ব্রাদার্স	জয়নুল আবেদিন	১, ইমামগঞ্জ, ঢাকা
৬.	কমান্ডার সোপ ফ্যাক্টরি	এস. এম. আরেফিন	তেজগাঁও, ঢাকা
৭.	হাজী মোঃ বেপারী	হাজী মনসুর আলী	৯, ছোটকাটরা, ঢাকা।

দেশ স্বাধীনের পর সাবান শিল্প আরো উন্নতি লাভ করে। ১৯৭০-এর দশকের পূর্বে ১৯৬০-এর দশকের শেষের দিকে ঢাকায় নিম্নবর্ণিত কাপড় ধোয়ার সাবান ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের প্রসাধন সাবান তৈরি হতো।[৯৩]

সারণি-২৯

ক্রমিক নং	কারখানার নাম	ঠিকানা
১.	কমান্ডার সোপ কোম্পানি	ওয়াটার ওয়েজ রোড, ঢাকা
২.	কোহিনূর কেমিক্যালস	তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা
৩.	সিরকো সোপ কেমিক্যাল	ইমামগঞ্জ, ঢাকা।

সুতরাং দেখতে পাওয়া যায় যে, সাবান শিল্প পূর্ববাংলায় কুটির পর্যায়ে বিকশিত হলেও এর খ্যাতি ঢাকা শহরসহ দেশের ভেতরে ও বাইরে ছিল। বর্তমানে (বাংলাদেশ) ঢাকার সাবান শিল্প অনেক উন্নত মানের। ভারতের পূর্ব সীমান্তের অধিকাংশ রাজ্যে এদেশের সাবানের জনপ্রিয়তা ক্রমবর্ধমান। বাংলাদেশের সর্বত্রই ঢাকার সাবানের কদর। যা ঢাকার শিল্পায়নে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের একটি ইতিবাচক দিক।

Dhaka University Institutional Repository

ফার্মাসিউটিকল এ্যান্ড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি

ঢাকার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হলো ফার্মাসিউটিকল ইন্ডাস্ট্রি। ফার্মাসিউটিকল ইন্ডাস্ট্রিজ চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত ঔষধ তৈরি করে। যা রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহার করা হয়। এদেশের ফার্মাসিউটিকল শিল্প শুধু ঔষধ তৈরি করে। কিন্তু উন্নত বিশ্বে এই শিল্পের প্রধান কাজ হলো নতুন ঔষধ তৈরির জন্য প্রচুর গবেষণা ও উন্নত কিছু উদ্ভাবন করা।

ইংল্যান্ডের মাধ্যমে এই অঞ্চলে এলোপ্যাথিক ব্যবস্থা প্রাধান্য পেলে প্রাচীনকাল থেকে ভারতে প্রচলিত আয়ুর্বেদ ব্যবস্থা হ্রাস পায়। ফলে ইটালি, আমেরিকা এবং জাপানের কোম্পানিগুলো এই অঞ্চলের (ভারত) বাজার দখল করার জন্য ইউনিট স্থাপন করে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : "D. Waldie & Co.", "Bathgate & Co.", "Wilkinson, Smith Stanisttreet & Co.", "R. Scott Thomson & Co.", "King & Co. and Hahnemen Home".[৯৭]

স্বদেশি আন্দোলনের সময় দুটি উদ্যোগ নেয়া হয়। একটি হলো আয়ুর্বেদ মেডিসিন এবং অন্যটি হলো পূর্ব ও পশ্চিমের মেডিসিন ব্যবস্থার মিশ্রণে স্বদেশি এলোপ্যাথি তৈরি করা।

স্বদেশি যুগে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো ইউনাইটেড বেঙ্গল এ্যান্ড আসাম ফার্মাসিউটিকল এ্যান্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড, ওরিয়েন্টাল কেমিক্যাল এ্যান্ড ফার্মাসিউটিকল ওয়ার্কস, আর্থ কেমিক্যাল ওয়ার্কস কোম্পানি লিমিটেড এবং আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠিত 'বেঙ্গল কেমিক্যাল এ্যান্ড ফার্মাসিউটিকল ওয়ার্কস'। ১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় "বেঙ্গল ইমিউনিটি"।[৯৮] এগুলো কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৯ সালে ঢাকায় আয়ুর্বেদ ফার্মাসিউটিকল লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হয়। যা ঢাকার প্রথম ফার্মাসিউটিকল শিল্প। এটি মূলত ভারতীয় ফার্মাকপিয়া (ঔষধ প্রণালি ও ব্যবহারের নির্দেশ সংবলিত মুদ্রিত পুস্তক) থেকে ঔষধ তৈরি করা হতো।[৯৯]

১৯৪৮ সালের সরকারি নথিতে ৬টি কেমিক্যাল ওয়ার্কসের নাম পাওয়া যায়। এসব কেমিক্যাল ওয়ার্কসের মূলধনের পরিমাণ ও শ্রমিক সংখ্যার উল্লেখ করা হয়।[১০০]

সারণি-৩০

Sl. No.	Name and Address of Factory	Capital outlay	Manpower employed
1.	Pakistan Chemical Works Ltd. , 78/3, Patuatuli, Dacca	Rs, 500,000	26
2.	Zareena Chemical Works, 41, Md. Asgar Lane, Dacca	Rs, 8,000	18
3.	Star of India Chemical Union, 175, Bangshal Road, Dacca	Rs, 30,000	30

Dhaka University Institutional Repository

4.	Chemical and Theropeutical Institute of Pakistan Ltd., 8/1, Court House St., Dacca	Rs. 1,500,000	12
5.	New Light Chemical Industries, 31/3, Patuatuli, Dacca	Rs, 30,000	10
6.	Oriental Pharmeseutical [*sic*] & Chemical Co. Ltd., 8, Patuatuli, Dacca	Rs. 100,000	3

অপরদিকে ১৯৫২ সালে পূর্ববাংলার অর্থনৈতিক অবস্থার উপর যে পর্যবেক্ষণ হয় তাতে ফার্মাসিউটিকল ইন্ডাস্ট্রির উপর বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়।

এই সময় পূর্ববাংলায় ২০টি কেমিক্যাল ও ফার্মাসিউটিকল ওয়ার্কস (Chemical and Pharmaciutical Works) ছিল যার মধ্যে ৬টি গুরুত্বপূর্ণ ছিল।[১০১]

1. Rangpur District Consumer' Co-Operative Stores (Chemicals) Ltd., Rangpur.
2. East Pakistan Drugs and Chemicals, Pabna.
3. Bengal Techno Chemical Works, Dinajpur.
4. Bactro-Clinical Laboratories, Anderkilla, Chittagong.
5. Albert David & Co., Ltd. , Dacca.
6. Karim & Co., (Eastern Drug Co.), Dacca.

এসব ফার্মাসিউটিকল ওয়ার্কসে যেসব দ্রব্য উৎপাদন করা হতো তা উল্লেখ করা হলো—

Injectules: (Non-Biological), e.g.—Glucose, Calcium, Gluconate, Calcium Chloride, Magnesium Sulphate, Quinine hydrocloride plain and with urethane or Saccharose, Sodium Salicylate, Normal Saline, Muskin Ether, Caffiene Sodi Benzoate, Cuffience Sodi Salicylate, Ephedrine hydrochloride, Redistilled water, etc.

Entracts.—Kalamegh, Punarnava, Gulancha, Kurchi, Asoka, Damiana etc., from the indegenous plants of the province.

Tinctures: e.g.—Tincture Card Co., Tincture Belladona, Tr. Benzoin, Tr. Choloroform, Tr. Carminative, Tr. Nux Vomica, Tr. Hyoscyamus, Tr. Feri Puchlor, Tr. Chirata, Tr. Lobelia, Tr. Ipecac, Tr. Chincona etc.

Syrup, e.g.—Syrup Calci Hypophos, Syrup Vasaka-et, Tolu, Syrup Vasaka with Kontikari, Easton Syrap etc.[১০২]

Dhaka University Institutional Repository

এই সময় (১৯৫২) বেশিরভাগ ফার্মাসিউটিকল ওয়ার্কস নিয়মিত উৎপাদন করত না। মূলত তারা অর্ডারের উপর ভিত্তি করে উৎপাদন করত। এগুলোর বেশির ভাগই ক্ষুদ্র উদ্যোগ। একমাত্র R.D.C.C.S. (Rangpur District Consumers Co-Operative Stores (Chemicals) Ltd. ব্যতীত। এই প্রতিষ্ঠানে ৫০ জন কর্মচারী নিয়োজিত ছিল। অন্য প্রতিষ্ঠানে ২০ জনেরও বেশি ছিল না।

১৯৫০-৫১ সালে পাবনার The East Pakistan Drugs and Chemical প্রায় ২৫,০০০ রুপি মূল্যের ১০,০০০ lbs. (পাউন্ড) ফার্মাসিউটিকল দ্রব্য উৎপাদন করত এবং তারা ২২০০ lbs. (পাউন্ড) এ্যালকোহল ব্যবহার করত। ১৯৫২ সালে উৎপাদন ১ লক্ষ lbs. (পাউন্ড) পৌঁছেছিল।[১০৩]

১৯৫০-৫১ সালে ১ কোটি রুপি মূল্যের ঔষধ এবং ঔষধ প্রস্তুতকারী উপাদান চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে আমদানি করা হয়।[১০৪] এই প্রদেশে জনসংখ্যা এবং তাদের স্বাস্থ্যের অবস্থা/চাহিদা অনুসারে বিপুল পরিমাণে ঔষধ প্রয়োজন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান কেবল প্রয়োজনীয় ২.৫% উৎপাদন করতে পারত। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য প্রয়োজনীয় ৯০% ফার্মাসিউটিকল দ্রব্য বিভিন্ন দেশ বিশেষ করে ভারত, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আমদানি করা হতো। ১৯৬১ সালের একটি রিপোর্টে দেখা যায় যে, ১৯৬০ সালে ৭৩৯ হাজার রুপির ড্রাগ এবং মেডিসিন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে আমদানি করা হয়।[১০৫]
১৯৫০ সালে বিদেশ থেকে যেসব ঔষধ আমদানি করা হতো, ঢাকার বাজারে তার পাইকারি ও খুচরা মূল্য সম্পর্কে ঐ সময়কার রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়। যা নিম্নে দেয়া হলো —

সারণি-৩১

[পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন]

১৯৫২ সালে বেশিরভাগ ফার্মাসিউটিকল ওয়ার্কস ভালোভাবে যন্ত্রসজ্জিত ছিল না। এসব ফার্মাসিউটিকল ওয়ার্কসে যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হতো সেগুলো হলো—

"one distilled water plant (not mechanically run);

A few Glass flasks and Condensers, for making redistilled water;

A few primus stoves and Jet stoves (none of them have a Gas Plant);

One Autoclave,used as a sterilizer;

One Percolator."[১০৬]

১৯৫২ সালে Albert David & Co., ঢাকার 100, Dinanath Sen Road-এ কার্যক্রম শুরু করে। এই প্রতিষ্ঠান আধুনিক যন্ত্রপাতি সজ্জিত ছিল এবং একটি ছোট গ্যাস প্লান্ট ছিল। যা টেকসই ছিল। Albert David & Co. ইংল্যান্ড থেকে রিডিসটিলিড ওয়াটার প্লান্ট আমদানি করে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-৩১

Wholesale and retail price of Medicinal goods in Dacca as on 9th August, 1950

Commodities	Specification	Unit	Whole sale price				Unit	Retail price			
			Nawabpur Area		Moulvibazar Area			Nawabpur Area		Moulvibazar Area	
			Present Price	Last Month Price	Present Price	Last Month Price		Present Price	Last Month Price	Present Price	Last Month Price
(a) Glucose 'D'	U. K.	1 Lb. tin of Doz	25-0-0	24-0-0	24-0-0	24-0-0	Each	2-2-0	2-2-0	2-3-0	2-2-0
(b) Paludrine Tabs.	1 Gram	Packed of 100	N. Q	N. Q.	N.Q.	N. Q.	Each	N. Q.	0-0-6	0-0-6	0-0-6
(c) Paludrine Tabs	3 Gram	Packed of 496	23-8-0	22-0-0	22-0-0	22-0-0	"	0-1-0	0-1-0	0-2-0	0-2-0
(d) B Tabs	693 Gram	500 Tabs of 0.50 gram each	27-12-0	30-0-0	30-0-0	30-0-0	"	0-1-6	0-2-0	0-2-0	0-2-0
(e) Insulin	10 C. C.	40 Units	3-5-0	3-5-0	3-5-0	3-5-0	40 Units	3-5-0	3-5-0	3-5-0	3-5-0
(f) Cod liver Oil	Kepler's London	Dozen	30-0-0	30-0-0	30-0-0	30-0-0	Each	3-0-0	3-0-0	3-0-0	3-0-0
(g)Cod liver Oil	Enger's Emulsion	Dozen (big)	36-0-0	36-0-0	37-8-0	36-0-0	"	3-8-0	3-4-0	3-6-0	3-0-0
(h) Cod liver Oil	Enger's Emulsion	Dozen (small)	20-4-0	20-4-0	18-8-0	17-0-0	"	1-14-0	1-12-0	1-14-0	1-12-0
(i) Osto Calcium	Glucose Co. U.K.	Packet of 50 Tabs. Dozen	20-4-0	20-4-0	20-4-0	20-4-0	Packet of 50 Tabs	1-15-0	1-12-0	1-12-0	1-12-0

উৎস : *B proceedings*, B # 76, File No. 4P-4/49, Branch : Commerce, Department : C. I. & I, Government of East Bengal, 1950, p. Appendix (4) 5.

Dhaka University Institutional Repository

এই সময় দেখতে পাওয়া যায় যে, রংপুরের R.D.C.C.S. Ltd., The East Pakistan Drug and Chmical এবং Albert David & Co. ছাড়া অন্য কোনো ফার্মাসিউটিকল ওয়ার্কসে উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তিগত দক্ষ ব্যক্তি ছিল না। এই সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্মাসিউটিকলের উপর পড়ানো হতো না। এমনকি প্রশিক্ষণ দেয়ার মতো কোনো আলাদা প্রতিষ্ঠান ছিল না। ফার্মাসিউটিকলে যারা কাজ করত তাদের বেশিরভাগ ছিল অপেশাদার। তাদের বাস্তবিক ও তাত্ত্বিক কোনো প্রশিক্ষণ ছিল না। এই শিল্পের নানাবিধ সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও অগ্রগতি সাধিত হয় নি। এই শিল্পের উন্নতি সাধনের জন্য বলা হয় "It is , therefore, essentially necessary that the Dacca university should be requested to open Pharmaceutical Chemistry Branch under the Department of Chemistry."[১০৭]

ফার্মাসিউটিকল শিল্পের কাঁচামাল : জগতে যত প্রকার চিকিৎসা পদ্ধতি প্রচলিত আছে, আয়ুর্বেদ তারমধ্যে প্রাচীনতম, সুসমাপ্ত ও শ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিজ্ঞান। প্রাচীন পাক-ভারতের মুনি-ঋষিগণের দ্বারা দেশকাল পাত্রানুযায়ী সুসংস্কৃত। সাধারণত আয়ুর্বেদ সম্বন্ধীয় জ্ঞান যে শাস্ত্র দ্বারা লাভ করা যায় তার নাম আয়ুর্বেদ। ... চরক লিখেছেন, আয়ুর হিত ও অহিত এবং রোগের কারণ ও দমনের উপায় যে শাস্ত্রে আছে তার নাম আয়ুর্বেদ।[১০৭(ক)] হিন্দু ধর্মানুযায়ী আয়ুর্বেদ বেদরই অন্যতম একটি অংশ। কারণ বেদ ৪টি খণ্ডে বিভক্ত। এর একটি খণ্ড হলো অর্থব। এই অর্থব খণ্ডে মানুষ ও প্রাণিজগতের রোগ নিরাময়, সামাজিক অনুশাসনের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। তাই প্রাচীনকালের মুনি ঋষিরা এই অর্থববেদ বিশ্লেষণ করে আয়ুর্বেদ চিকিৎসার উদ্ভাবন করে।

আয়ুর্বেদ একটি জাতীয় ও উন্নতশীল চিকিৎসা। প্রাচীনকাল থেকে এই অঞ্চলের মানুষ আয়ুর্বেদ চিকিৎসা পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল ছিল। তখন এদেশে চিকিৎসা পদ্ধতি বলতে আয়ুর্বেদ চিকিৎসাকে বুঝাত।

পূর্ববাংলা বিশেষ করে ঢাকা আয়ুর্বেদীয় ঔষধ তৈরিতে সবচেয়ে বেশি সমৃদ্ধি লাভ করে। আয়ুর্বেদীয় ঔষধ তৈরি করা হতো দেশীয় উপাদান থেকে, তথা ভেষজদ্রব্য বা উদ্ভিজ্জ উপাদান দিয়ে। যা সমগ্র পূর্ববাংলায় সহজেই পাওয়া যেত। কিছু ফার্মাসিউটিকল দ্রব্য তৈরি করা হতো সনাতন পদ্ধতি অনুসারে। ঢাকা ছিল আয়ুর্বেদীয় ঔষধ তৈরির কেন্দ্র। শহরের চারদিকে ৫টি কারখানা গড়ে ওঠে। এর মধ্যে তিনটি বিখ্যাত ছিল —

১. সাধনা ঔষধালয় (Shadhana Aushodhalaya, Dacca)

২. শক্তি ঔষধালয় (Sakti Aushodhalaya, Dacca)

৩. আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয় (Aurvediya Aushodhalaya, Dacca)।

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নে সাধনা ঔষধালয়, শক্তি ঔষধালয়ের ধারাবাহিক বর্ণনা দেওয়া হলো —

সাধনা ঔষধালয় : আয়ুর্বেদের শ্রেষ্ঠ প্রচারক প্রখ্যাত পণ্ডিত, বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে অধীত বিজ্ঞানী আয়ুর্বেদ ঋষি আচার্য যোগেশচন্দ্র ঘোষ ১৯১৪ সালে ঢাকার গেণ্ডারিয়ায় সাধনা ঔষধালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৮৭৭[১০৭(খ)] সালে বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার শরীয়তপুর মহকুমার গোসাইরহাটে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়ন শাস্ত্রে এম. এ. ডিগ্রি লাভ করেন। লন্ডন থেকে এফ. সি. এস এবং আমেরিকা থেকে এম. সি. এস. পাস করেন। তিনি ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। উল্লেখ্য তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভি. সি. প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের ছাত্র ছিলেন। তার রচিত গ্রন্থাবলি হলো— ১. অগ্নিমান্দ্য ও কোষ্ঠাবদ্ধতা আরোগ্যপন্থা, ২. গৃহচিকিৎসা, ৩. চর্ম ও সাধারণ শাস্ত্রবিধি।

যাহোক তাঁর জীবনের একমাত্র আদর্শ ছিল আয়ুর্বেদ ঔষধকে বিশুদ্ধ, অবিমিশ্রিত গভীর কার্যকরী ও উচ্চমান রেখে তৈরি, সুলভ মূল্যে বিক্রি করা ; যাতে দরিদ্র জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশ-বিদেশে প্রচার করা। তাঁর মহৎ উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল। কেননা তাঁর ঔষধালয়ের ঔষধসমূহ বিশুদ্ধ ও উৎকৃষ্টমানের ছিল। তাঁর ঔষধালয়ের ঔষধ সমগ্র ভারত, চীন, উত্তর আমেরিকা, আফ্রিকা, লন্ডনেও পাওয়া যেত। কলকাতায় সাধনা ঔষধালয়ের কারখানা ছিল। এই প্রতিষ্ঠানে বর্তমান ম্যানেজার সুশীল চন্দ্র মোহন্ত (৬২) উল্লেখ করেন যে, ফ্রান্সে সাধনা ঔষধালয় প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানে এর শাখা ছিল।[১০৭(গ)] সুতরাং দেশ-বিদেশে ঢাকার সাধনা ঔষধালয়ের ঔষধ ব্যাপক সুনাম ও জনপ্রিয়তা অর্জন করে। যা বিভিন্নজনের উক্তি থেকে জানা যায়।

সাধনা ঔষধালয় পরিদর্শন করে পাক-ভারতের শ্রেষ্ঠ রসায়নবিদ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলেন, "প্রফেসর শ্রী যোগেশচন্দ্র ঘোষ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী এম. এ. (কলকাতা), এফ. সি. এস (লন্ডন), এম. সি. এস. (আমেরিকা) কর্তৃক পরিচালিত সাধনা ঔষধালয়ের কারখানা পরিদর্শন করিয়া বড়ই প্রীতি লাভ করিলাম। এখানে বহুল পরিমাণে ঔষধাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং প্রফেসর ঘোষ স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া কারখানা তত্ত্বাবধান ও ঔষধাদি প্রস্তুত করিয়া থাকেন। ঔষধাদি যাহাতে বিশুদ্ধ ও অকৃত্রিম হয় তৎপ্রতি অধ্যক্ষের বিশেষ দৃষ্টি আছে। এই কারখানার ঔষধ বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত করা হয় বলিয়াই এখানকার ঔষধগুলি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দেশসমূহে খুব কাটতি হইতেছে— ইহাই আমার বিশ্বাস ও ধারণা। প্রফেসর ঘোষ আমার একজন প্রাক্তন ছাত্র। আয়ুর্বেদে তাহার এই অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়া বড়ই আনন্দলাভ করিলাম।"[১০৭(ঘ)]

অপরদিকে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু বলেন— "আমি ঢাকার সাধনা ঔষধালয় পরিদর্শন করিয়াছি এবং তাহাদের ঔষধ সুসংরক্ষণ, প্রস্তুত-প্রণালি ও সৌষ্ঠবযুক্ত কার্যসম্পাদন ব্যবস্থা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। সাধনার প্রস্তুত ঔষধাবলির শাস্ত্রীয়তা ও অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণরূপে নিঃসন্দেহ হইয়াছি। অধ্যক্ষ মহাশয়ের জনহিতৈষণার মনোভাবও বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। এই প্রতিষ্ঠানের কর্ম প্রচেষ্টাকে সমর্থন করিলে আয়ুর্বেদকেই সমর্থন করা

Dhaka University Institutional Repository

হইবে। সত্যসত্যই আয়ুর্বেদানুসারী বলিয়া সাধনার প্রস্তুত ঔষধাবলির ব্যবহারের দ্বারা যে কেবল রোগ আরোগ্যের পক্ষে বাঞ্ছিত লাভই হইবে, তাহা নয়, পরন্তু ঔষধগুলির এই প্রকার ফলপ্রসূশক্তি আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণের জনপ্রিয়তাকেও বহুল পরিমাণে বর্ধিত করিবে। ঢাকার এই সর্বপ্রধান ঔষধালয়ের কর্তৃপক্ষ যেরূপ নিষ্ঠা ও সফলতার সহিত আয়ুর্বেদের সেবা করিতেছেন, তাহাতে আমি তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত না করিয়া পারিলাম না।"[১০৭(ঙ)]

আমেরিকাতে তাঁর ঔষধ সুনাম অর্জন করেছিল, যা সুবিখ্যাত পাশ্চাত্য চিকিৎসক ডাক্তার উইলিয়াম ব্রাউন (এম. ডি), ৪২৪ ফেডারেল স্ট্রিট, ইউ. এস. এ-এর উক্তি থেকে বোঝা যায়। তিনি বলেন— "আপনি বিশুদ্ধভাবে ঠিক আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের বিধানমতে আপনার ঔষধ প্রস্তুত করিতেছেন। আমি জানি, রোগীদের যথার্থ উপকারকার্যে আপনি ব্রতী হইয়াছেন। পাশ্চাত্য জগতে ইহা সম্পূর্ণ নূতন, আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, এইভাবে ঔষধ প্রস্তুত প্রণালি আমি বিশেষভাবে সমর্থন করি এবং এ বিষয়ে আরও অধিকতর জ্ঞান অর্জন করিতে ইচ্ছা করি।"[১০৭(চ)]

পৃথিবীবিখ্যাত ঔপন্যাসিক বাংলার অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাধনা ঔষধালয়ের প্রশংসা করে বলেন—"কিছুদিন হইতে আপনাকে পত্র লিখিব লিখিব মনে করিতেছিলাম। কারণ—আপনার সর্বজ্বর বটী খাইয়া আমার জ্বর সারিয়াছে, এই কথাটা ইচ্ছা ছিল আপনাকে কৃতজ্ঞতার সহিত নিবেদন করিব। আমি মুখে মুখেও বহু পরিচিত ব্যক্তিকে ইহার উল্লেখ করিয়াছি।"[১০৭(ছ)]

আনন্দ বাজার পত্রিকা উল্লেখ করে যে, "সাধনা ঔষধালয়ের অধ্যক্ষ মহাশয় নিজে বিশেষভাবে সমগ্র প্রতিষ্ঠানটির তত্ত্বাবধান করেন। তিনি যত্নসহকারে পরীক্ষা করিয়া না দেখিবার পূর্বে সাধনা ঔষধালয়ের কোনো ঔষধ বাজারে বাহির করা হয় না। কাজেই সাধনা ঔষধালয়ের ঔষধের বিশুদ্ধতা ও কার্যকারিতা গ্যারান্টি-প্রদত্ত।"[১০৭(জ)]

অপরদিকে এ. কে. ফজলুল হক, পূর্ববঙ্গের গভর্নর বলেন— "সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত "মৃতসঞ্জীবনী" স্বাস্থ্যলাভের পক্ষে উৎকৃষ্ট টনিক। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, রক্তাল্পতায়, দুর্বলতানাশে দৈহিক অবসাদ দূর করিতে ইহার শক্তি অমোঘ।

সাধনা ঔষধালয়ের অধ্যক্ষ ডা. যোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম. এ. মহোদয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সর্ববিধ আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বৈজ্ঞানিক প্রণালিতে প্রস্তুত হয় এবং ইহা ভারতের সর্বত্র এবং বিদেশে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানটির অসংখ্য শাখাসমূহে প্রেরিত হয়। বিগত চল্লিশ বৎসরেরও অধিককাল যাবৎ ডা. ঘোষ নিষ্ঠার সহিত জনসেবায় ব্রতী থাকিয়া এবং আয়ুর্বেদশাস্ত্রের অমূল্য রত্নসমূহ জনগণের নিকট সহজলভ্য করিয়া তুলিয়া দেশবাসীর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন। আমি নিজে সাধনার কয়েকটি ঔষধ ব্যবহার করিয়া বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়াছি। ঔষধগুলি বিশুদ্ধ, ফলপ্রদ এবং অদ্ভুত ক্ষমতাসম্পন্ন। আমি ডা. ঘোষের প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করি।"[১০৭(ঝ)]

Dhaka University Institutional Repository

আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, আয়ুর্বেদ ও সাধনা ঔষধালয় সম্বন্ধে ইং ২/৫/৫৪ তারিখে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তা নিম্নরূপ—

"লুপ্তপ্রায় আয়ুর্বেদের পুনরুজ্জীবনের জন্য অধ্যাপক শ্রী যোগেশচন্দ্র ঘোষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার কাহিনী আমি অনেক দিনই শুনিয়াছি। তাঁহার সাধনা ঔষধালয়ের নামও আমার নিকট বিশেষ পরিচিত। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা পদ্ধতি আমাদের দেশের নিজস্ব সম্পদ। এই কারণেই আয়ুর্বেদ সম্বন্ধে চিরকালই আমার একটা গর্ব এবং মমত্ববোধ আছে। বিভিন্ন ঔষধ প্রস্তুতরত সাধনা ঔষধালয়ের কারখানাটি পরিদর্শন করিয়া আজ আমি বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি।

আমাদের দেশের শতকরা নব্বইজন লোকই হইল দরিদ্র। অধিক মূল্যের বিদেশি ঔষধ ক্রয় করিয়া রোগের চিকিৎসা করা তাহাদের পক্ষে একান্তই অসাধ্য ব্যাপার। সুলভ মূল্যের আয়ুর্বেদীয় ঔষধাদির প্রয়োজন এদেশে অবশ্য স্বীকার্য। সাধনার ঔষধাদি সেবনে বহুলোক উপকৃত হইতেছে। তাই সাধনা ঔষধালয়ের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হউক, ইহাই আমি আন্তরিকভাবে কামনা করি।"[১০৭(ঞ)]

এছাড়া পুনার ডা. এফ রঞ্জিত, অর্থসচিব নলিনীরঞ্জন সরকার, ডাক্তার এ. জে. উইটাগু (কলম্বো, সিলন), ডা. মঙ্গ বি টুন (এডিনবরা) বাঙ্গালোর ডা. জে. সি. ঘোষ, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি রাজা স্যার মন্মথনাথ রায় চৌধুরী প্রমুখ সাধনা ঔষধালয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সুতরাং এসব প্রশংসাসূচক উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, ঢাকার সাধনা ঔষধালয়ের ব্যাপক চাহিদা ছিল। পূর্ববাংলা তথা সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে এর শাখা ছিল। এবং এই শাখাকে কেন্দ্র করে ঔষধের রমরমা ব্যবসা হতো।

সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুতকৃত ঔষধ দিয়ে সবরোগের চিকিৎসা করা হতো। এমনকি কঠিন রোগেরও চিকিৎসা করা হতো। সাধারণত যেসমস্ত রোগের চিকিৎসা করা হতো সেগুলো হলো— সর্দিজ্বর, সামান্য জ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, সন্নিপাতজ্বর, নিউমোনিয়া, নাসা জ্বর, প্লীহা, যকৃতবৃদ্ধি, পাণ্ডু, যকৃত প্রদাহ, অজীর্ণ, হিস্টিরিয়া, হাঁপানি, হিক্কারোগ, গলা ভাঙ্গা, রাজযক্ষ্মা, বাতিক কাস, স্বরযন্ত্র প্রদাহ, মস্তিষ্কের অবসাদ, মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য বা রক্তসঞ্চয়, রক্তস্বল্পতা, রক্তপিত্ত, কলেরা, ওলাউঠা, বিসূচীকা, অর্শ, দাহ ক্রিমি, কর্কট, স্ত্রী ও পুরষের বিভিন্ন ধরনের যৌন রোগ প্রভৃতি রোগের ঔষধ উৎপাদিত হতো।[১০৭(ট)]

সাধনা ঔষধালয়ের ঔষধ তরল, ট্যাবলেড প্রভৃতি ধরনের তৈরি হতো। এই ঔষধালয়ের উল্লেখযোগ্য ঔষধের মধ্যে মকরধ্বজ, চ্যবনপ্রাশ, সারিবাদি সালশা, অশ্বাগন্ধারিষ্ট, অশোকারিষ্ট, অশোকঘৃত, বৃহৎ অশ্বন্ধা, অমৃত পাশঘৃত, বাতফুলান্তক, সর্বজ্বর বটী, বৃহত সর্বজ্বরহর লৌহ, মহালক্ষীবিলাস, বসন্ততিলক, বৃহৎ বাতচিন্তামনি, শ্রীমদনান্দমোদক, শ্রীকামেশ্বরমোদক, শ্বাসহরযোগ, শান্তিবটী, শুক্রসঞ্জীবন, অবালবান্ধবযোগ প্রভৃতি ঔষধ তৈরি হতো এবং ঘরে ঘরে প্রচারিত হতো। এসব রোগ ও ঔষধ সম্পর্কে তার গৃহ চিকিৎসা গ্রন্থে বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

এসব ঔষধ সম্পর্কে জনগণকে জানানোর জন্য বিভিন্ন পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হতো। যেমনটি *ঢাকা প্রকাশে* দেখতে পাওয়া যায়। (*বিজ্ঞাপনের ছবি অভিসন্দর্ভের ছবির অংশে দেয়া হয়েছে)*।

১৯৭১ সালে পাক-হানাদাররা তাকে হত্যা করলে স্বাধীনতার পর তার পুত্র ডা. নরেশচন্দ্র ঘোষ ঔষধালয়ের দায়িত্ব নেন। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে সাধনা ঔষধালয়ের কারখানা ঢাকার গেণ্ডারিয়ার বিশাল জায়গা নিয়ে এখনও চলমান রয়েছে। আর এখান থেকেই সারা দেশে ঔষধ সরবরাহ করা হচ্ছে। এই ঔষধের কারখানাকে কেন্দ্র করে ঢাকায় আয়ুর্বেদ ঔষধের ব্যাপক ব্যবসা চলে। বর্তমানে এই ঔষধের জনপ্রিয়তা এখনও অব্যাহত আছে। কেননা এলোপ্যাথিক ঔষধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থাকলেও আয়ুর্বেদ ঔষধে কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই।

শক্তি ঔষধালয় : ঢাকার আয়ুর্বেদ ঔষধালয়ের মধ্যে আরেকটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান হলো শক্তি ঔষধালয়। এর প্রতিষ্ঠাতা হলেন স্বর্গীয় মথুরা মোহন মুখোপাধ্যায়। তিনি ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৪২ সালে কাশীতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি বি. এ. পাস করে প্রথমজীবনে রোয়াইল জমিদারদের হাইস্কুলে হেডমাস্টারের চাকুরি করেন। পরবর্তীতে ১৯০১ সালে ৮৪/১ স্বামীবাগ রোড, দয়াগঞ্জ, শক্তি ঔষধালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর ঔষধালয়ের প্রস্তুতকৃত ঔষধের ব্যাপক খ্যাতি ছিল এবং সারা বাংলায় বিক্রি হতো। সাধারণত তাঁর ঔষধালয়ে ট্যাবলেড, লিক্যুইড, স্যামি সলিড প্রভৃতি ধরনের ঔষধ তৈরি হতো। শক্তি ঔষধালয়ের উল্লেখযোগ্য ঔষধ হলো— অশোকারিষ্ট, অমৃতরিষ্ট, অভয়রিষ্ট, অর্জ্জুনরিষ্ট, অশ্বগন্ধরিষ্ট, কুটজারিষ্ট, চন্দনাসব, জন্মদ্যারিষ্ট, জীবকাদ্যারিষ্ট ইত্যাদি। এসব ছাড়াও আরো অনেক ধরনের ঔষধ রয়েছে।

এসব ঔষধ ঢাকা থেকে স্টিমারে করে পূর্ববাংলা বা পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জায়গায় পাঠানো হতো। ব্রিটিশ এবং পাকিস্তান আমলে ঢাকার বাদামতলী থেকে স্টিমারে করে শক্তি ঔষধালয়ের ঔষধ কলকাতা, বার্মা পাঠানো হতো। উল্লেখ্য, বার্মায় শক্তি ঔষধালয়ের শাখা ছিল। তবে পাকিস্তান আমলে বার্মায় শক্তি ঔষধালয়ের ঔষধ রপ্তানি বন্ধ হয়ে যায়।[১০৭(ঠ)]

এই সময় দেশীয় ভেষজ দ্রব্য সংগ্রহকারী ও সরবরাহকারী ছিল। যাদের এসব দ্রব্যের উপর বড় ধরনের ব্যবসা ছিল।

তাছাড়া ঔষধ শিল্পের সম্প্রসারণে কিছু প্রতিবন্ধকতা ছিল। যেমন—

১. কাচের বোতল ও কৌটার অভাব ছিল। স্থানীয় কাচের কারখানাগুলোতে এগুলো তৈরি করা হতো না। অপরদিকে কলকাতা থেকে এগুলো আমদানি লাভজনক ছিল না। কেননা অনেক সমস্যা ছিল। এর ফলে ফার্মাসিউটিকল শিল্প নানা ধরনের সমস্যায় পড়তো।

২. অ্যামপুল (Ampouls) : দেশে অ্যামপুল তৈরি হতো না। ফলে বিদেশ থেকে আমদানি করা হতো।

Dhaka University Institutional Repository

৩. গ্লাস অ্যাপারেইটাস (Glass Apparatus) এবং অন্যান্য ল্যাবরেটোরিতে ব্যবহৃত অন্যান্য যন্ত্রপাতি : এগুলো বিদেশ থেকে আমদানি করতে হতো। ফলে ল্যাবরেটোরি ও ফ্যাক্টরিগুলো সজ্জিতকরণের ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়ত। কেননা বিদেশ থেকে সরাসরি আমদানি করতে তারা বিপুল পরিমাণে টাকা বিনিয়োগ করতে আগ্রহী ছিল না। এবং এগুলো স্থানীয় বাজারে পাওয়া যেত না। প্রধান কারণগুলোর মধ্যে একটি হলো বিদ্যমান শিল্পের কার্যক্রমের উন্নতি সাধানের জন্য এবং শিল্পের বিস্তারের জন্য নতুনদের আগমনের ক্ষেত্রে সাহসী উদ্যোগের অভাব।

৪. **এ্যালকোহল (Alcohol) :** ফার্মাসিউটিকল শিল্পের প্রধান কাঁচামাল হলো এ্যালকোহল। দর্শনার Messers Carew & Co. প্রতিদিন প্রায় ১০০০ গ্যালন এ্যালকোহল উৎপাদন করত। কিন্তু এই কোম্পানির প্রতিদিন প্রায় ৫০০০ গ্যালন এ্যালকোহল উৎপাদনের ক্ষমতা ছিল। সুতরাং এই কাঁচামালের কোনো অভাব ছিল না।

৫. **বিবিধ সমস্যা :** দেশীয় ফার্মাসিউটিকল শিল্প ভারত এবং অন্যান্য বিদেশি দ্রব্যের সাথে প্রতিযোগতিার সম্মুখীন হতো। ভারতের ফার্মাসিউটিকল শিল্পের উৎপাদিত দ্রব্যকে দেশীয় কর থেকে অব্যাহতি দেয়া হতো। ফলে দ্রব্যের দাম কমে যেত। এর ফলে স্থানীয় দ্রব্যের চেয়ে কমদামে পাওয়া যেত বলে ভারতীয় দ্রব্য সহজেই পূর্ববাংলার বাজার দখল করে ফেলে। বিষয়টিকে নিম্নে বিশ্লেষণ করা হলো —

ক. **ভারত :** ১. ভারতের ড্রাগ ও মেডিসিনের ক্ষেত্রে কোনো আমদানি-রপ্তানি শুল্ক ছিল না। ২. ফলে পাকিস্তানে সব ধরনের কোহল, আরোগ্যকর ভেষজ (medicinal) রপ্তানির উপর কোনো শুল্ক আরোপ করা হতো না। (1. No Customs duty at the exporting end, and (2) No provincial excise duty on all spirituous medicinal preparations intended for export to Pakistan)

খ. **পাকিস্তান :** ৩. অপরদিকে পাকিস্তানে সব ধরনের কোহল, মেডিসিনল বা আরোগ্যকর ভেষজের উপর মূল্য অনুযায়ী ২০% আমদানি শুল্ক দিতে হতো। আবার অন্যান্য ঔষধের ক্ষেত্রে মূল্য অনুযায়ী ৩৪% কর দিতে হতো। (3. Pakistan Customs import duty charged at the rate of 20 per cent advalorem on all spirituous medicinal preparation and at the rate of 34 per cent advalorem on all other drugs and medicines)

আরোগ্যকর ভেষজ মেডিসিনলের প্রতি এল.পি গ্যালনের উপর ৫ রুপি হারে শুল্ক ধরা হয় এবং প্রসাধনের প্রতি এল.পি গ্যালনের উপর ৪০ রুপি শুল্ক ধরা হয়।[১০৮]

১৯৫০-এর দশকের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঔষধ সম্পর্কিত উপাদান ও ফার্মাকোপিয়ার নাম বাংলা নামসহ দেয়া হলো। উল্লেখ্য এগুলো ঔষধ শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-৩২

Sl. No.	Name	Bengali Names
1.	*Aconitum*	Bisha
2.	*Aloc Vera/ Aloc Indica*	Ghrita Kumari
3.	*Archis Hypogaca*	China Badam
4.	*Artemisia Maritima (Wormseed Santonica)*	Kirmala (Hind)
5.	*Atropa Belladonne*	Yebruj
6.	*Camellia Theifera* (The Tea Plant)	-
7.	*Coffea Arabica* (The Coffee Plant)	-
8.	*Cannabis Sativa*	Ganja, Bhang, Charas
9.	*Carum Copticum*	Jowan
10.	*Carum Carui*	Jira
11.	*Cuminum Cyminum*	Jira
12.	*Caryophyllus Aromaticus*	Lavanga
13.	*Cassia Angustifolia*	Sona Mukhi
14.	*Chenopodium Ambrosoides*	Kukursunga
15.	*Cinchona Cortex*	-
16.	*Bhumea Lacera*	-
17.	*Cinnamon Zeylanicum*	Dalchini
18.	*Citrullus Colocynthis*	Makhal
19.	*Citrus Medica var Acida*	Nebu
20.	*Cirus Medica var Limonis*	Pahari Nebu, Gambir, Gora Nebu
21.	*Calchicum Luteum*	Surinjan
22.	*Datura Stramonium*	Sada Datura
23.	*Digitalis Purpurea*	-
24.	*Elettaria Cardamomum*	Chhoti Elachi
25.	*Amomum Subulatum*	Bara Elachi

Dhaka University Institutional Repository

26.	*Ephedra Vulgaris*	Amsania, Butsher (punj)
27.	*Foeniculum Vulgare*	Karu, Kutki
28.	*Gentiana Kurroo*	Pan Mouri, Mouri
29.	*Glycyrrhiza Globa*	Jastimodhu
30.	*Hemidesmus Indicus (Indian Sarsaparilla)*	Anantamul
31.	*Hyoscyamus Nigar*	Kharasani Ajowan
32.	*Iopaea Hederacea*	Kaladanah
33.	*Mentha Arvenis*	Pudina
34.	*Myristica Fragrans*	Joyphal
35.	*Papaver Somniferum*	Posto-dheri
36.	*Pimpinehia Anisum*	Muhuri, Mithajira
37.	*Pinus Longifolia*	-
38.	*Piper Cubeba*	Kabab Chini
39.	*Podophyllum Emodi (India Posophyllum)*	Papri
40.	*Psychotria Ipacauanha*	Antamul
41.	*Rheum Emodi* (Indian Rhubarb)	Revandchini
42.	*Ricinus Communis*	Bherenda
43	*Rosa Damascena*	Golap-Phul
44.	*Santalum Album*	Sada Chandan
45.	*Strychnos Nux Vomica*	Kuchila
46.	*Swertia chirata*	Chirata
47.	*Urginea Indica*	Kande, Jongli-Piyaz
48.	*Scilla Indica*	Suphadie-khus
49.	*Valeniana Wallichii*	Tagar
50.	*Zingiber Officinale*	Ada

Dhaka University Institutional Repository

Drugs of Vegetable Origin

সারণি-৩৩

Sl. No.	Name	Bengali name
1.	*Abroma Angusta*	Ulat Kambal
2.	*Abrus Precatorims*	Kunch
3.	*Acorus Calemus*	Bach
4.	*Adhatoda Vasica*	Vasaka
5.	*Aegle Marmelos*	Beal
6.	*Allium Sativaum*	Rasun
7.	*Alpinia Galanga*	Kulinjan
8.	*Alstonia Scholaris*	Chhatim
9.	*Andrographis Paniculata*	Kalmegh
10.	*Areca Catechu*	Gue, Supari
11.	*Argemone Mexicona*	Shial kanta
12.	*Balsamodendrom Mukul*	Mukul
13.	*Bassia Latiffolia*	Maua, Mahua
14.	*Bassia Longifolia*	-
15.	*Berberis Vulgaris*	Kashmal (punji)
16.	*Boerhavia Diffusa*	Punarnaba
17.	*Butea Frondosa*	Palas
18.	*Caesalpinia Bonducella*	Nata Karanja
19.	*Calotropis Gigantea*	Akanda
20.	*Carica Papaya*	Papya
21.	*Caphalandra Indica*	Telakucha
22.	*Crocus Sativas*	Jafran
23.	*Luphorbia Pilulifera*	Bura Keru
24.	*Hedyotis Auricularia*	Muttia Lata
25.	*Harpestis Monniera*	Brinmisak
26.	*Holarrhena Antidysentrica*	Kurchi

Dhaka University Institutional Repository

27.	*Mallotus Philippinensis*	Kamila
28.	*Melia Azadirachta*	Nim
29.	*Moringa Pterygosperma*	Sojna
30.	*Peganum Harmala*	Isband
31.	*Piper Betle*	Pan
32.	*Pistacia Integerrima*	Kakra-Sringi
33.	*Plantago Ovata*	Isabgol
34.	*Plumbago Rosea*	Lalchita
35.	*Plumbago Zeylanica*	Chita
36.	*Pongamia Glabra*	Dhar Karanja
37.	*Psoraba Corylifolia*	Lata Kasturi
38.	*Saraca Indica*	Asoka
39.	*Sussurea Lappa*	Pachak
40.	*Semecarpus Anacardium*	Bhelatuki
41.	*Sida Cordifolia*	Brela, Bala
42.	*Symplocos Racemosa*	Lodh
43.	*Hydrocarpus Wightiana*	-
44.	*Terminalia Arjuna*	Arjun
45.	*Thevetia Neriifolia*	Kolkaphul
46.	*Toddalia Aculeata*	Kada-todali
47.	*Tribulus Terrestris*	Gokhuri
48.	*Vernonia Anthelmintica*	Somraj
49.	*Vitex Peduncularis*	Boruna

উৎস : *Monthly Survey of Economic Condition in East Bengal*, January, 1952, pp. 11-13.

সুতরাং পঞ্চাশের দশকে পূর্ব পাকিস্তানের ফার্মাসিউটিকল শিল্প মূলত আমদানির উপর নির্ভরশীল ছিল। দেশে যেসমস্ত শিল্প ছিল তা এদেশের চাহিদা মিটাতে পারত না এবং উন্নতমানের ঔষধ তৈরি করতে পারত না। উপরন্তু কাঁচামাল, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাব ছিল। আধুনিক সরঞ্জাম এবং উন্নত প্রশিক্ষণের অভাব ছিল বিধায় দক্ষ কর্মী ছিল না। উচ্চহারে আমদানি-রপ্তানি শুল্কের কারণে বিদেশি দ্রব্যের সাথে দেশীয় ঔষধের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়ে। তাছাড়া এ শিল্পের যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও

Dhaka University Institutional Repository

সরকারের অবহেলা ছিল। তাই এই শিল্পের উন্নয়নের জন্য সরকারি রিপোর্টে বলা হয়—Lifting of excise duty on alcohol for Pharmaceutical Industries, i.e., we should also issue duty free alcohol to our industrialists."[১০৯]

আরো বলা হয়—"The Pakistan Tariff Commission will shortly examine the position and details with a view to giving protection to this industry from foreign competition".[১১০]

সরকারি আরেকটি রিপোর্টে দেখতে পাওয়া যায় যে, ১৯৫৪ সালে ঢাকায় ৩টি কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি ছিল, এগুলো হলো[১১১]—

1. New Light Chemical Industries – 28, M.C. Ray Road, Peelkhana, Dacca.
২. The Central Chemical Industries- Tejgaon Industrial Area, Dacca.
3. G.A. Company, Ditto.

আবার একই রিপোর্টে Medical and Pharmaceutical-এর ক্ষেত্রে ৩টি ইন্ডাস্ট্রির উল্লেখ করা হয়:

1. Albert David (Pak.) Ltd. Laboratories, 100 Dinanth sen Road, Gandaria, Dacca.
2. Sakti Aushodhalaya, 84, Shawmibagh Road, Dacca.
3. Sadhona Aushadhalaya Ltd., 71 and 93A, Dinanth Sen Road, Faridabad, Dacca.

১৯৫৮ সালের একটি রিপোর্টে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত ফার্মাসিউটিকল ও কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রির ব্যবহৃত শক্তি, বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা, প্রতিদিন গড় শ্রমিকের সংখ্যার হিসাব পাওয়া যায়।

যা নিম্নে বর্ণিত হলো[১১২]—

সারণি-৩৪

Chemicals

Sl. No.	Names and Addresses of the Factories	Power used	Annual production capacity	Average no. of workers employed daily during the year 1956
1.	New Light Chemical Industries, Peelkhana, Dacca.	Steam	Manufacture of tinctures spirits, syrups ect. worth Rs.5 Lakhs	51

Dhaka University Institutional Repository

Ayurvedic Medicines

Sl. No.	Name and Adress of Factory	Power used	Annual production capacity	Average no. of workers employed daily during the year 1956
1.	Sadhana Oushadhalay, Dinnanth Sen, Road, Dacca	Electricity	Medicines, worth Rs.17 lakhs	Men and Women 100

Medicines

Sl. No.	Name and Address of Factory	Power used	Annual production capacity	Average no. of workers employed daily during the year 1956
1.	Albert David(Pak.) Ltd., 100,Dinanath Sen Road, Faridabad, Dacca	Electricity	Injection, Tablets, Liquid, Vitamin B Complex and some other Syrups, worth Rs. 800,000	45

সুতরাং পূর্ব পাকিস্তানে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক/ কেমিক্যাল দ্রব্য উৎপাদনের সম্ভাবনা ছিল। যা এই এলাকার জনগণের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু পাকিস্তান সরকার এ শিল্পের প্রতি তেমন যত্নশীল ছিলেন না। ফলে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (First Five Year Plan) পর্যন্ত রাসায়নিক শিল্পের/ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রির বিকাশ ধীর গতিতে ছিল। এরপর East Pakistan Industrial Development Corporation-এর উন্নয়নের উপর জোর দেয় এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময়ে (Second Plan Period) ৪টি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। এগুলো হলো—

1. Pakistan Pharmaceutical Industry Ltd., Tongi, Dacca.
2. Streptomycin Factory, Dacca.
3. DDT Factory, Chittagang.
4. Polythene Bag M/g Unit NGFF, Fenchuganj (Sylhet).

Dhaka University Institutional Repository

1. **Pakistan Pharmaceutical Industry Ltd :** EPIDC সহযোগিতায় ইংল্যান্ডের M/s. May & Baker পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকা শহর থেকে একটু দূরে টঙ্গীতে The Pakistan Pharmaceutical Industry স্থাপন করে। এই প্রকল্পের জন্য খরচ করা হয় ৭.৫০ মিলিয়ন রুপি। যার ৪০% শেয়ার তথা ৩.০০ মিলিয়ন রুপি EPIDC-এর মাধ্যমে দেয়া হয়। এই প্রকল্পের দুটি পর্যায় ছিল, প্রথম পর্যায়ে আমদানিকৃত কাঁচামাল থেকে ম্যালেরিয়া বিরোধী ও অন্যান্য ঔষধ তৈরি করা। আর এর উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ২৩০ মিলিয়ন ট্যাবলেট এবং ১০ মিলিয়ন অ্যাম্পুল (Ampoule বা ইনজেকশনে ঔষধ ধারণকারী কাচের ছোট আধার বিশেষ)[১১৩]। দ্বিতীয় পর্যায়ের উদ্দেশ্যে ছিল স্থানীয় কাঁচামাল থেকে ঔষধ তৈরি করা।

2. **Streptomycin Factory, Dacca :** এই ফ্যাক্টরির আনুমানিক ব্যয় ছিল ২১.৪৩ মিলিয়ন রুপি। এই ফ্যাক্টরিকে সরকার Tuberculoses(T.B) বা যক্ষার চিকিৎসার ও রোগ নিরাময়ের ঔষধ তৈরির জন্য অনুমোদন করে। কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা ধরা হয় ১৫ টন (প্রতি বছর)। পরে ২০ টন বৃদ্ধি করার উদ্যোগ নেয়া হয়। এর ফলে মোট খরচ ধরা হয় ২৬.৪০ মিলিয়ন রুপি।[১১৪]

সুতরাং কেমিক্যাল ও ফার্মাসিউটিকল দ্রব্য উৎপাদন ছিল পূর্ব পাকিস্তানের জন্য একটি নতুন শিল্প। স্বাধীনের (১৯৪৭) আগে এরূপ কারখানা ঢাকায় ছিল না। দেশভাগের পরে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত কারখানা ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়। যা ১৯৬৯ সালের *ঢাকা গেজেটিয়ারে* উল্লেখ করা হয়[১১৫]—

Chemicals :

1. Bengal Industries Ltd., Tejgaon.
2. Standard Chemical Industries, Tejgaon.
3. Alpha Chemical Industries, Tejgaon.

Pharmaceutical and Drugs :

1. Acme Laboratories, Narayanganj.
2. Amico Laboratories, Tejgaon.
3. Bactro Clinical Laboratories, Tejgaon.
4. Pharma Pak Laboratories, Tejgaon.
5. Standard Chemical Industries, Tejgaon.
6. Albert David (Pak.) Ltd., Dacca.
7. Gf. Bosco (Pak.) Ltd., Dacca.

এই ফার্মাসিউটিকল ল্যাবরেটোরিগুলোতে প্রধানত সংক্রামক রোগ সংক্রান্ত ঔষধ গুঁড়া এবং তরল (Powder and liquid), পানি বিশুদ্ধকরণ (distilled water), সিরাপ Tonics (শক্তিদায়ক ও বলবর্ধক ঔষধ) ও অন্যান্য পেটেন্টের ঔষধ তৈরি হতো।

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং বলা যায় যে, ১৯৪৭ সালের পর ঢাকাসহ সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে এই শিল্প প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়। তবে এই উদ্যোগ খুবই সীমিত। কেননা বেশিরভাগ ঔষধ ও কাঁচামাল বাইরে থেকে আমদানি করা হতো। ফলে পাকিস্তান আমলে এ শিল্পের উন্নয়ন ছিল ধীর গতিতে। ১৯৭১ সালে দেশ যখন স্বাধীন হয় তখন ফার্মাসিউটিকল শিল্পের দুর্বল ভিত উত্তরাধিকার সূত্রে পায়। স্বাধীনের পরে ফার্মাসিউটিকল শিল্পক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত জটিলতার কারণে বৈদেশিক বিনিয়োগ অনুমোদন করে। ফলে এ শিল্পে পূর্বের মত বিদেশি আধিপত্য বেড়ে যায়। ১৯৮১ সাল পর্যন্ত দেশে ১৬৫টি লাইসেন্সধারী কোম্পানি ছিল। কিন্তু স্থানীয় উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রণ করত ৮টি বহুজাতিক কোম্পানি— যারা ৭৫% ঔষধ উৎপাদন করত অন্যদিকে ২৫টি মাঝারি আকারের যে স্থানীয় কোম্পানি ছিল তারা প্রায় ১৫% উৎপাদন করত। অন্যান্য ছোট ১৩৩টি কোম্পানি ১০% উৎপাদন করত।[১১৬]

হোসিয়ারি শিল্প : ঢাকার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হলো হোসিয়ারি শিল্প। ১৯০৮ সালের পূর্ব পর্যন্ত ঢাকা এদেশের মুখ্য হোসিয়ারি উৎপাদনের কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল। এই সময় হাতে চালিত যন্ত্র দিয়ে গেঞ্জি ও মোজা তৈরি শিল্পের সূচনা হয়। দেশভাগের আগে তাঁতের কাপড়ের মত হোসিয়ারি দ্রব্যেরও বিশাল বাজার ছিল। পাটুয়াটুলির গুপ্তা এ্যান্ড কোম্পানিই ছিল প্রথম প্রতিষ্ঠান। দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে জনৈক উকিলের পুত্র দ্বারা পরিচালিত হতো। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ছিল— ফরাসগঞ্জ 'দাস ব্রাদার্স', ওয়ারীতে 'দে সরকার এ্যান্ড কোম্পানি', 'বেঙ্গল হোসেয়ারি সাপ্লাই এ্যান্ড কোম্পানি', 'দে এ্যান্ড কোম্পানি', 'স্বদেশি শিল্পালয়', 'গাঙ্গুলি এ্যান্ড কোম্পানি' এবং পাটুয়াটুলিতে ছিল 'বাসু রায় চৌধুরী এ্যান্ড কোম্পানি'। এসব কারখানার উৎপাদিত দ্রব্যের বাজার ছিল। কিন্তু বিদেশ থেকে আমদানি করা সূক্ষ্ম গেঞ্জি ও মোজা দামে সস্তা ছিল। ফলে বিদেশি দ্রব্য বাজার দখল করে ফেলে। তাই এ সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান খুব লাভজনক বলে প্রমাণ করতে পারে নি। এই শতাব্দীর (বিশ) বিশ ও ত্রিশ-এর দশকে বিভিন্ন বাজারে পাবনার উৎপাদিত সামগ্রী উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। অন্যদিকে কলকাতার মেশিনে তৈরি হোসিয়ারি সামগ্রী উন্নত থাকায় ঢাকার পূর্বের ব্যবসা অনেকটা বিনষ্ট হয়। কিন্তু দেশভাগের পর ঢাকা তার পূর্ব অবস্থা ফিরে পায় এবং নারায়ণগঞ্জকে কেন্দ্র করে এই শিল্পের প্রসার ঘটে। এখানকার সমস্ত কারখানাই যন্ত্রচালিত ছিল। এখানকার মিলে উৎপাদিত দ্রব্য সহজেই দেশের প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটতে পারত। নারায়ণগঞ্জের বাবুরহাটকে বলা হতো পূর্বদেশের ম্যানচেস্টার। সুতরাং প্রায় (১৯০১-৫০) ৫০ বছরের ব্যবধানে এই শিল্পের সম্প্রসারণ ঘটে।

১৯৪৮ সালের নথিতে উল্লেখ করা হয় যে, এই সময় ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে হোসিয়ারি মিলের/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ১৪০টি এবং পাবনায় ছিল ৫৭টি ইউনিট। তাছাড়া এই শিল্পের কারখানাগুলো বিক্ষিপ্তভাবে অন্যান্য জেলায় ছড়িয়ে পড়েছিল। যেমন— বগুড়া, রংপুর ১টি করে কারখানা, খুলনায় ৩টি এবং কুষ্টিয়ায় ৫টি ; ১৫০০-এর বেশি লোক এ শিল্পে নিয়োজিত ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

এই নথিতে হোসিয়ারি শিল্পকে ৩ শ্রেণিতে উল্লেখ করা হয় [১১৭]—

(a) Hosiery Mills with complete units:— These Mills have got knitting machines with necessary chain and over- lock machines for converting yarn into finished vests.

(b) Hosiery Knitters with incomplete units:— They simply prepare Hosiery fabrics which are sold to the Hosiery tailors for conversion into finished.

(c) Hosiery tailors:— They have chain and overlock machines only for sewing finished vests from Hosiery thens which they purchase from the Hosiery Mills and Knitters.

এছাড়া নথিতে ঢাকাসহ সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের হোসিয়ারি শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা ও ব্যয়ের একটি হিসাব পাওয়া যায়। যা নিম্নে দেয়া হলো [১১৮]—

সারণি-৩৫

Center	Yarn consumed in Ibs.	Production in dozen
Dacca & Narayanganj	90,000	54,000
Pabna	32,000	10,500
Rangpore	8,640	2,880
Bogra	5,469	1,823
Khulna	9,375	3,125
Kushtia	6,450	2,150
Total	**1,51,934**	**74,478**

১৯৪৮ সালের এই নথিতে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের ১০১টি হোসিয়ারি মিলের তালিকা এবং মূলধনের পরিমাণ ও শ্রমিকের সংখ্যার হিসাব দেয়া হয়। উল্লেখ্য ১০১টি হোসিয়ারি মিলের মধ্যে ঢাকা শহরে ১৮টি এবং ৯৩টি নারায়ণগঞ্জে অবস্থিত। নিম্নে ঢাকা শহরের মিলের তালিকা দেয়া হেলা[১১৯]—

সারণি-৩৬

Sl. No.	Name of Hosiery Mills	Capital outlay (Rs.)	Manpower employed
1.	City Hosiery, Gandaria, Dacca	25,000/-	8
2.	Dacca Hosiery,	30,000/-	10

Dhaka University Institutional Repository

	Gandaria, Dacca		
3.	Raja Hosiery, Kapurianagar, Dacca	40,000/-	15
4.	New Raja Hosiery, Kapurianagar, Dacca	40,000/-	9
5.	Binaya Hosiery, Kapurianagar, Dacca	35,000/-	7
6.	Deluxe Hosiery, Nababpur, Dacca	30,000/-	11
7.	Maya Hosiery, Nababpur, Dacca	40,000/-	14
8.	Shakti Hosiery, Shamibag, Dacca	50,000/-	8
9.	Bosak Hosiery, Nababpur, Dacca	45,000/-	12
10.	New Sakti Hosiery, Gandaria, Dacca	40,000/-	13
11.	Hori Mohan Netting Mills, Faridabad,Dacca.	26,000/-	11
12.	Surma Valley Hosiery, Narinda, Dacca.	25,000/-	10
13.	Provati Hosiery, Kabiraj Lane, Dacca.	50,000/-	10
14.	Eastern Agency, Patuatully, Dacca	40,000/-	10
15.	Kamal Hosiery, Gandaria, Dacca	35,000/-	9
16.	Narayan Hosiery, Nababpur, Dacca.	30,000/-	11
17.	Lords Hosiery, Nababpur, Dacca.	35,000/-	15
18.	Mukunda Hosiery, Forashgonj, Dacca.	40,000/-	11

Dhaka University Institutional Repository

এই শিল্প সম্প্রসারণের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে সরবরাহের স্বল্পতা। চল্লিশের দশকে জেলা ও মহকুমার সরবরাহকারী নিয়ন্ত্রণকারীদের মাধ্যমে বস্ত্রশিল্পের পরিচালক নির্ধারিত দামে সুতা সরবরাহ করত। এই সময় সুতা সরবরাহ ছিল অপর্যাপ্ত এবং মোট চাহিদার পাঁচভাগের একভাগ সুতা পাওয়া যেত। ফলে উৎপাদন হ্রাস পেত এবং দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পেত। অপরদিকে পূর্ব পাকিস্তান তথা ঢাকার হোসিয়ারি কারখানার মালিক এবং বয়নকারীরা ভারত থেকে আমদানিকৃত হোসিয়ারি দ্রব্যের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারত না। যেহেতু স্থানীয় সুতার কারখানাগুলো প্রয়োজনীয় সুতা তৈরি করতে পারত না। তাই বিদেশ থেকে হোসিয়ারি আমদানি করা হতো।

কলকাতা থেকে রাসায়নিক দ্রব্য এবং অন্যান্য দ্রব্য যেমন— ব্লিচিং পাউডার, ওয়াশিক (Soda-ash), সালফিউরিক এসিড (Sulphuric Acid), রং (Dye-staff), সুই এবং কার্ডবোর্ড (Needles and straw wood) ইত্যাদি এই শিল্পের জন্য প্রায়ই দরকার হতো এবং এগুলো সহজলভ্য ছিল না। কিন্তু এগুলোর উপর আমদানি নিষেধাজ্ঞার কারণে এই শিল্প অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়। তাই স্থানীয় প্রতিনিধিদের মাধ্যমে বিদেশ থেকে এই দ্রব্যগুলো আমদানি করা হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সুতা সরবরাহের স্বল্পতার কারণে ১৯৪৮ সালে হোসিয়ারি দ্রব্যের উৎপাদন স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী যথেষ্ট ছিল না, ফলে বিপুল পরিমাণ হোসিয়ারি দ্রব্য কলকাতা থেকে তুলনামূলকভাবে সস্তায় আমদানি করা হতো।

আবার ১৯৫৮ সালের আরেকটি রিপোর্টে ১৯৫৬ সালের ঢাকা শহরে ২টি হোসিয়ারি মিলের উৎপাদনক্ষমতা, ব্যবহৃত শক্তি এবং প্রতিদিন গড় শ্রমিকের সংখ্যার হিসাব উল্লেখ করা হয়[১২০]—

সারণি-৩৭

Sl. No.	Name of Hosiery Factory	Power used	Annual production capacity	Average No. of workers employed daily during the year 1956
1.	City Hosiery Factory, Faridabad, Dacca	Electricity	35,000 dozen	4
2.	Pyramid Hosiery, Faridabad, Dacca	-Do-	50,000 dozen	22

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭০-এর দশকের (১৯৬৯) পূর্বে বা ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে মোট ১৮৬টি হোসিয়ারি কারখানা ছিল। এর বেশিরভাগ কারখানা ছিল নারায়ণগঞ্জে এবং কিছু ঢাকা শহর ও তার আশেপাশে প্রতিষ্ঠিত হয়।

সুতরাং দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, দেশভাগের আগে থেকেই ঢাকা হোসিয়ারি শিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল। পরবর্তীতে বিভিন্ন কারণে (সুতার স্বল্পতা, রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞা, বিদেশি দ্রব্যের অবাধ আমদানি, সূক্ষ্ম ও দামে সস্তা বিদেশি দ্রব্য) শিল্পের বিকাশ ব্যাহত হয়। দেশভাগের পরে ঢাকা শহর ও নারায়ণগঞ্জকে কেন্দ্র করে আবার শিল্পের অবাধ প্রসার ঘটে। এখানকার কারখানাগুলো দেশীয় চাহিদা মেটায়। যা ঢাকাসহ সমগ্র দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রি

ঢাকার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হলো প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রি। দেরিতে হলেও এই শিল্প ঢাকায় প্রচলিত হয়েছিল। ধনী গরিব সকলে প্লাস্টিকের তৈরি গৃহসরঞ্জামাদি ব্যবহার করত। এমনকি প্রতিদিন ব্যবহৃত দ্রব্যসামগ্রী যেমন, চুড়ি, হাতব্যাগ, ভ্যানিটি ব্যাগ, খেলনা, বোতাম, পানপাত্র, পানি বহনকারী পাত্র এবং অন্যান্য দ্রব্য প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি হতো। ১৯৬৯ সালে ঢাকায় নিম্নবর্ণিত প্লাস্টিক শিল্প ছিল —

Plastic Bangles :

1. Moonlight Plastic Industries, Chawk Circular Road, Dacca.
2. Royan Plastic Industries, Chawk Circular Road, Dacca.
3. Sikandar Industries, Chawk Circular Road, Dacca.
4. Star Plastic Industries, Chawk Circular Road, Dacca.

Plastic Containers :

1. Dewan Plastic Industries, Nanda Kumar Dutta Road, Dacca.

Plastic General Goods :

1. Dacca Plastic Industries, Nanda Kumar Dutt. Road, Dacca.
2. East Pakistan Industries, Tejgaon, Dacca.
3. Habib Plastic Industries, Chawk Circular Road, Dacca.
4. Eureka Engineering and Supply, Patuatuli, Dacca.
5. Franq Industries, chawk Circular Road, Dacca.
6. Haque Plastic Industries, Armenian street, Dacca.
7. Jahangir Button Manufacturer, Haji Rahim Bux Lane.

Dhaka University Institutional Repository

8. Kader Plastic Industries, Aga. Nawab Dewri.
9. Noor Engineering and Manufacturing Company, Jagannath Shaha Road.
10. Pakistan Industrial Corporation, Tejgaon,Dacca.
11. Universal Plastic Corporation, Bangshal, Dacca.

উৎস : S.N.H. Rizvi: *East Pakistan District Gazetteers, Dacca*, 1969, pp. 212-13.

১৯৫৬ সালে Dewan Plastic Industries-এর উৎপাদনক্ষমতা ছিল ৪,৮৮৬ গ্রেটার (grater), প্রতিদিন গড় শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৬০ জন এবং কারখানায় বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হতো।[১২০(ক)]

চালের কল

ঢাকায় বিশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় দশকের দিকে কোনো চালের কারখানা ছিল না। কিন্তু ১৯৪০-এর দশকে কিছু চালের মিলের নাম পাওয়া যায়। সরকারি একটি নথিতে যেসব চালের মিলের নাম, মূলধনের পরিমাণ ও শ্রমিকের সংখ্যা উল্লেখ করা হয় তা নিম্নে বর্ণিত হলো—

সারণি-৩৮

Sl. No.	Name of Rice Mills	Capital outlay (Rs)	Manpower employed
1.	Samsuddin Rice Mills, Badanganj, Dacca	10,000/-	65
2.	Hazi Ahmed Ali, Badanganj, Dacca	15,000/-	65
3.	Nabakumar Hiralal Mills, Badanganj, Dacca	30,000/-	70
4.	Dr. Siddique Rice Mills, Badanganj, Dacca	15,000/-	65
5.	Sri Brindaban Rice Mills	30,000/-	85
6.	Goberdhan Rice Mills	20,000/-	55
7.	Sree Durga Rice Mills, Badanganj, Dacca	15,000/-	55

Dhaka University Institutional Repository

8.	Sree Gopal Rice Mills, Hariharpur, Dacca	8,000/-	25
9.	Radha Rani Rice Mills	8,000/-	35
10.	Sree Krishna Rice Mills, Hariharpur, Dacca	8,000/-	25
11.	Victoria Rice Mills	8,000/-	25
12.	Tarpasha Rice Mill, Tarpasha, Dacca	9,000/-	25

উৎস : *B Proceedings*, B # 07, File No.2I of 1948, Sub : Industrial Policy, Branch : Industry, Department C.L. & I, 1948, p. 24

আরেকটি সরকারি রিপোর্টে দেখা যায় যে, Victoria Rice Mills-এর বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ১২০০ মণ, প্রতিদিন প্রায় ৭ জন শ্রমিক কাজ করত এবং এই মিলে বাষ্পীয় শক্তি ও তেল ব্যবহৃত হতো।[১২১] ১৯৫০-এর দশকে Zinzira Industrial Corporation নামে জিঞ্জিরা বাজারে অবস্থিত আরেকটি চালের কলের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু উৎপাদন ক্ষমতা ও মূলধনের পরিমাণ সম্পর্কে জানা যায় নি।

এছাড়া আরো কিছু কারখানা গড়ে ওঠে। এগুলো ১৯৬০-এর দশকে শুরু হয়। নিম্নবর্ণিত এই কারখানাগুলো হলো —

1. Babul Biscuit Company, Hatkhola.
2. Baby Biscuit Company, Champatali.
3. Haque Brothers, Imamganj.
4. Kash Confectionery, Jinnah Avenue.
5. Kahinoor Food Products, Taherbag.
6. Light Biscuit Factory, Bonogram Lane.
7. Nabisco Biscuit and Bread Factory, Tejgaon Industrial Area.
8. Argosy Conserves, Dacca.
9. Noor Industries, Dacca.
10. Samson Fruit Products, Dacca.

১৯৫৮ সালের সরকারি একটি রিপোর্টে নাবিস্কো, বেবি বিস্কুটের কারখানায় ব্যবহৃত শক্তি, বার্ষিক উৎপাদনের পরিমাণ ও প্রতিদিন গড় শ্রমিকের সংখ্যার একটি হিসাব পাওয়া যায়[১২২]।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-৩৯

Sl. No.	Name of Biscuits and Confectionary Industry	Power used	Annual production capacity	Average No. of Workers employed daily during the year 1956
1.	Baby Biscuits Co., Chawk Bazar, Dacca	Electricity	9,720 maunds biscuits	40
2.	Nabisco Biscuit and Bread Factory, Tejgaon, Dacca.	-Do-	Manufacture of biscuits and breads (1500 Tons)	105
3.	Empire Confectionary, works, Sutrapur, Dacca	Electricity	Lozenge worth Rs. 50,000	30

কিছু এলুমিনিয়াম ও অন্যান্য ধাতুর (Metal) কারখানা গড়ে ওঠে। সরকারি রিপোর্টে এসব কারখানার উৎপাদনক্ষমতা, ব্যবহৃত শক্তি এবং ১৯৫৬ সালের শ্রমিকের গড় সংখ্যার হিসাব পাওয়া যায় যা নিম্নরূপ[১২৩]—

সারণি-৪০

Sl. No.	Name of Metal Industries	Power used	Annual production capacity	Average No. of workers employed daily during the year 1956
1.	Lalbag Metal Industries, 214, Industrial Area, Dacca	Diesel	Worth Rs. 1,14820	48
2.	Rahim Metal Industries, 249, Industrial Area, Tejgaon, Dacca	Diesel oil	200 tons of aluminium sheet and utensils	143
3.	Metal Products, 144, Nawabpur Road, Dacca	Electricity	Aluminium utensils worth Rs. 600,000	28

Dhaka University Institutional Repository

4.	Metal Products, 144, Nawabpur Road, Dacca	-Do-	Aluminium utensils, worth Rs. 6 lakhs	28
5.	Pak Metal Industrial, Dacca, 233 Industrial Area, Tejgaon.	-Do-	-	28

সারণি-৪১

Sl. No.	Name of Aluminium Works	Power used	Annual production capacity	Average No. of workers, employed daily during the year 1956
1.	Hardeo Glass and Aluminium Works, 43/1, Hatkhola Road, Dacca	Electricity	Product Aluminium 1,200 tons, Enamel 360 tons, silicate 2,400 tons	134
2.	E. I Atcha Bros, 183, Industrial Area, Tejgaon, Dacca	Diesel	2,88,000 lbs	18
3.	Dacca Aluminium Works, Imamganj, Dacca	Electricity	2,50 tons Aluminium ware	52
4.	Dacca Aluminium Works, 17, Imamganj, Dacca	-D0-	1000 tons of Aluminium ware	59
5.	East Pakistan Aluminium and Iron Mg. Co., P.o. Faridabad, Dacca	Electricity and diesel	225 tons of Aluminium ware (single shift)	50
6.	Pakistan Aluminium Works, 6, Mogoltuli, Dacca	Diesel Engine	160 tons of Aluminium ware	65
7.	PakistanAluminium Karkhana, 30/2, Debidas Ghat, Dacca	-Do-	170 tons Aluminium ware	50
8.	Kohinoor Aluminium Works, Mirpur, Dacca	-Do-	3300 mds Aluminium ware	39

উল্লেখ্য যে, এসব প্রতিষ্ঠানের মালিকের নাম পাওয়া যায় নি বা জানা যায় নি ।

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ব পাকিস্তানের রাবার শিল্পও ছিল একটি নতুন শিল্প। দেশভাগের আগে ঢাকায় কোনো রাবার শিল্প ছিল না। দেশভাগের পরে ঢাকায় রাবার কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৮ সালের একটি সরকারি রিপোর্টে এমনি কয়েকটি রাবার কারখানার উৎপাদনক্ষমতা ও ব্যবহৃত শক্তি ও ১৯৫৬ সালে শ্রমিকের গড় হিসাব পাওয়া যায়[১২৮]—

সারণি-৪২

Sl. No.	Name of Rubber Factory	Power used	Annual production capacity	Average No. of workers employed daily during the year 1956
1.	Pakistan Rubber Manufacturer Ltd., Narayanganj Road, Dacca	Electricity	Manufacture of rubber canvas and water proof shoes to the extent of 29 lakhs (pair)	276
2.	Bux Rubber Company, P.O. Buxnagar, Dacca	steam, diesel and electricity	Manufacture of rubber canvas and water proof shoes to the extent of 29 lakhs (pair)	238
3.	Sikandar Industries, 14-16K, Siddiqui Lane, Dacca, No. 1	Electricity	Plastic toys and plastics novelities, worth Rs. 5 lakh	-
4.	Ditto No. 11, 418, Industrial Area, Dacca	-Do-	-	-
5.	Kahinoor Rubber Industries, Lalmati, Sukrabad, Dacca	-Do-	Manufacture of play balls, tube pipes, ice bags, toys, rubber shoes etc. 330 tons	55

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬৯ সালে ঢাকায় মোট রাবার কারখানার সংখ্যা ছিল ৭টি। এগুলো হলো —

1. Bengal Rubber Industries, Tejgaon.
2. Bux Rubber Co. Ltd., Mirpur.
3. Paruma (Eastern) Ltd., Postogola.
4. A. T. J. Industries, Tejgaon.
5. Eastern Rubber Industries, Tejgaon.
6. Karim Rubber Industries, Narayanganj.
7. Kahinoor Rubber Industries, Urdu Road, Dacca.

উৎস : S.N.H Rizvi, *East Pakistan District Gazetteers, Dacca*, 1969, p.212.

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, রাবার কারখানাগুলোতে আমদানিকৃত কাঁচামাল দিয়ে জুতা থেকে শুরু করে নিপলসহ বিভিন্ন ধরনের দ্রব্য তৈরি হতো। এটি ছিল একটি লাভজনক ব্যবসা। প্লাস্টিক একটি প্রতিদ্বন্দ্বী শিল্প যা ইতিমধ্যে বাজার দখল করে নেয়। Bux Rubber কোম্পানি রাবারের পাত এবং পানিবাহী নল তৈরি করত। কোহিনূর রাবার ইন্ডাস্ট্রি খেলার সামগ্রী তৈরি করত।

এছাড়া ঢাকায় আরো কিছু কারখানা যেমন— ব্যাটারি কারখানা গড়ে ওঠে। নিম্নবর্ণিত কারখানাগুলো হলো[১২৫]—

সারণি-৪৩

Sl. No.	Battery Manufacturing Co.	Capital outlay (Rs)	Menpower employed
1.	O.K. Batteries, Nawabpur, Dacca	10,00,000/-	3
2.	Battery House Ltd., 24,Madan Mohon Road, Dacca.	50,000/-	4
3.	D.R. Battery Mfg. Co., 48, Peari Das Rd., Dacca	2000/-	-
4.	Eastern Pakistan Battery Mfg., Victoria park, Dacca.	-	13

১৯৪৮ সালে ঢাকায় আইস ফ্যাক্টরি ছিল এর মধ্যে ২টি ফ্যাক্টরি মুন্সীগঞ্জে, ১টি নারায়ণগঞ্জে এবং ১টি ঢাকা শহরে [১২৬]।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-৪৪

Sl. No.	Name of Ice Factory	Capital outlay	Manpower employed
1.	Narayanganj Ice Co. Ltd., Narayanganj.	150,000/-	-
2.	Munshiganj Ice, Munshiganj	250,000/-	9
3.	Sighirpur Ice co. Ltd., Munshiganj	80,000/-	9
4.	Dacca Ice Co., Wari, Dacca	150,000/-	16

১৯৬০ সালের একটি রিপোর্টে Baby Ice-cream, Azimpur, Peelkhana, Dacca, নামে আরেকটি আইস ফ্যাক্টরির নাম পাওয়া যায়। তবে এর উৎপাদন ক্ষমতা সম্পর্কে জানা যায় নি।

এছাড়া ঢাকায় আরো কিছু কারখানা ছিল। ১৯৫৪ সালে ঢাকায় তিনটি Motor Workshop ছিল। ১টি রেলওয়ে মেরামতের কারখানা, ১টি বিদ্যুৎ ও গ্যাসের কোম্পানি এবং একটি Air-craft Workshop ছিল। ১টি মাটির দ্রব্য উৎপাদনকারী কারখানা এবং ১টি পেট্রোলিয়াম শোধনাগার ছিল[১২৭]।

Manufacture and repair of Mechanically Propelled Vehicles :

1. Government Motor Vehicles Workshop, P.O. Tejgaon, Dacca.
2. Dienfa Motor Ltd., P.O. Ramna, Dacca.
3. Momin Motor Works Ltd., Orphanage Road, Dacca.

Air-craft Assembling Repairing and Servecing :

1. Government of East Pakistan Aircraft Workshop, P.O. Tejgaon, Dacca.

Manufacture and Repair of Railway equipment :

1. E.B. Railway Locomotive and Carriage, Phulbaria, Ramna, Dacca.

Manufacture of Pens, Pencils and other office and Artist's meterials :

1. Dawood Sultan Co., 90, Posta, Dacca.

Dhaka University Institutional Repository

Electricity and Gas :

1. The Dacca Electric Development Co. Ltd., P.O. Ramna, Dacca.

তবে এসব কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা, শ্রমিক সংখ্যা, মূলধনের পরিমাণ সম্পর্কে জানা যায় নি।

১৯৫৮ সালের একটি রিপোর্টে আরো ২টি ইলেকট্রিক ফ্যাক্টরির নামসহ উৎপাদন ক্ষমতা, ব্যবহৃত শক্তি এবং ১৯৫৬ সালের শ্রমিকের গড় সংখ্যা পাওয়া যায়[১২৮]।

সারণি-৪৫

Sl. No.	Name of Factory and Address	Power used	Annual production capacity	Average No. of workers employed during the year 1956
1.	Dhanmondi Power Station, Abdul Ghani Road, Dacca	Steam	25,000 K.W.N	232
2.	The Chittagong Engineering and Electric Supply Co. Ltd., Narayanganj Branch, Nawab Road, Narayanganj, Dacca.	Diesel Oil	600,000	59

১৯৬০-এর দশকে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (Third Five Year Plan) তড়িৎ শিল্পের ক্ষেত্রে দুটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা নেয়া হয়।[১২৯]

1. Electric wire and cable Mfg. Plant, cost Rs. 34.30 million.
2. Electrical Equipment Mfg. Plant, General Electric Mfg. (GEM) Plant.

Manufacture of Structural Clay and Prducts :

1. Dacca Bricks and Tiles Factory

   Village Demipara, Mirpur, Dacca.

১৯৫৮ সালের রিপোর্টে দেখা যায় যে, এই কারখানার বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ১২ লক্ষ ব্রিক, বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হতো এবং ১৯৫৬ সালে গড়ে প্রতিদিন ২০২ জন শ্রমিক কাজ করত।[১৩০]

Petroleum Refineries and Manufacture of Petroleum Products :

1. Burmah Shell Depot- Station Road, Dacca.

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য বার্মা শেল কোম্পানি ডিলারদের মাধ্যমে মহল্লায় মহল্লায় কেরোসিন তেল বিক্রি করত। এই কোম্পানির ডিলারশিপ ছিলেন শিল্পপতি আনোয়ার হোসেন। কেরোসিন তেলের ডিপো করেন আমলিগোলার নিজ বাড়িতে। এই ব্যাবসায় তার অনেক লাভ হতো। পরবর্তীতে তিনি এই ব্যবসা গুটিয়ে ফেলেন।[১৩১]

Pakistan Diesel Plant, Dacca :

১৯৬০-এর দশকে পাকিস্তান এসোসিয়েট এবং জার্মান ফার্মের সহযোগিতায় ঢাকায় ডিজেল ইঞ্জিন ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্লান্টের খরচ ছিল ৭.২০ মিলিয়ন রুপি। এর উৎপাদনক্ষমতা মেরিন ডিজেল ইঞ্জিন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল এবং স্টেশনারি ইঞ্জিনের ৮ এইচপি থেকে ২৬৫ এইচপি (H.P)। এই প্লান্টে সেন্ট্রিফিউগল পাম্প উৎপাদন করার কথা বলা হয়। যার ক্ষমতা ১-৭ (কিউসেস)। এই প্লান্ট সম্পর্কে বলা হয় "Manufacturing of various types of engines will help the programme of future mechanisation of the country crafts that ply in East Pakinstan waters."[১৩২]

East Pakistan machine tools Industry, Dacca (1964-65)

পূর্ব পাকিস্তানে তথা ঢাকায় ১৯৬০-এর দশকে শিল্পোৎপাদনে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির উপকরণের জন্য যে প্রকল্প নেয়া হয় তার মূল্য ছিল ২৩৮.৭২ মিলিয়ন রুপি। এটি সরকার পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হয়। এর উৎপাদন ক্ষমতা ধরা হয় ১২.১৫৫ টন। এই প্রকল্পের ইঞ্জিনিয়ারিং কনসালটেন্সি সার্ভিসের জন্য ফ্রান্সের M/s Seri কে (Renault Engineering) ঠিক করা হয়। এই প্রকল্পের দ্বারা আশা করা হয় যে, "The creation of this factory will not only diversify the country's effort in the field of engineering products but will also save foreign exchange to the tune of half a crore of rupees a month now utilized for importing mechanical and allied engineering products."[১৩২(ক)]

এখানে উল্লেখ্য যে, উপরে ঢাকার যেসব শিল্প নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তা মূলত Manufacturing Industry নিয়ে। এই শিল্প মূলত বড় পরিসরে হয়ে থাকে এবং এসব কারখানায় আধুনিক যন্ত্রপাতি, শক্তি, অনেক শ্রমিক কাজ করে এবং এগুলো দীর্ঘসময় ধরে চলমান। ১৯৫৪ সালের একটি রিপোর্টে পূর্ব পাকিস্তানের ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিকে সংজ্ঞায়িত করা হয় ১৯৩৪ সালে ফ্যাক্টরি আইনের 2(j) এবং 5(1) ধারা অনুসারে, যা নিম্নে বর্ণিত হলো। 2(j) ধারায় বলা হয়—"Factory" means any premises including the precints thereof whereon twenty or more workers are working or were working on any day of the preceding twelve month and in any part of which a manufacturing process is being carried on with the aid of power or, is ordinarily so carried on but does not include a mine subject to the operation of the Mines Act. 1923."[১৩৩]

Dhaka University Institutional Repository

উল্লিখিত যেসব শিল্প সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে তা মূলত 2(j) ধারা অনুসারে।

এছাড়া এই আইনের 5(1) ধারায় বলা হয় "Any place" wherein a manufacturing process is being carried on or is ordinarily carried on whether with or without the use of power whenever ten or more workers are working therein or have worked therein on any one day of the twelve months immediatly preceding such places are treated as factories only when it is declard by Government (by notification in the Official Gazette) that all or any of the provisions of the Factories Act applicable to factories shall apply to the same."[১৩৪]

উপরের উল্লিখিত কারখানা ছাড়াও ১৯৬৯ সালে ঢাকায় ২০টি বিড়ি কারখানা, ১৪টি বোতাম কারখানা, ১৭টি মোমবাতি কারখানা এবং ৩০টি কার্টুন ও প্যাকিং ফ্যাক্টরি ও ৯টি চিরুনি কারখানা ছিল।

ঢাকার বোতাম কারখানাগুলো সম্পর্কে দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

নিম্নবর্ণিত ঢাকার মোমবাতি কারখানাগুলো হলো —

1. Angorn Chemical Works, Alamganj Lane, Dacca.
2. Aulad Husain, 37, Hazaribag, Dacca.
3. Bengal Industries, 30, Kesab Banerjee Lane, Dacca.
4. Candle Works, 32, Panitola.
5. Dacca Co-operative Bhashan silk samity, 215, Jagannath shah Road.
6. Fazlur Rahman, 8/9, N. Lane.
7. Haji Anisur Rahman and Sons, Waterworks Road.
8. Haji Zainul Haque, Posta
9. Jeyerad Ali Bepari Candle Works, Narayanganj, Dacca.
10. Kalimullah, Jagannath Shah Road.
11. Md. Belal Mia, Husain Khan Lane.
12. Pak Candle Works, Bishnu Chan Das Street.
13. Pakistan Candle Works, Mirkadim Das Street.
14. Pakistan Industrial Co., Rukanpur.
15. Pioneer Candle Works, Haji Abdul Majid Lane.
16. Razia Candle Works, Almganj.
17. Taj Industries, Md. Asgar Lane.

Dhaka University Institutional Repository

চিরুনি কারখানা (Comb Factories)

1. Aulad Hussain, 37, Hazaribag, Dacca.
2. Best Alite Industries, Shaikh Shahib Bazar.
3. Haji Anisur Rahman, 64, Water Works Road.
4. Haji Zainul Haque, Postogola.
5. Kalimullah, 56, Jagannath Shah Road.
6. Mahbub and Sons, 35, Madan Mohan Bosak Road.
7. Md. Belal Mia, Husain Khan Shah Lane.
8. National Button Combs, 43, Hazaribag.
9. Pak Button and Comb, Peelkhana Road, Dacca.

উৎস : S.N.H. Rizvi, *East Pakistan District Gazetteers, Dacca*, 1969, pp. 215-216.

পরিশেষে বলা যায় যে, বিশ শতকের প্রথম দুই দশক ছিল স্বদেশিযুগ। এই সময় বাংলায় শিল্প স্থাপনের যে বহুমুখী প্রচেষ্টা শুরু হয় তা মূলত কলকাতার বাঙালি, বুদ্ধিজীবী জমিদার, দেশপ্রেমিক মধ্যবিত্ত, ব্যবসায়ী সকলেরই আধুনিক শিল্পের গুরুত্ব অনুধাবন করার ফল। দেশের নেতারাও বিদেশি নির্ভরতা ত্যাগ করে স্বনির্ভর হওয়ার জন্য আহ্বান জানায়। এরই ফলে পূর্ববাংলার ঢাকা শহরের একটু দূরে নারায়ণগঞ্জে স্থানীয় উদ্যোক্তাদের সহায়তায় কয়েকটি আধুনিক যন্ত্রচালিত বস্ত্রশিল্প গড়ে ওঠে। যদিও ঔপনিবেশিক শাসনামলে ঢাকার শিল্পক্ষেত্রে কোনো উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয় নি। কেননা ঔপনিবেশিক শাসকদের কাছ থেকে তা আশা করা যায় না। বাংলার সমস্ত বড় আধুনিক শিল্পগুলি ছিল ইউরোপীয়দের দখলে এবং কলকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বে কেন্দ্রিক। যে কয়েকটা শিল্প প্রতিষ্ঠান ছিল তার মালিক ছিল কলকাতার ব্যবসায়ী, জমিদার। আবার ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তান তথা ঢাকায় আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ শুরু হয়। এই সময় বিভিন্ন ভারি, মাঝারি ও হালকা ধরনের শিল্পকারখানা স্থাপিত হয়। পরিকল্পনা করে শিল্প এলাকা গড়ে তোলা হয় এবং আধুনিক শিল্পকারখানা গড়ে তুলতে পাকিস্তান সরকার পৃষ্ঠপোষকতা দিতে শুরু করে। তবে তা প্রয়োজনের তুলনায় সীমিত। নতুন শিল্পকারখানা গড়ে ওঠার ফলে বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হয়। বিদেশ থেকে দ্রব্য আমদানির ফলে যে অর্থের অপচয়/ ব্যয় হতো তা কমানো সম্ভব হয়। কেননা স্থানীয় কাঁচামাল দিয়ে এদেশের কারখানায় দ্রব্য উৎপাদন করে তা বিদেশে রপ্তানি করা হয়। যেমন— দিয়াশলাই, পাকা চামড়া, জুতা। ফলে এদেশের মানুষ দেশীয় দ্রব্য উৎপাদন ও ব্যবহারে উৎসাহী হয়ে ওঠে। এই শিল্প-কলকারখানাকে কেন্দ্র করে ঢাকায় রমরমা ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে ওঠে। যেমন—দেশীয় বস্ত্র মিল। এই সময় একটি নতুন সামাজিক শ্রেণির সৃষ্টি হয়, তা হলো শিল্পপতি। যা পূর্বে ছিল না বললেই চলে। যদিও অবাঙালি

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানরা দেশবিভাগের পর এদেশে চলে আসে। এদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য শিল্পে তারা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। গবেষক বিনায়েক সেন উল্লেখ করেন যে—

> "পূর্ববঙ্গের ৫৮টি জুট প্রেসিং মিলের মধ্যে অধিকাংশ ছিল অবাঙালি এবং ঢাকার শহরে এক-তৃতীয়াংশ চালকলের মালিক ছিল মাড়োয়ারিরা।"[১৩৫]

শিল্প-কলকারখানা গড়ে ওঠায় বহির্বিশ্বের সাথে ঢাকার আবার যোগাযোগ সৃষ্টি হয়। ফলে এদেশের মানুষ নতুন নতুন কারখানা সম্পর্কে ধারণা লাভ করে আর তা এদেশে স্থাপনে উদ্যোগী হয়। এমনি একজন শিল্পপতি হলেন আনোয়ার হোসেন। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের মধ্যে তিনি প্রথম কাটলারি ইন্ডাস্ট্রিজের মালিক ছিলেন। ১৯৭০ সালে ৯ লক্ষ টাকার প্রজেক্ট হাতে নিয়ে ঢাকার ২৫৬ নং তেজগাঁও এলাকায় এ শিল্প স্থাপন করেন।[১৩৬] এই সময় স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যবসায়ীদের মধ্যে শিল্পের প্রতি একধরনের আগ্রহ জন্মায়। যেখানে পূর্বে ব্যবসায়ীরা জমিতে টাকা বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে বেশি উৎসাহী ছিল, এই প্রক্রিয়া পরবর্তীতে কিছুটা কমে আসে।

পাকিস্তান শাসনকালের সময় যে শিল্পপতি শ্রেণির সৃষ্টি হয় তারা পরবর্তীতে দেশের রাজনীতি, সামাজিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ শিল্পপতি আনোয়ার হোসেন-এর নাম উল্লেখ করা যায়। তিনি ১৯৮৮ সালে ঢাকা-৮ আসনে সাংসদ নির্বাচিত হন। তিনি ঢাকা শহরের লালবাগ, হাজারিবাগ, কামরাঙ্গীরচর এসব এলাকার মানুষের সমস্যা সমাধানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। তিনি ঢাকাবাসীর চলাচলের সহজতম সড়ক একসময় যেটা ছিল বুড়িগঙ্গার আক্রমণ থেকে ঢাকাকে রক্ষা করার ঢাল তথা বেড়িবাঁধ নির্মাণে ভূমিকা রাখেন। বিভিন্ন সেবামূলক কাজের সাথে জড়িত ছিলেন। যেমন— জমিলা খাতুন লালবাগ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় পুনর্গঠন করেন এবং জমিলা খাতুন রেডক্রিসেন্ট মাতৃসদন ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রকে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। এতিম প্রতিপালনের জন্য রিয়াদুল মুসলিমাত শিশু শিক্ষালয় ও মাদ্রাসা এবং বিনামূল্যে গরিবদের চিকিৎসা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া বিভিন্ন এতিমখানা ও মাদ্রাসার সাথে জড়িত ছিলেন। এভাবে দেখা যায় যে, একটি নতুন শ্রেণির সৃষ্টি হয় যারা সমাজে বিভিন্ন অগ্রণী ভূমিকা রাখছে।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের অনেক শিল্পকারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বাঙালি-অবাঙালি মালিকরা যেমন বড় ধরনের ক্ষতির শিকার হন, তেমনি যেসব বাঙালি পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন জায়গায় শিল্প-বাণিজ্য গড়ে তুলেছিলেন তারাও একইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। তখন ব্যবসা ছিল মূলত করাচিকেন্দ্রিক। তাই ষাটের দশকের শুরু থেকেই পাকিস্তানের বিভিন্ন জায়গায় তারা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেন। স্বাধীন হওয়ার পর সেসব ব্যবসা ও সম্পদ সম্পূর্ণভাবে করায়ত্ত করে নেয় পাকিস্তানিরা। এমনি একজন ক্ষতিগ্রস্ত ঢাকার ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি হলেন আনোয়ার হোসেন। তার আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেন যে, করাচি, লাহোর, লায়ালপুর এসব জায়গায় তার দোকান ও অফিস, বাড়ি, গাড়ি ছিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পাকিস্তানিরা তা করায়ত্ত করে নেয়।[১৩৭]

Dhaka University Institutional Repository

যাহোক যুদ্ধকালীন সময়টুকু ছাড়া বলা যায় যে, পূর্ব পাকিস্তান তথা ঢাকা শহরের আধুনিক শিল্পের নবজন্ম হয়েছে ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর। যদিও এসময় শিল্পোন্নয়নের গতি ছিল ধীর। তথাপি এই সময়ই সরকারি ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। পাকিস্তান আমলেই এই অঞ্চলে শিল্প সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য সরকার জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করতেন। যা ১৯৫০ সালের *দৈনিক আজাদ* পত্রিকায় এভাবে উল্লেখ করা হয়—

> "পাকিস্তানের শিল্প সচিব জনাব নাজির আহমেদ খান পাকিস্তানে তৈরি দ্রব্যাদি ক্রয় করার জন্য জনসাধারণের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন। এই আবেদনে শিল্পসচিব বলেন যে, আমাদের দেশে প্রস্তুত নানাবিধ দ্রব্যাদি যে বিদেশ হইতে আমদানিকৃত দ্রব্যাদির মতই উৎকৃষ্ট শ্রেণির ইহা যে অনেকেই জানেন না। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। আজ আমাদের পাকিস্তানি দ্রব্যাদি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ও দায়িত্ব উপলব্ধি করিতে হইবে। নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদি ও বিলাস দ্রব্যের জন্য আমাদের বৈদেশিক বিনিময়ের উপর অহেতুক চাপ পড়িতেছে তা বন্ধ করার জন্য ইহা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে।
>
> যথোপযুক্ত উৎসাহ পাইলে আমাদের দেশে প্রস্তুত কোনো কোনো দ্রব্য বিদেশেও রফতানি করা যাইবে এবং উহার মারফৎ আমরা মূল্যবান ডলার ও অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করিতে পারিব। একথাও উপলব্ধি করিতে হইবে যে, কিছুকাল যাবৎ আমাদের কুটির শিল্পজাত দ্রব্যাদিই আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একমাত্র স্বরূপ হইবে।
>
> উপসংহারে শিল্পসচিব আরো বলেন, 'আমি আপনাদের নিকট এই আবেদন জানাই যে, স্বদেশে তৈরি দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া আপনারা রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক সংহতি আনয়ন করুন।"[১৩৮]

যদিও আমরা জানি পাকিস্তান শাসনামলে অধিকাংশ ভারি শিল্প-কলকারখানা করাচিতে গড়ে ওঠে। তথাপি এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, সীমিত পরিসরে হলেও আধুনিক শিল্প-কলকারখানার ভীত মূলত এ সময়ই গড়ে ওঠে। এই সময়ই স্থানীয় বাঙালি-অবাঙালি ব্যক্তিগত মালিকানায় শিল্পকারখানা গড়ে তোলেন। যা ঔপনিবেশিক শাসনামলে ছিল না। কলকাতায় অধিকাংশ আধুনিক শিল্পের মালিক ছিল ইউরোপীয়রা। কেননা পুঁজি ও মালিকানা তাদের হাতে থাকায় শিল্পকারখানা ছিল তাদের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণে। এই সময় অল্প কয়েকজন বাঙালিও মিলকারখানার অংশীদার ছিলেন। যেমন— দ্বারকানাথ ঠাকুর। দেশভাগের পর ঢাকার শিল্প-কলকারখানার মালিকরা মালিকানা পান এবং শিল্পকারখানা সংক্রান্ত আইন তৈরি হয়।

সুতরাং দেখা যায় যে, পাকিস্তান শাসনামলের অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখে পরবর্তীতে বাংলাদেশে অত্যাধুনিক শিল্পকারখানা গড়ে উঠেছে এবং যা এখনও অব্যাহত আছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

১. বিনায়েক সেন, 'শিল্পোদ্যোক্তা শ্রেণির বিকাশ' সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১)* অর্থনৈতিক ইতিহাস (২য় খণ্ড), এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ২০০৭, পৃ. ৩৩৪।

২. A.Z.M. Iftikher-Ul-Awwal, *The Industrial Development of Bengal* 1900-1939, Vikas Publishing House Pvt Ltd., New Delhi, 1982, p. 134.

৩. H. Rahman, Chittagong Since Partition, *Pakinstan Economic Journal*, 1:3 (1950), p. 65-81.

৪. Sumit Sarkar, *The Swadeshi Movement in Bengal* 1903-1908, New Delhi, 1973, p. 95. উদ্ধৃত, বিনায়েক সেন 'শিল্পোদ্যোক্তা শ্রেণির বিকাশ' *বাংলাদেশের ইতিহাস* (১৭০৪-১৯৭১), অর্থনৈতিক ইতিহাস, পৃ. ৩৩৪-৩৫।

৫. B. B. Kling, 'Economic Foundations of the Bengal Renaissance' Rachel Van M. Baumer (ed), *Aspects of Bengali History and Society*, Vikas Publishing House Pvt Ltd., New Delhi 1976, p. 38.

৬. Gunnar Myrdal, *Economic Theory and Under Developed Regions*, London, 1959, pp. 57-60. উদ্ধৃত, বিনয় ঘোষ, 'বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা (১৮০০-১৯০০)', *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র গ্রন্থমালার শেষ (পঞ্চম)* খণ্ড, প্রকাশ ভবন, কলকাতা-৭৩, ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃ. ১৩০।

৬ক. উদ্ধৃত, বিনয় ঘোষ, 'বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা (১৮০০-১৯০০)', *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র গ্রন্থমালার শেষ (পঞ্চম)* খণ্ড, পৃ. ১৩১-৩২।

৭. *ঐ*, পৃ. ১৩১-৪৩।

৭ক. *ঐ*, পৃ. ১৪২

৮. J. A Schumpeter, *The Theory of Economic Development, Harvard,* 1934, উদ্ধৃত, বিনয় ঘোষ, 'বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা (১৮০০-১৯০০)', *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র গ্রন্থমালার শেষ (পঞ্চম)* খণ্ড, পৃ. ১৪৮।

৯. বিনয় ঘোষ, 'বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা (১৮০০-১৯০০)', *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র গ্রন্থমালার শেষ (পঞ্চম)* খণ্ড, পৃ. ১৫১।

১০. Max Weber, 'The Protestant Sects and the Spirit of Capitalism from Max Weber', *Essays in Sociology*, Oxford University Press, New york, 1953, p. 321.

১০(ক). বিনয় ঘোষ, 'বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা (১৮০০-১৯০০)', *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র গ্রন্থমালার শেষ (পঞ্চম)* খণ্ড, প. ১৫১।

১১. মুনতাসীর মামুন, *ঢাকা স্মৃতি-বিস্মৃতির নগরী*, অনন্যা, জুলাই ২০০৮, পৃ. ৩৬।

১২. *ঐ*, পৃ. ২৫।

১৩. আব্দুল করিম, *ঢাকাই মসলিন*, পৃ. ৯৬।

১৩(ক). বুদ্ধদেব বসু, *গোলাপ কেন কালো*, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৮, দশটি উপন্যাস, ন্বেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ৭০০৭৩, ২০০৪, পৃ. ৪৬১।

১৪. বিনায়েক সেন, 'শিল্পোদ্যোক্তা শ্রেণির বিকাশ', সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত) *বাংলাদেশের ইতিহাস* (১৭০৪-১৯৭১) পৃ. ৩৫১।

Dhaka University Institutional Repository

১৫. Radhe Shyam *Rungta.The Rise of Business Corporations in India,1851-1900*, Cambridge University Press, 1970, p. 166.

১৬. Sumit Sarkar, *Swadeshi Movement in Bengal* (1903-1908), New Delhi, 1973, p. 94.

১৭. B. C. Allen, *Eastern Bengal District Gazetteers, Dacca*, Allahabad, The Pioneer Press, 1912. *(NAB)*

১৮. *A Proceedings*, B# 11, file No. 2-R-6 Branch : Commerce, Department : Commerce 1924, p. 21. *(NAB)*

A Proceedings, B # 11, File No. 2-R-6 (1) Branch : Commerce Department : Commerce, Government of East Bengal, 1924, p. 23. *(NAB)*

১৯. *ঐ*, pp. 21, 23.

২০. *A Proceedings*, B # 11, File No. 2-R-6, Branch : Commerce, Department : Commerce, Government of Bengal, 1924, pp. 22-26, pp. 30-34. (*NAB*)

২১. *A Proceedings*, B # 11, File 2-R-6 (1) Branch : Commerce, Department : Commerce. p. 24, pp. 32-36. *(NAB)*

২২. *B Proceedings*, B # 41, File No. 1I-18/53, Branch : Commerce, Department : C. L & Industries, Government of East Bengal, 1953, p. 2. *(NAB)*

২৩. *Economic Survey of East Pakistan 1963-64*, Finance Department, 1964, East Pakistan, Government Press, Gvernment of East Pakistan, Dacca, 1964, p. 25. (*DUL*)

২৪. আবদুল্লাহ ফারুক, 'ঢাকার শিল্পায়নের ইতিহাস', ইফতিখার-উল-আউয়াল (সম্পাদিত) *ঐতিহাসিক ঢাকা মহানগরী : বিবর্তন ও সম্ভাবনা*, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ২০০৩, পৃ. ৭৬।

২৫. *Economic Survey of East Pakistan 1963-64*, Chapter : V, Finance Department, Government of East Pakistan, 1967, pp. 25-27. (*DUL)*

২৬. William Bredo, *Industrial Estates- Tools for Industrialization*, Asia publisihing House, Bombay, Calcutta, New Delhi, Madras, London, New York 1962, p. 01. *(DUL)*

২৭. *ঐ*, pp. 35-36.

২৮. *ঐ*, p. 36.

২৯. *ঐ*, p.36.

৩০. *B Proceedings*, *B* # 10, File No. 2 I-23 of 1950, Sub: Industrial Estates, Branch : Industry, Department: C. I.. I. Government of East Bengal 1950, p. Q.

৩১. *ঢাকা প্রকাশ*, ৯ জানুয়ারি ১৯৯৪, ২৫শে পৌষ, রবিবার, ১৩৫৫।

৩২. *B Proceedings*, *B* # 10, File No. 2 I-23 of 1950, p. Q.

৩৩. *B Proceedings*, *B* # 07, File No. 2I-5 of 1948, Sub : Industrial Policy, Department : Commerce, Labour and Industry, Branch : Industry, Government of East Bengal, 1948, p. 1.

Dhaka University Institutional Repository

৩৪. *B Proceedings, B* # 07, File No. 2I-5 of 1948, Sub : Industrial Policy, Branch : Industry, Department : Commerce, Labour & Industry Government of East Bengal, 1948, p. 19.

৩৫. *ঐ*, p. 6

৩৬. *Statistical Abstract for East Pakistan*, Vol. IV, 1958, p. 260. (*DUL*)

৩৭. বিনায়েক সেন, 'শিল্পোদ্যোক্তা শ্রেণির বিকাশ', সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত) *বাংলাদেশের ইতিহাস* (অর্থনৈতিক ইতিহাস) ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬১।

৩৮. *Economic Survey of East Pakistan* (1963-64), East Pakistan Govt. Press, East Pakistan, 1964, p. 27. *(DUL)*

৩৯. *ঐ*, p. 27.

৪০. *B Proceedings,* B # 76, File no. 4p-4/49, Branch : Commerce, Department: C.L.& I., Goverment of East Bengal, August, 1950, Appendix (4), p. 5. (*DUL*)

৪১. S.N.H. Rizvi, *East Pakistan District Gazetteers, Dacca*, 1969, p. 198.

৪২. *Progress Report* (1964-65), p. 31. *(DUL)*

৪৩. *ঢাকা প্রকাশ*, ১৯৪৮ সালের ৭ নভেম্বর।

৪৪. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস* (১৭০৪-১৯৭১), এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ২০০৭, পৃ. ৩৬১।

৪৫. *ঢাকা প্রকাশ*, ৫ জানুয়ারি ১৯২৯।

৪৬. *ঢাকা প্রকাশ*, ১৩ আগস্ট ১৯৩৯, ২৮ শে শ্রাবণ ১৩৪৬।

৪৭. *ঢাকা প্রকাশ*, ২৮শে জানুয়ারি ১৯৪০, ১ মাঘ রবিবার ১৩৪৬ সন।

৪৮. *ঢাকা প্রকাশ*, ১৭ই নভেম্বর ১৯২৯, ১লা অগ্রহায়ণ ১৩৩৬।

৪৯. *ঢাকা প্রকাশ*, ১২ ডিসেম্বর ১৯৪৩, ২৬শে অগ্রহায়ণ রবিবার ১৩৫০।

৫০. *B Proceedings,* B # 81, File No. 1I-18/53, Branch : Commerce, Department : C. L. & Industry, Government of East Bengal, 1953, p. 132. (*NAB*)

৫১. *ঐ*, p. 82.

৫২. *ঐ*, p. 19.

৫৩. *ঐ*, pp. 179-180.

৫৪. *ঐ*, pp. 141-142.

৫৫. *ঐ*, p. 144.

৫৬. *Progress Report* 1964-65, pp. 31-32.

৫৬ (ক) *ঢাকা প্রকাশ*, ৯ মার্চ ১৯৫২

৫৭. *Progress Report* (1964-65), pp. 31-32.

৫৮. আনোয়ার হোসেন, *আমার সাত দশক*, একাডেমিক প্রেস এ্যান্ড পাবলিশার্স লাইব্রেরি, অক্টোবর ২০০৮, পৃ. ১৫২।

৫৯. *ঐ*, পৃ. ১৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

৬০. সাক্ষাৎকার : আতাহার আহমেদ তাহের, বয়স-৭৫, তাহের এ্যান্ড কোং, বর্তমান দোকান নং: ৩৭১, নিউমার্কেট, তারিখ : ১৪-০৫-১১ ।

৬১. *Report of the Census of Manufacturing Industries in East Pakistan for* 1954- Issued by Provincial Statistical Board and Bureau of Commercial and Industrial Intelligence, East Pakistan, 1960, pp. 291-320. (*DUL*)

৬২. *Statistical Abstract for East Pakistan.* Vol. IV, 1958, pp. 260-290. (*DUL*)

৬৩. S.N.H Rizvi, *East Pakistan District Gazetteers, Dacca*, 1969, pp. 210-211 (*DUL*)

৬৪. *Pakistan Trade.* Vol. XII, February, 1961 No. 2, p.68. (*DUL*)

৬৫. *B Proceedings,* B # 76, File No. 4p-4/49, Branch : Commerce, Department : Commerce, Government of East Bengal, 1950, p.3. (*NAB*)

৬৬. *B. Proceedings,* B # 07, File No. 2I-5 of 1948, Sub : Industrial Policy, Branch : Industry, Department : C.I.. & I, Government of East Bengal 1948, p.5. (*NAB*)

৬৭. *ঐ*, p. 19.

৬৮. *B. Proceedings,* B # 10, File no. 2I-23 of 1950, Sub : Industrial Estate in Pakistan, Branch : Industry, Department : C.I.. & I. Government of Bengal, 1950, p. 07. (*NAB*)

৬৯. *Statistical Abstract for East Pakistan,* Vol. IV, 1958, pp. 260-267.

৭০. S.N.H Rizvi, *East Pakistan District Gazetteers*, *Dacca*, 1969, pp. 207. (*DUL*)

৭১. *Statistical Abstract for East Pakistan*, Vol. IV, 1958, pp. 277-278.

৭২. S.N.H Rizvi : *East Pakistan District Gazetteers, Dacca*, 1969, pp. 208-210. (*DUL*)

৭৩. *ঐ*, p. 207.

৭৪. *Report on the Survey of Cottage Industries in Bengal,* Second edition, Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1929, p. 68.

৭৪.ক ঐ

৭৫. *B Proceedings,* B # 7, File no. 2I-5 of 1948, Sub: Industrial Policy, Branch: Industry, Department : C.I. & I, Government of East Bengal, 1948, p. 4. (*NAB*)

৭৬. *ঐ, p.* 24.

৭৭. *Statistical Abstract for East Pakistan*, Vol. IV, 1958, p. 260-67. (*DUL*)

৭৮. *East Pakistan Forges Ahead* p. 22. (*DUL*)

৭৯. Central Statistical Office Karachi, *East Pakistan Bureau of Statistics*, Dacca, উদ্ধৃত, *Economic Survey of East Pakistan* 1966-1967, Finance Department, East Pakistan Govt. Press, Govt. of East Pakistan, Dacca, 1967, p. 32.

৮০. *Statistical Year Book of Bangladesh,* 1975, p. 233.

Dhaka University Institutional Repository

৮১. *History of the Cotton Manufacture of Dacca District*, উদ্ধৃত, যতীন্দ্রনাথ মোহন রায়, *ঢাকার ইতিহাস* (১ম খণ্ড), দ্বেজ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৩, পৃ. ১৪৬।

৮২. শ্রী কেদারনাথ মজুমদার, *ঢাকার বিবরণ* (২য় খণ্ড), জানুয়ারি ২০০৩, পৃ. ৮৪৩।

৮৩. *Report on the Survey of Cottage Industries in Bengal,* Second Edition, Bengal Secretariat Book Depot.,Calcutta, 1929, p.70.

৮৪. *History of the Cotton Manufacture of Dacca District*

৮৪(ক) *Report on the Survey of cottage Industries in Bengal,* 1929, p. 70. (*DUL*) (*NAB*)

৮৫. *ঐ*

৮৬. *B. Proceedings,* B # 07, File no. 2I-5 of 1948, Sub : Industrial Policy, Branch: Industry, Department : C.I.. & I, Government of East Bengal, 1948, p. 07. (*NAB*)

৮৭. *ঐ*, p. 9.

৮৮. *ঐ*, p.9.

৮৯. *ঐ*, p. 9.

৯০. *Report on the Survey of Cottage Industries in Bengal* 1929, p. 70. (*DUL*) (*NAB*)

৯০ক. *ঐ*, p.70.

৯১. মুনতাসীর মামুন, *ঢাকা স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী*, ২য় খণ্ড, অনন্যা প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃ. ১৫৯।

৯২. *ঐ*, পৃ. ১০৯।

৯৩. *B Proceedings,* B# 76, File No. 4P-4/49, Branch : Commerce, Department C.I. & I, Government of East Bengal, 1950, p. 03. (*NAB*)

৯৪. *Pakistan Trade* Vol. XII, February 1961, No. 2, p. 68. (*DUL*)

৯৫. *B Proceedings,* B # 88, File no. 2J-1(21) of 1954, Sub: The Dacca soap in Assam, Branch : Commerce, Department : C.I..& Industry, Government of East Bengal, 1954, pp. 2-3. (*NAB*)

৯৬. S.N.H. Rizvi, *East pakistan District Gazetteers, Dacca*, 1969, p. 202.

৯৭. Delwar Hassan (ed.), *Commercial History of Dhaka,* DCCI, 2008, p.132.

৯৮. সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস, বিংশ শতাব্দী* (১৯০০-১৯৪৭), কে. পি. বাগচী এ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা, পৃ. ১২১।

৯৯. Delwar Hassan (ed.), *Commercial History of Dhaka,* DCCI, 2008, p. 132.

১০০. *B Proceedings, B #* 07, File No. 21-5 of 1948, Sub: Industrial Policy, Branch: Industry, Department: C.I.. & I, 1948, p. 19. (*NAB*)

১০১. *Monthly Survey of Economic Conditions in East Bengal (1952)*, The Provincial Statistical Board and Bureau of Commercial and Industrial Intelligence, Department : C. L. & Industries, 1952, p. 9. (*DUL*)

১০২. *ঐ*, p. 9.

Dhaka University Institutional Repository

১০৩. *ঐ*, p. 9.

১০৪. *ঐ*, p. 9.

১০৫. *Pakistan Trade* Vol. XII February 1961, No. 2, p.68. (*DUL*)

১০৬. *Monthly Survey of Economic Condition in East Bengal* (1952), p. 9.

১০৭. *ঐ*, p. 110.

১০৭(ক). ডা. যোগেশচন্দ্র ঘোষ, *গৃহ চিকিৎসা*, পৃ. ২ ।

১০৭(খ). এ.কে.এম. নূরুল আমীন (সম্পাদিত), *বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার ইতিহাস* ও *কৃষ্টি*, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ঢাকা ।

১০৭(গ). সাক্ষাৎকার : সুশীল চন্দ্র মহন্ত (৬২), ম্যানেজার, একাউন্টস ও ফিন্যান্স, সাধনা ঔষধালয়, গেন্ডারিয়া, ঢাকা, তারিখ : ২৫.০৯.১১ ।

১০৭(ঘ). *স্বাস্থ্য রক্ষা ও চিকিৎসাবিধি*, সাধনা ঔষধালয় লি., ঢাকা, পৃ. ১৪ ।

১০৭(ঙ). *ঐ*, পৃ. ১৪ ।

১০৭(চ). *ঐ*, পৃ. ১৫ ।

১০৭(ছ). *ঐ*, পৃ. ১৬ ।

১০৭(জ). *ঐ*, পৃ. ১৭ ।

১০৭(ঝ). *ঐ*, পৃ. ১৮ ।

১০৭(ঞ). *ঐ*, পৃ. ১৯ ।

১০৭(ট). ডা. যোগেশচন্দ্র ঘোষ, *গৃহ চিকিৎসা*, অগ্রহায়ণ ১৩৭১ ।

১০৭(ঠ). সাক্ষাৎকার : অনীল কুমার মুখার্জী (৭৭), সভাপতি, লোকনাথ আশ্রম ও মন্দির, ৮৪/১ স্বামীবাগ রোড, দয়াগঞ্জ, ঢাকা, তারিখ : ২৫.০৯.১১

১০৮. *Monthly Survey of Economic Condition in East Bengal* pp. 110-111

১০৯. *ঐ*, p.111.

১১০. *ঐ*, p.111.

১১১. *Report of the Census of Manufacturing Industries in East Pakistan for* 1954, Issued by Provincial Statistical Board and Bureau of Commercial and Industrial Intelligence, East Pakistan, 1960, p. 291-320. (*DUL*)

১১২. *Statistical Abstract for East Pakistan*, Vol. IV, 1958, pp.260-267. (*DUL*)

১১৩. *Progress Report*, 1964-65, p. 41. (*DUL*)

১১৪. *ঐ*, p.41.

১১৫. S.N.H, Rizvi: *East Pakistan District Gazetteers, Dacca*, 1969, pp. 211-212. (*DUL*)

১১৬. Delwar Hassan (ed.), *Commercial History of Dhaka*, DCCI, 2008, p.132.

১১৭. *B Proceedings*, B # 07, File no. 21-51 of 1948, Sub: Industrial Policy, 1948, p. 3.

১১৮. *ঐ*, p. 3.

১১৯. *ঐ*, 19.

১২০. *Statistical Abstract for East Pakistan Vol.* IV, 1958, P. 260-267. (*DUL*)

১২১. *ঐ*, pp. 260-267.

Dhaka University Institutional Repository

১২২. ঐ, pp.260-267.

১২৩. ঐ, pp.260-267.

১২৪. ঐ, pp. 260-267.

১২৫. *B. Proceedings,* B # 07, File no. 2I-5 of 1948, Branch: Industry. Department: C.L. & I. 1948, p. 19. (*NAB*)

১২৬. ঐ, p. 19

১২৭. *Report of the Census of Manufacturing Industries in East Pakistan for* 1954, Issued by Provincial Statistical Board and Bureau of Commercial and Industrial Intelligence, East Pakistan, 1960, p. 291-320.

১২৮. *Statistical Abstract for East Pakistan, Vol.* IV, 1958, pp. 260-267. (*DUL*)

১২৯. *Progress Report* (1964-65), p. 41. (*DUL*)

১৩০. *Statistical Abstract for East Pakistan* Vo. IV 1958, p. 267. (*DUL*)

১৩১. আনোয়ার হোসেন, *আমার সাত দশক*, ২০০৮, পৃ. ১৫১ ।

১৩২. *Progress Report* 1964-65, p. 39. (*DUL*)

১৩২ (ক). ঐ

১৩৩. *Report of the Census of Manufacturing in East Pakistan for 1954,* Issued by Provincial Statistical Board and Bureau of commercial and Industrial, Intelligence, East Pakistan, 1960, p. 01.

১৩৪. ঐ, p. 01

১৩৫. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত) *বাংলাদেশের ইতিহাস* (১৭০৪-১৯৭১), অর্থনৈতিক খণ্ড (২য় খণ্ড), এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ২০০৭, পৃ. ৩৫১ ।

১৩৬. আনোয়ার হোসেন, *আমার সাত দশক*, পৃ. ১৬৫ ।

১৩৭. ঐ, পৃ. ১৬৫

১৩৮. *দৈনিক আজাদ*, ৯ এপ্রিল ১৯৫০, পৃ. ০৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

ঢাকার ব্যাংক ব্যবস্থা

আধুনিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান মানুষের বহু বছরের সাধনার ফল। যুগ যুগব্যাপী বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিচার বিশ্লেষণ ও যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে ব্যাংক অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান, জাতীয় আয় বৃদ্ধি, আমদানি-রপ্তানি, দারিদ্র্য দূরীকরণ, সামাজিক উন্নয়ন ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন থেকে শুরু করে অর্থনীতির এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যার কথা ব্যাংক ছাড়া কল্পনা করা যায়। ব্যাংক বস্তুত মানুষের আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও কারিগরি উন্নতির একটি বড় অস্ত্র হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। এই অর্থে বলা যায় আধুনিক ব্যাংক ব্যবসা ফলিত অর্থনীতির ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মানব সভ্যতার একটি বড় আবিষ্কার।[১]

জ্ঞান-বিজ্ঞান জগতের বিস্ময়কর আবিষ্কারগুলো যেমন মানুষের জীবন বদলে দিয়েছে, তেমনি আধুনিক ব্যাংকও মানুষের জীবনে গুণগত পরিবর্তন এনে দিয়েছে। বলা বাহুল্য ব্যাংক ব্যবসার এই বিবর্তন প্রক্রিয়ায় বাঙালিও অংশীদার। আধুনিক ব্যাংকের অংশীদার হতে গিয়ে বাঙালিকেও এক দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে হয়েছে। তেমনি এ অধ্যায়ে মূলত বাঙালি তথা ঢাকার ব্যাংক ব্যবসা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অন্যান্য ব্যবসার মত ব্যাংক ব্যবসাও আলোচ্য সময় থেকে বিশেষ করে পাকিস্তান আমলে ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর আগে ব্যাংক তেমন প্রতিষ্ঠিত ছিল না। যতটুকু ছিল তা যৎসামান্য।

ব্যাংকিং ইতিহাসে দেখা যায় প্রাচীন ব্যাবিলনে খ্রিষ্টপূর্ব ২৮০০ সালের দিকে মানুষ ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিল। এই বিশ্বাস থেকে তারা ঈশ্বরের কাছে অর্থাৎ মন্দিরে টাকা ও মূল্যবান জিনিসপত্র জমা রাখত। বলা হয় ব্যাবিলনের মন্দিরগুলোকে ঘিরেই ব্যাংকিং-এর সূত্রপাত হয়। এই ধরনের ব্যাংক ব্যবসা 'টেম্পল ব্যাংকিং' নামে পরিচিত। ফরাসি লেখক M. Revilpout-এর মতে, 'There were banks and bank-notes in Babylon six centuries before the time of Jesus Christ.'[২] ব্যাবিলনে ইফিসাস ও ডেলফি নামে দুটো মন্দির ছিল শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান। এস. এন. মহেশ্বরীর মতে, নিরাপদ জায়গা হওয়ায় মন্দিরগুলোতে তখনকার লোকেরা স্বর্ণ-রৌপ্য জমা রাখত এবং এর বিপরীতে ব্যাবিলনীয়রা টাকা ধার নিত। এ ধরনের ঋণ প্রদান ও অর্থ প্রেরণের ব্যবস্থা তখনকার সিরিয়া, ফিনিশিয় ও প্রাচীন মিশরেও প্রচলিত ছিল। এদিকে ব্যাবিলন ও গ্রিসের অনুরূপ ব্যাংক ব্যবস্থা রোমেও পরিলক্ষিত হয়। এসব ক্ষেত্রে পুরোহিতরা কাজ করত আর্থিক এজেন্ট হিসেবে। ধর্ম বিশ্বাসে পরিবর্তনসহ নানা কারণে গ্রিস দেশে এই টেম্পল ব্যাংকিং তিরোহিত হয়। এদিকে রোমান সাম্রাজ্য (৪২৩ খ্রি.) বিনষ্ট হওয়ার সাথে সাথে তাদের ব্যাংক ব্যবস্থাও বিপর্যস্ত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

দীর্ঘদিন পর ব্যাংক ব্যবসার নবযাত্রা শুরু হয় মধ্যযুগের ইউরোপে। ব্যবসাটি সুদ-ভিত্তিক ঋণ প্রদানের ব্যবসা হওয়ায় খ্রিষ্টানরা তা করত না। খ্রিষ্টানদের কাছে সুদের ব্যবসা ছিল নিষিদ্ধ। এই শূন্যস্থান পূরণ করে ইহুদি ব্যবসায়ীরা। ইহুদি মহাজনেরা বাজারে বেঞ্চে বসে টাকা পয়সা লেনদেন করত। লেনদেনকালে যখন অকৃতকার্য হতো, তখন তারা বেঞ্চ ভেঙে ফেলত। এর ফলেই Bankrupt বা দেউলিয়া শব্দের উৎপত্তি। অনেকের মতে, বেঞ্চ অভিধাটি গ্রিক শব্দ ব্যাংক (banque)-এর নামান্তর এবং এ থেকেই ব্যাংক শব্দের উৎপত্তি।[৩]

আবার *Present Day Banking in India* গ্রন্থে B. Ramachandra Rau উল্লেখ করেন যে, 'The terms "bank" and "bankers" are quite modern but the profession is an old and time-honoured one. The word "bank" was a German term signifying a joint-stock fund.'[8] তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, 'The Italians used the word "banco" meaning a heap of money or an accumulation of stock.'[৫] আবার H.D. Macleod উল্লেখ করেন যে, 'The common derivation of the word "bank" from the counter upon which the Italian money-changer used to lay out his stock has been ridiculed. The Italian money changers as such were never called "bancheiri" in the Middle ages'[৬]

সুতরাং ব্যাংক শব্দের উৎপত্তি যাই হোক না কেন, ইউরোপে ব্যাংকের আদি সূত্রপাত হয় মধ্যযুগ থেকে।

আর ব্যাংক ব্যবসা হলো—'Originally banking had its origin in the efforts of individuals to supply certain primitive wants of an advancing community, namely, lending and receiving deposits.The process of satisfying their wants was by means of a few perfectly simple operations. ... The primary and original functions of banking namely lending and receiving deposits are still the more important functions but a great variety of services are performed by modern banks and with the advent of specialisation due to the progress of society, we find a diversify of banking operations, as well as institutions. It has fallen to their lot to finance industries, to liquidate the international indebtedness, to manipulate the currency system and lastly to mobilise credit which furnishes the life-blood of trade and commerce.'[৭]

Dhaka University Institutional Repository

ইউরোপের ব্যাংক ব্যবসার উন্নয়ন সম্পর্কে C. A. Conant বলেন, ইউরোপের আধুনিক ব্যবসায়ীদের অগ্রদূতরা ছিলেন "The individual money-changers, The Jewish money-lenders and the lambard bankers."[৮] তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, "As industry expanded by leaps and bounds, as centralised government emerged out of the welter of political chaos and as national life became organised the necessity for public banks arose."[৯]

ফলে দেখা যায় যে, ইউরোপে তেমনি কয়েকটি আধুনিক ব্যাংক গঠিত হয়। এগুলো হলো : "The Bank of Amsterdum (1609) was organised to remedy the defects in the currency circulation of Holland. The Bank of England (1694) would not have been ushered into existence so soon but for the necessity to finance the Dutch Wars of William III, King of England. So European banking understood in its modern sense is barely three to six centuries old."[১০]

সুতরাং দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, যে শব্দ থেকেই ব্যাংক শব্দটির উৎপত্তি হোক না কেন—মধ্যযুগে ইউরোপে তথা ইতালিতে ইহুদি ব্যবসায়ীরা নতুন কলেবরে ব্যাংক ব্যবসার সূত্রপাত করে। এই নতুন উদ্যোগে যোগ দেয় ইংল্যান্ডের স্বর্ণকারেরা, তারা লোকের কাছ থেকে অর্থ ও মূল্যবান জিনিসপত্র জমা রাখত এবং এর বিপরীতে একটা রশিদ দিত যা দেখিয়ে যে কোনো বাহক চাহিবামাত্র ঐ জিনিসপত্র ফেরত পেত। এ ধরনের ব্যবসা জনপ্রিয় হওয়ায় পরবর্তীকালে খ্রিষ্টানরা ব্যাংক ব্যবসায় এগিয়ে আসে। ফলে ইউরোপে একের পর এক ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করে।

এই প্রক্রিয়ায় ব্যাংক অব ভেনিস (১১৫৭) প্রতিষ্ঠার পর আরো কয়েকটি ব্যাংক জন্মলাভ করে। এগুলো হচ্ছে স্পেনের ব্যাংক অব বার্সিলোনা (১৪০১), ব্যাংক অব জেনেভা (১৪০৭), ব্যাংক অব আমস্টার্ডাম (১৬০০), ব্যাংক অব সুইডেন (১৬৫৯), ব্যাংক অব ইংল্যান্ড (১৬৯৪)।

ইউরোপের ব্যাংক ব্যবসার সমসাময়িককালে বাংলা অঞ্চলে ঢাকায় ব্যাংক ব্যবসা কী অবস্থায় ছিল তা জানতে হলে ভারতীয় ব্যাংক ব্যবসার ইতিহাসের আশ্রয় নিতে হবে। কারণ বাঙালির ব্যাংক ব্যবসার ইতিহাস ভারতীয় ব্যাংকিং ইতিহাসের সাথে জড়িত। ভারতীয় ইতিহাসে দেখা যায় যে, ব্যাংক ব্যবসা এই অঞ্চলে অপরিচিত কোনো ব্যবসা নয় বরং বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের মত অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতেও ব্যাংক ব্যবসা প্রচলিত ছিল। পর্যাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে প্রাচীন ভারতের ব্যাংক ব্যবসা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।

খ্রিষ্টপূর্বকালের বৈদিক সাহিত্যে (২০০০ খ্রি. পূর্ব) এই অঞ্চলে প্রচলিত ব্যাংক ব্যবসার উল্লেখ পাওয়া যায়। তখনকার দিনে টাকা ধার দেওয়ার জন্য কুসিদজীবী বলে একটি বিশেষ ব্যবসায়ী শ্রেণি ছিল। ছিল মহাজন অথবা শ্রেষ্ঠী নামীয় একটি ব্যবসায়ী শ্রেণি।[১১] বেদের

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তী যুগগুলোতে এ অঞ্চলে ব্যাংক ব্যবসা ছিল। 'Dr. Pramathanath Benerjea quotes from Gautama, Brihaspati and Baudhayana verses which regulate the rate of interest'.[১২] 'The Institutes of Manu give us rules regarding the regulation of interest and the policy of loans'.[১৩]

মনুসংহিতার সমসাময়িককালের অর্থাৎ ১৫০০ বছর পূর্বে রচিত আরেকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র। প্রাক বৌদ্ধ আমলের সমাজ-রাষ্ট্র ও অর্থনীতির একটি পরিচয় সম্বলিত এই গ্রন্থেও ডিপোজিট, প্লেজ, মর্টগেজ ও বোরোইং ইত্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায়। কৌটিল্য উল্লেখ করেন যে, আমানতের জিনিস কেউ নিজ স্বার্থে ব্যবহার করলে তিনি আমানতকারীদের অবস্থাভেদে যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেবেন। ঋণের ক্ষেত্রে কৌটিল্য বলেন, ঋণের উপর সুদ ধার্য হবে চুক্তিমাফিক, চুক্তি চলাকালীন সুদের হার পরিবর্তন করা যাবে না। কৌটিল্য সুদের হার সম্বন্ধে যা উল্লেখ করেছেন তাতে দেখা যায় তখনকার দিনে সাধারণ লেনদেনে সুদের হার ছিল ১৫%। বাণিজ্যিক ঋণে সুদের হার ছিল ৬০%। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের এই পরিচিতি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় তখনকার দিনে আজকের ব্যাংকিং-এর মত কাজ সমাজে চালু ছিল। ঐ আমলে ব্যাংক ব্যবসা বলতে আধুনিককালের সংগঠিত খাতের ব্যাংক ব্যবসাকে বোঝাত না। তখন ব্যাংক বলতে প্রধানত বোঝাত ঋণ প্রদান করা, মুদ্রা বিনিময় করা, মূল্যবান দ্রব্যাদি নিরাপদে সংরক্ষণ এবং এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে অর্থ প্রেরণ। বলা বাহুল্য দেশীয় ধরনের এই ধরনের ব্যাংক ব্যবস্থা বাংলা অঞ্চলে প্রচলিত ছিল।

মধ্যযুগে বাংলা অঞ্চলে ব্যাংক ব্যবসা করত বাঙালি হিন্দু সমাজের সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়। এই সুবর্ণবণিকরাই বাঙালি ব্যাংক ব্যবসায়ীদের পূর্বপুরুষ। কর্ম ও পেশাভিত্তিক বাঙালি হিন্দুসমাজে 'সুবর্ণবণিকরা' সোনার ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত। আধুনিককালের সাধারণত দে, সেন, দত্ত, শীল ও মল্লিক ইত্যাদি পদবিধারী বাঙালি হিন্দুসমাজভুক্ত 'সুবর্ণবণিকরা' পুরুষানুক্রমে বহুকাল থেকেই সোনার ব্যবসায়ে নিয়োজিত। সততা, স্বচ্ছলতা ও নিরাপত্তার কারণে ইউরোপে যেভাবে ইহুদি ব্যবসায়ী ও স্বর্ণকারদের ঘিরে ব্যাংক ব্যবসার গোড়াপত্তন হয় তেমনি আমাদের দেশেও মধ্যযুগে একই প্রক্রিয়ায় 'সুবর্ণবণিক'দেরকে কেন্দ্র করে ব্যাংক ব্যবসার সূচনা হয়। তখনকার দিনের ব্যাংকিং আধুনিককালের ব্যাংকিং-এর মত ছিল না। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, কাজ ও ব্যবসার আওতা ইত্যাদির দিক থেকে তখনকার দিনের ব্যাংক ব্যবসা ছিল একটু ভিন্ন ধরনের। তখনকার ব্যাংক ব্যবসায়ীরা আধুনিক ব্যাংকের সকল কাজ করত না। তারা প্রধানত স্বর্ণ-রৌপ্য, অলংকারাদি, মূল্যবান জিনিসপত্র ও টাকা পয়সার নিরাপদ রক্ষাণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিত। প্রয়োজনবোধে তারা ঋণও প্রদান করত। সুবর্ণবণিকরাও একই ধরনের ব্যাংক ব্যবসা করে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় প্রভাব প্রতিপত্তিশালী হয়ে ওঠে। যখন থেকে বাংলার কৌমসমাজ পেশা ও কর্মভিত্তিক কাঠামোতে সংগঠিত হতে শুরু করে তখন থেকেই সুবর্ণবণিকদের সোনার ব্যবসা এবং সেই সূত্রে ব্যাংক ব্যবসা শুরু। তারাও শুধু স্বর্ণরৌপ্য, অলংকারাদি, মূল্যবান জিনিসপত্র ও টাকাপয়সার নিরাপদ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বই নিত না, প্রয়োজনবোধে ঋণও প্রদান করত। দেশীয়

Dhaka University Institutional Repository

কৃষিজীবী ব্যবসায়ী ও রাজন্যবর্গকে তারা টাকা পয়সা দিয়ে প্রয়োজনের দিনে সাহায্য করত। মুদ্রা বিনিময়, একস্থান থেকে অন্যস্থানে নিরাপদে মূল্যবান জিনিসপত্র ও টাকা পয়সা স্থানান্তরের কাজও তারা করত। নিরাপত্তার জন্য তারা লোহার সিন্ধুক রাখত এবং স্বর্ণরৌপ্য স্থানান্তরের জন্য তাদের সাংগঠনিক ব্যবস্থা ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের অবস্থান হতো ব্যবসা কেন্দ্রে, অথবা প্রশাসনিক কেন্দ্রে। ব্যাংক ব্যবসায় তারা বিত্তবৈভবে ঐশ্বর্যশালী হয়ে ওঠে। তখনকার দিনের সমাজে তাদের ধনসম্পত্তি ছিল রীতিমত ঈর্ষার বস্তু এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির লোক বিশেষত উচ্চবর্ণের লোকেরা তাদের এই প্রতিপত্তি মেনে নিতে রাজি ছিল না।

ফলে ধনসম্পদ এবং অর্থজগৎ সম্বন্ধে বাঙালি হিন্দুদের ধারণায় যে স্ববিরোধিতা দেখা যায় তাতে মনে হয় লুক্কায়িত দুই শ্রেণির লোকের ক্ষমতা দ্বন্দ্ব ও মতামত। এর একদিকে আছে 'ব্রাহ্মণ্য' সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি এবং অন্যদিকে রয়েছে ব্যবসায়ী বা বৈশ্য সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি। ব্রাহ্মণ্য সমাজ মনে করে যজ্ঞকর্মেই মুক্তি। তাই তাদের কাছে ক্ষত্রিয়ের সভ্যতা নির্মাণের শক্তি, বৈশ্যের সম্প্রসারণ শক্তি অথবা শূদ্রের সাম্য শক্তির কোনো মূল্য নেই। বস্তুত এই তিন শক্তির ভয়ে ব্রাহ্মণ্য সমাজ থাকত সদা কম্পিত। তাই বলা হয়, টাকা মাটি, মাটি টাকা, এর দ্বারা ব্রাহ্মণ্য সমাজ প্রধানত টাকার শক্তিকে বিনাশ করতে চায়; যাতে তার ক্ষমতা নিষ্কণ্টক হয়। অপরদিকে বৈশ্যের কাছে টাকা বা সম্প্রসারণ শক্তি অর্থাৎ বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীই মুখ্য। বাকি শক্তি তার কাছে গৌণ। তাই অর্থোপার্জনের ক্ষেত্রে তার লোভ সীমাহীন। এই ধরনের অবস্থানে সাধারণভাবে ব্রাহ্মণ তার সাথে ক্ষত্রিয়কে পেতে চায়। অপরদিকে ক্ষত্রিয় চায় ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য উভয়কে। দেখা যায় রাজা আদিশূর পুত্র বল্লালসেনের সঙ্গে এক পর্যায়ে সুবর্ণবণিকদের দ্বন্দ্ব শুরু হয়। তখন বল্লালসেন (১১৫৮-১১৭৯) প্রতিশোধ নিতে সুবর্ণবণিকদের গোহত্যা ও সোনা চুরির দোষে দোষী সাব্যস্ত করে তাদেরকে বৈশ্যত্ব থেকে খারিজ করেন।

জেমস ওয়াইজ উল্লেখ করেন যে, বল্লালসেনের শত্রু হওয়ার জন্য তাদের এই দুরবস্থা। বল্লাল সেন আদেশ করেছিলেন শত্রুর সঙ্গে বসে খেতে। এখানে আরো উল্লেখ করতে হয় যে, তিনি তার গ্রন্থে উল্লেখ করেন সোনার, সোনার বণিক, সুবর্ণবণিক এই জাত এত বেশি বিভক্ত হয়েছে এবং এদের মধ্যে পার্থক্য এত কম যে, কে কোন শাখার সোনার তা নির্ণয় করা দুরুহ কাজ। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, সোনাররা হিন্দুস্তানি বেনিয়া। বাংলায় বসবাস করার কারণে জাতিচ্যুত হয়েছে। হিন্দুদের জাত সংস্কারকালে তাদের নিচু জাতের স্তরে নামিয়ে দেয়া হয়।[১৪]

বঙ্গদেশে সোনার বণিকদের সংখ্যা ৬০ হাজার ৩ শত ৬৬ জন। এর এক পঞ্চমাংশ অর্থাৎ ১২ হাজার ৭৩৫ জন বাস করে বর্ধমান। চব্বিশ পরগনায় বাস করত ৮,১৯৫ জন, হুগলিতে ৮,০৯৭ জন এবং ঢাকায় মাত্র ২৯২ জন।[১৫]

আবার জেমস ওয়াইজ সুবর্ণকর ও সুবর্ণ বণিকদের আলাদা বলে উল্লেখ করেন। সুবর্ণকর হলো স্বর্ণকার আর সুবর্ণবণিক হলো পোদ্দার। বঙ্গদেশের মধ্যে যারা স্বর্ণকার

Dhaka University Institutional Repository

তাদের বলা হয় স্যাঁকরা। অন্যদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক করলে এদের জাত যায়। ঢাকা শহরে (উনিশ শতক) চল্লিশটি ঘর আছে। এদের মধ্যে পঁচিশটি ঘর শহরে আর বাকি ১৫ ঘর গ্রামে। এদের আবার শাখা-প্রশাখা আছে'[১৬]—

বঙ্গ শাখার গোত্র ৩টি: বাশ্যপ, গৌতম, বৈশ্য। এদের পদবি—

সেন	–	লাহা
ধর	–	চন্দ
দত্ত	–	পাল
বড়াল	–	সিনহা
মৌলিক	–	আড্ডি

এভাবে দেখা যায় যে, সুবর্ণবণিকরা বিভিন্ন শাখায়, বিভিন্ন গোত্র ও বিভিন্ন পদবিতে বিভক্ত ছিল।

নিমাই চাঁদ শীল (সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের কৃতীপুরুষ) উল্লেখ করেন যে, এরপর বল্লালসেনের সময় থেকে ১৪০০ সাল পর্যন্ত 'সুবর্ণবণিক'দের জাতিকুল ধর্ম মেনে চলা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না।[১৭]

পঞ্চদশ শতাব্দীতে 'সুবর্ণবণিকরা' সমানাধিকারের জন্য বৈষ্ণব আন্দোলনে যোগ দেয় এবং বৈশ্যত্ব নিয়ে তারা আর মাথা ঘামায় নি। কারণ পঞ্চদশ-ষষ্ঠদশ শতাব্দীর দিকে সুবর্ণবণিকরা কিছুটা বেরিয়ে আসার সুযোগ পায়। এই সময় বিদেশি বণিকদের আনাগোনা শুরু হয়। এই সময়ে তাদেরকে ব্যাংক ব্যবসায় দেখতে পাওয়া যায়। আড্ডি, ধর, সাহা, শীল, মল্লিক, দে, দত্ত ও পাইক ইত্যাদি পদবি সম্বলিত যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই ব্যক্তিগণ তখনকার সময়ে ব্যাংক ব্যবসায় জড়িত ছিল বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।

ড. আর এম দেবনাথও একই মত সমর্থন করেছেন। অর্থাৎ তারা অধিকাংশই সুবর্ণবণিক ছিলেন।[১৮]

পরবর্তীকালে ইংরেজ বণিকদের আগমনে এই সুযোগ আরও সম্প্রসারিত হয়। ফলে সুবর্ণবণিকরা ইতোমধ্যে কলকাতা, হুগলি ও চুঁচুড়া ইত্যাদি নদীবন্দর ও ব্যবসা কেন্দ্রগুলোতে ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত। ড. আর. এম. দেবনাথ উল্লেখ করেন যে, সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক, তেলি ও সাহা-শুড়ি জাতীয় বাঙালি হিন্দু ব্যবসায়ী জাতিগুলোর মধ্যে সুবর্ণবণিকরা ভৌগোলিকভাবে কেন্দ্রীভূত ছিল পশ্চিমবঙ্গে। ১৮৭২ সালে সুবর্ণবণিকদের ভৌগোলিক বিস্তৃতি সম্পর্কে নিম্নবর্ণিত একটি হিসাব পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গে এদের সংখ্যা ছিল ৯৪,৩৭৫, এবং পূর্ববঙ্গে ৩০,৮৬৯ জন।[১৯]

পশ্চিমবঙ্গে সুবর্ণবণিকদের অধিকতর উপস্থিতি ইংরেজ আমলে তাদের অনুকূলে কাজ করে। এই সময়ের প্রথমদিকে কলকাতার বেশ কয়েকজন সফল সুবর্ণবণিক ব্যবসায়ীর আবির্ভাব-এর প্রমাণ। এর মধ্যে মতিলাল শীল (১৭৯২-১৮৫৪), নকুড় ধর ও কলকাতার

Dhaka University Institutional Repository

কলেজ স্ট্রিটের মল্লিক পরিবার উল্লেখযোগ্য। এদের পদচারণায় কলকাতার সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাংক ব্যবসারও বাণিজ্যিক পুঁজিতে নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়।

অপরদিকে ঢাকার পোদ্দাররাই (সুবর্ণবণিক, সাহা, বসাক ব্যবসায়ী) ছিল সনাতনীভাবে টাকা বিনিয়োগকারী কিন্তু উনিশ শতকে তারা তাদের কারবার অর্থ-লগ্নীতে রূপান্তরিত করে। তখন থেকে এরাই শহরের সকল কারিগর বা নির্মাণকারীদের মূলধন সরবরাহ করতে থাকে।[২০]

তবে প্রাক ব্রিটিশ পর্বে বাংলার বিখ্যাত যে একটি অবাঙালি ব্যাংকার পরিবারের আলোচনা না করলে ঢাকার ব্যাংক ব্যবসার আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সেটি হচ্ছে জগৎশেঠ পরিবার। এরা ভারতের পশ্চিমাঞ্চল থেকে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদে এসে বসতি স্থাপন করে। সুদীর্ঘ ৭০ বছর (১৬৫২-১৭২২) অবিভক্ত ভারতের পূর্বাঞ্চলে অত্যন্ত সুনামের সাথে তারা ব্যাংক ব্যবসা করে। এর স্বীকৃতিস্বরূপ এই পরিবারের ফতেহ চাঁদ ১৭২২ সালে বাংলার নবাবদের কাছ থেকে জগৎশেঠ উপাধি পান। অর্থ-বিত্ত এবং ধন ও মানে জগৎশেঠ পরিবার ঐ আমলে ছিল দোর্দণ্ড প্রতাপশালী ব্যাংকার পরিবার। তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল রূপকথার গল্পের মত। সুদীর্ঘ ৪০ বছর (১৭১৭-১৭৫৭) তারা তাদের অপ্রতিহত মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখে। এরা পরিচিত হয় বাংলার রথচাইল্ড পরিবার হিসেবে। অর্থাৎ ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে যেমন রথচাইল্ড পরিবার তেমনি বাংলার কাছে ছিল জগৎশেঠ পরিবার।

রাজস্থানের মাড়োয়ার অঞ্চল থেকে হিরানন্দ সাহু নামে এক ব্যবসায়ী নতুন সম্ভাবনার হাতছানিতে পূর্বভারতের পাটনায় এসে বসতি স্থাপন করেন। তিনি ছিলেন অসওয়াল সম্প্রদায়ভুক্ত জৈন ব্যবসায়ী। হিরানন্দ সাহু পাটনায় 'কুঠি' (ব্যাংক) স্থাপন করেন ১৬৫২ সালে। এসময় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরাও কোম্পানির কাজের বাইরে ব্যক্তিগতভাবে নানা ব্যবসায় জড়িত ছিল। এসব কাজে তাদের ঋণের প্রয়োজন হতো। হিরানন্দ সাহু তাদের ঋণের চাহিদা মেটাতেন। এই সূত্রে তিনি প্রচুর ধনসম্পত্তির মালিক হন।[২১] ব্যবসায়ীকসূত্রে পরিবারটির সাথে ইংরেজদের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ব্যবসা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে হিরানন্দের সাত পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র মানিকচাঁদ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ঢাকায় এসে কুঠি স্থাপন করেন। ঢাকা তখন বিদেশি বণিকদের বিচরণস্থল। এই সূত্রে ঢাকায় গুজরাটি বণিকদের পাশাপাশি ইংরেজ, ফরাসি-ডাচ ও আর্মেনিয় বণিকদের সরব উপস্থিতি। এ সময় বিদেশি ও স্বদেশি বণিকদের প্রধান ব্যবসায়ী পণ্য ছিল বাংলার তাঁতজাত পণ্য। মানিকচাঁদ এই প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ঋণ সরবরাহ করত। এই ব্যবসায় অচিরেই তিনি প্রচুর ধনসম্পত্তির মালিক হন। কিন্তু তিনি বেশিদিন ঢাকায় থাকতে পারেন নি। কারণ বাংলার অর্থনৈতিক রাজধানী ও পরবর্তীকালে প্রশাসনিক রাজধানী স্থানান্তরিত হয় মুর্শিদাবাদে। ফলে মানিকচাঁদও তার অবস্থান বদলান, ইতোমধ্যে তিনি পাটনা, হুগলি, কলকাতা, বেনারস ও ভারতের অন্যান্য জায়গায় কুঠি স্থাপন করেন। ১৭১৪ সালে মানিকচাঁদ মারা গেলে তার ব্যবসার হাল ধরেন দত্তক পুত্র ফতেহ চাঁদ। অল্প

Dhaka University Institutional Repository

কিছুকালের মধ্যেই তার ব্যবসার অভূতপূর্ব সম্প্রসারণ ঘটে। ডাচ কোম্পানির নথিপত্রে ফতেহ চাঁদকে হিন্দুস্তানের সবচেয়ে বড় 'মানিচেঞ্জার' হিসেবে বর্ণনা করা হয়। ডাচরা তাকে কোম্পানি হিসেবে মনে করত। ১৭২২ সালে নবাবদের কাছ থেকে ব্যাংকিং জগতে অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ 'জগৎশেঠ' উপাধি পান। এই উপাধিটি তারা বংশ পরম্পরায় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ব্যবহার করেন।

যাহোক জগৎশেঠ পরিবার প্রথমাবস্থায় ঋণ যোগান অথবা সুদের ব্যবসার মাধ্যমে ধনবান হয়। ঋণ যোগান ব্যবসার এক পর্যায়ে তারা নিয়োজিত হয় মুদ্রা বিনিময় ও হুণ্ডি-ব্যবসায়। প্রধানত মুদ্রা বিনিময় ব্যবসাতেই তাদের ভাগ্য ফেরে। মুদ্রা বিনিময়ে তারা এমন সুনাম অর্জন করে যে, তাদেরকে তখনকার দিনে এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় মানিচেঞ্জার বলা হতো। মানিচেঞ্জ ব্যবসাতে নিচের স্তরে নিয়োজিত ছিল শ্রফ নামীয় ব্যবসায়ীরা। এই অঞ্চলের সকল শ্রফরাই ছিল জগৎশেঠদের নিয়ন্ত্রাণাধীন। তাদের সাহায্য সমর্থন ও সহযোগিতা ছাড়া কোনো শ্রফেরই পক্ষে মুদ্রা বিনিময় ব্যবসায় নিয়োজিত থাকা সম্ভবপর ছিল না। বিনিময় ব্যবসা ও ঋণ যোগান ব্যবসার জন্য তাদের নেটওয়ার্ক ছিল সারা ভারতে। কার্যালয় ছিল দিল্লি, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, চুঁচুড়া, কলকাতা, হুগলি ও পাটনায়। শাখাগুলো চলত নিম্নলিখিত নামে —

১. মুর্শিদাবাদ (প্রধান অফিস) মানিক চাঁদজি, আনন্দ চাঁদজি,

২. ঢাকা - শেঠ মানিক চাঁদ, জগৎশেঠ ফতেহ চাঁদজি,

৩. পাটনা– মানিক চাঁদজি, দয়া চাঁদজি,

৪. চুঁচুড়া – ফতেহ চাঁদ, আনন্দ চাঁদজি।

শুধু মুদ্রা বিনিময়, হুণ্ডি ও অর্থযোগানেই তারা ব্যাপৃত ছিল না, বিদেশ থেকে আসা সোনা রূপার একচেটিয়া ক্রেতাও ছিল জগৎশেঠ পরিবার। ব্যবসাতে ধনবান হয়ে এক পর্যায়ে বস্তুত তারা সরকারি ব্যাংকে পরিণত হয়। সরকারের সকল রাজস্ব তাদের কোষাগারে জমা হতো। তারা প্রয়োজনে এই টাকা তুলে নিতেন। আবার প্রয়োজন পড়লে নবাবরা জগৎশেঠদের কাছ থেকে ধারও নিতেন। নবাবদের প্রেরিতব্য টাকাও তারা দিল্লিতে পাঠানোর ব্যবস্থা করতেন। সরকারের কোষাগার হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি তারা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও কোম্পানির কর্মচারীদের নিজস্ব ব্যবসাতেও ঋণ যোগান দিতেন। একটি হিসাবে দেখা যায় ১৭১৮-৩০ সালের দিকে ইংরেজরা জগৎশেঠদের একমাত্র মুর্শিদাবাদ কুঠি থেকেই বাৎসরিক গড়ে 4 লক্ষ মুদ্রা ধার নিত।

বস্তুত তারা পূর্বভারতে সকল বাণিজ্যিক ঋণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠেন। মুদ্রাবাজারে তারা ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাদের হাত থেকে টাকশালের কাজ বাগিয়ে নেওয়ার জন্য ইংরেজ এবং এদেশীয় অনেক বণিক প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু নবাবরা তা হতে দেয় নি। বস্তুত নবাবদের সহযোগিতায় তারা এই অঞ্চলে এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। ঢাকা শহরেও এই সময় তাদের ব্যাংক ছিল, যা আমলিগোলার বাসিন্দা নাজির হোসেন

Dhaka University Institutional Repository

বলেন, মুঘল আমলের আমির ওমরাহরা এ অঞ্চল ছেড়ে গেলে কিছু হিন্দু ব্যবসায়ী এখানে বসবাস শুরু করে। বাংলার বিখ্যাত ব্যাংকার জগৎশেঠের ব্যাংক ছিল (অন্তত ১৮৪০ সাল পর্যন্ত) আমলিগোলার পূর্বে। ব্যাংকের পাশে ছিল একটি মঠ ও একটি পুকুর। তিনি আরো উল্লেখ করেন, এই শতকের (বিশ) গোড়ার দিকে তাঁদের ছেলেবেলায় তারা শুনেছেন ব্যাংক ভবন অঞ্চলটি পরিচিত ছিল শেঠের ঘাট নামে।[২২]

সুতরাং এই পরিবারটির উত্থান জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যাংকার হিসেবে। উত্থান পর্বে তাদের সততা ও নিষ্ঠা যেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল তেমনি গুরুত্বপূর্ণ ছিল রাজ আনুকূল্য। তাদের সফলতায় আরেকটি উপাদানও সাহায্য করে। তারা কোনোদিন ব্যবসা ও ব্যাংককে একত্রিত করে নি। ফটকাবাজিতে জড়ান নি।

সুতরাং মুঘল ও প্রাক ব্রিটিশ আমলে তারা ঢাকার অন্যতম ব্যাংক ব্যবসায়ী ছিলেন। যদিও আধুনিক ব্যাংক বলতে যা বোঝাত তা ঐ সময় তখনও গড়ে ওঠে নি। তথাপি তারা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখলেও ঢাকার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা ছিল না। তাছাড়া তাদের ঢাকার ব্যাংক ব্যবসার উপর কোনো উল্লেখযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় নি।

১৭৪০-১৭৫৭ সাল পর্যন্ত জগৎশেঠরাই ছিলেন বাংলার কিং মেকার। যেহেতু রাজ আনুকূল্যে তাদের উত্থান, অনুপস্থিতিতেই তাদের পতন। নবাবের পর নতুন শাসক ইংরেজের সাথে বিরোধ নতুন অবস্থার সাথে খাপ খাওয়াতে না পারা, অমিতব্যয়িতা, নতুন প্রতিযোগীদের আবির্ভাব ও ইংরেজ ব্যবসায়ীদের কর্তৃত্ব লাভের ইচ্ছা ইত্যাদি কারণে জগৎশেঠ পরিবার ব্যাংকিং জগত থেকে তিরোহিত হয়। বাংলার অনেক ছোট বড় ব্যবসায়ীদের মত তাদের বংশধররা শেষ পর্যন্ত রূপান্তরিত হয় জমিদারে। এই পরিণতি দেখে বিখ্যাত এন. কে সিনহা দুঃখ করে বলেন, "বিখ্যাত এই ব্যাংকার পরিবার (জগৎশেঠ) বাংলাকে তাদের বাসস্থান করে। আর কয়েক প্রজন্মের ব্যবধানে বাংলা তাদেরকে জমিদারে রূপান্তরিত করে। ইতিহাসে এই হচ্ছে পরিবেশের ভূমিকা।"[২৩]

জগৎশেঠ পরিবারের পর ব্যাংক ব্যবসায় আস্তে আস্তে সামনে চলে আসে শ্রফ ও পোদ্দার পদবির অবাঙালি বণিক ও বাঙালি বণিকগণ। উনিশ শতকের প্রথম দিকে বড় বড় ব্যাংকাররা ঢাকা থেকে তাদের কারবার গুটিয়ে ফেলে। ১৮৩০ সাল মাত্র ৩২টি ছোট ধরনের শ্রফ ছিল। ড. শরীফ উদ্দিন আহমেদ উল্লেখ করেন, ১৭৯৪ সালে ঢাকায় ৪৬৪টি ঘর পোদ্দার, মহাজন ও ব্যাংকার ছিল।[২৪] এই সময় ব্যবসা-বাণিজ্যে বিনিয়োগ করার মত মূলধন ঢাকায় খুব সামান্য ছিল।

যে সকল পোদ্দার ও মহাজন ১৮৪০-এর দশকে ঢাকায় তাদের কারবার চালিয়ে যাচ্ছিল তারা মোটেও কোনো বড় ধরনের ব্যাংকার বা অর্থ বিনিয়োগকারী ছিল না। কেননা টেলর উল্লেখ করেন যে, ঢাকার পোদ্দারদের কারবার বর্তমানে কলকাতা, পাটনা, মুর্শিদাবাদ বেনারস, সিলেট এবং মির্জাপুরে কেবল হুণ্ডি ব্যবসার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এছাড়া কলকাতা থেকে হ্যান্ডনোটের উপর ভিত্তি করে স্থানীয় নীলকরদের তারা টাকা ধার দিত। বাড়ি, ঘর,

Dhaka University Institutional Repository

জমি, গহনা, সোনা-রূপার জিনিসপত্র ইত্যাদি বন্ধক রেখেও তারা স্থানীয়দের টাকা ধার দিত। এদের মধ্যে কেউ কেউ কলকাতা থেকে বিলেতি সুতা কিনে এনে স্থানীয় তাঁতিদের কাছে বিক্রি করত। ড. শরীফ উদ্দিন আহমেদ আরো উল্লেখ করেন যে, "পোদ্দাররাই উনিশ শতকে ঢাকার প্রধান ব্যাংকার হয়ে ওঠেন এবং স্থানীয় বড় বড় ব্যবসায়ীদের চাহিদামাফিক তাদের মূলধন যোগান দেন। ক্ষুদে কড়ির ব্যবসায়ী থেকে লক্ষপতি বনে যাওয়া ঢাকার ফরাসগঞ্জের দাস পরিবারের ব্যবসায়িক সফলতা ছিল উনিশ শতকে ঢাকার সবচেয়ে সফল বাণিজ্যিক কাহিনি। মজার ব্যাপার এদের উত্থান কিন্তু ঢাকার মন্দার যুগেই, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের সময়ে নয়।"[২৫]

ফরাসগঞ্জের এই দাস পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মথুরানাথ পোদ্দার। মথুরানাথের মূল ব্যবসা ছিল বাজার করতে আসা লোকদের টাকা ভাঙিয়ে দেয়া—যা দিয়ে তারা কেনাকাটা করত। পরবর্তীতে তিনি মুদ্রা ভাঙানোর ব্যবসা পুরোপুরি ছেড়ে দিয়ে লগ্নী আর হুণ্ডির কারবারে নামেন। এছাড়া হ্যান্ডনোট ভাঙানোর কাজও শুরু করেন। এই নতুন কর্মকাণ্ডের দরুন তিনি সনাতনীভাবে একজন ব্যাংকার হয়ে ওঠেন।

১৮৫৭ সালে 'দ্যা ঢাকা নিউজ' এক সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করে যে, 'স্থানীয় ব্যাংকারদের চেয়ে বেশি বিশ্বস্তজন আর কেউই নেই; এই শহরের মথুরা মোহন স্বরূপ চাঁদ পোদ্দার এবং বলরাম উধভ পোদ্দারের সাথে আমরা লাখ লাখ টাকার ব্যবসা করেছি। এই সকল ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মালিকদের মুখের কথায় আমরা অন্য বহু লোকের প্রতিজ্ঞাপত্রের উপরে নেব না, তা সে যত শক্ত ধরনের স্ট্যাম্প পেপারের উপরই হোক না কেন'।[২৬]

মথুরা নাথের মৃত্যুর পর তার দুই পুত্র স্বরূপ চন্দ্র দাস এবং মধুসূদন দাস তাদের পৈত্রিক ব্যবসা চালিয়ে যেতে থাকেন। তাদের নেতৃত্বে পারিবারিক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান 'স্বরূপ চন্দ্র মধুসূদন পোদ্দার হাউজ' ঢাকার সবচেয়ে বড় স্থানীয় ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান হিসেবে বেড়ে ওঠে।

ড. শরীফ উদ্দিন আহমেদ উল্লেখ করেন যে, ঢাকায় ইউরোপীয় কায়দায় ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ইতিহাস শুরু হয় ১৮৪৬ সালে। এই বছর ঢাকার কিছু ইউরোপীয় নীলকর ব্যবসায়ী ও ভূ-স্বামী কয়েকজন ব্রিটিশ উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা এবং কয়েকজন দেশীয় জমিদার যৌথ সংঘ স্থাপন করে একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে—যার নাম দেয়া হয় 'ঢাকা ব্যাংক' (The Dacca Bank)। এটিই ছিল ঢাকার সর্বপ্রথম আধুনিক ব্যাংক আর স্থানীয় সনাতনী লগ্নীকারীদের প্রথম প্রতিযোগী।

১৮৫৬ সালের জুন মাসে ঢাকা ব্যাংক গুটিয়ে ফেলা হলে ব্যাংকের বেশ কিছু শেয়ার হোল্ডার যারা ঢাকায় থাকতেন তারা বিপর্যয় কাটিয়ে পুরানো ব্যাংকেরই কাগজপত্র কিনে নিয়ে একই নামে আরেকটি ব্যাংক খোলার পরিকল্পনা করে।

এরপরই ১৮৬২ সালে ব্যাংক অব বেঙ্গলের শাখা ঢাকায় স্থাপিত হয়। এই ব্যাংক মূলত ঢাকা ব্যাংককে কিনে নেয়, তবে শর্ত অনুযায়ী ভূতপূর্ব ব্যাংকের শেয়ার হোল্ডারদেরকে

Dhaka University Institutional Repository

তাদের শেয়ারের বিপরীতে ব্যাংক অব বেঙ্গলের ২,৯০,৯৯৯ টাকার সমান কাগজ প্রদান করে। এই সময় থেকেই এই ব্যাংকই আবার বাংলা সরকারের পক্ষে সকল ট্রেজারি ও ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান শুরু করে। ফলে ঢাকায় তাদের শাখা খোলার সাথে সাথে এটিই সমগ্র পূর্ববাংলার সরকারি কোষাগার হিসেবে কাজ আরম্ভ করে। সকল জেলা থেকে রাজস্ব গ্রহণ, জেলা কোষাগারে টাকা সরবরাহ এবং কলকাতায় সরকারের রাজস্ব পাঠিয়ে দেয়া ইত্যাদি কাজগুলি তখন থেকে ব্যাংক অব বেঙ্গলের ঢাকা শাখাই পালন করত। বস্তুত ঢাকায় এই ব্যাংক অব বেঙ্গলের অবস্থানই ঢাকাকে সারা পূর্ব বাংলার আর্থিক কেন্দ্রে উন্নীত করে।[২৭]

সুতরাং দেখা যায় যে, উনিশ শতকে ঢাকায় একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাংক গড়ে উঠলেও তা শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে নি এবং পরবর্তীতে এটি ব্যাংক অব বেঙ্গলের শাখা খোলার মাধ্যমে ব্যাংকিং সেক্টরে এক নতুন প্রতিযোগিতা শুরু হয়। এই ব্যাংকের মাধ্যমে পূর্ববাংলা তথা ঢাকার ব্যবসা-বাণিজ্য বা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ অবিভক্ত বাংলা তথা ভারতীয় ব্যাংকিং-এর ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ে যেমন একের পর এক কয়েকটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বড় ঘটনা ঘটে, তেমনি পাশাপাশি ঘটে নতুন নতুন ব্যাংকের জন্ম ও বিলুপ্তি। আধুনিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার এই জোয়ার থেকে সাবেক পূর্ববাংলাও পিছিয়ে ছিল না। পূর্ববাংলার উদ্যোক্তারা এগিয়ে আসে। দেখা যায় বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাঙালির উদ্যোগে অবিভক্ত বাংলায় বেশ কয়েকটি আধুনিক ব্যাংক গড়ে ওঠে। প্রধান প্রধান এই ব্যাংকগুলো হচ্ছে (১) কুমিল্লা ব্যাংকিং কর্পোরেশন (১৯১৪), (২) নিউ স্ট্যান্ডার্ড, (৩) কুমিল্লা ইউনিয়ন, (৪) পাইওনিয়ার বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাংক (১৯১৮), (৫) হুগলি ব্যাংক (১৯৩২), (৭) নাথ ব্যাংক (১৯৩২), (৮) ইসলামাবাদ টাউন ব্যাংক অব চিটাগাং, (৯) কমরেড ব্যাংক, (১০) ইন্ডিয়ান ক্রিসেন্ট ব্যাংক।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের পাশাপাশি দেশভাগের পূর্বে (১৯৪৭) বাঙালির উদ্যোগে একটি শিল্প ব্যাংকও প্রতিষ্ঠিত হয়। 'ইউনাইটেড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাংক' নামে ঢাকা জেলার ভাগ্যকুলের ব্যবসায়ী বংশের যদুনাথ রায় ১৯৪০ সালে একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। এ ব্যাংকের প্রথম পরিচালনা বোর্ডে ছিলেন যদুনাথ রায়ের আত্মীয় প্রিয়নাথ রায় এবং কুমার রমেন্দ্রনাথ রায়, কলকাতার প্রসিদ্ধ লাহা পরিবারের ড. সত্যচরণ লাহা ও বিখ্যাত বীমা ব্যবসায়ী অবিনাশচন্দ্র সেন। বাঙালির উদ্যোগে এই সময় (দেশভাগের পূর্বে) আরো কয়েকটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। এগুলির কোনোটিই ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় নি। ঢাকায় এসব ব্যাংকের শাখা ছিল কিনা তাও জানা যায় নি। ব্যাংকগুলো হলো— (১) ব্যাংকারস ইউনিয়ন ব্যাংক, (২) প্রবর্তক ব্যাংক, (৩) ব্যাংক অব বাকুড়া ও (৪) মেট্রোপলিটন ব্যাংক।[২৮] ড. আর এম. দেবনাথ উল্লেখ করেন যে, এগুলোর তথ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ব্যাংকগুলো ১৯৪৭ সালের পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হয়।

আবার ১৯৩০-এর দশকে ঢাকায় ত্রিপুরা ব্যাংকের শাখা গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়। যা *ঢাকা প্রকাশে* উল্লেখ করা হয়—

Dhaka University Institutional Repository

"ত্রিপুরা রাজ্যে ব্যাংকিং কার্য দিন দিনই প্রসার লাভ করিতেছে। স্থানীয় 'দি এসোসিয়েটেড ব্যাংক ত্রিপুরা লি.' গত ৯ জুলাই কৈলাসহরের বিভাগ অন্তর্গত কমলপুর নামক স্থানে একটি সাব অফিস খুলিয়াছেন। এই অনুষ্ঠানে কৈলাসহরের দ্বিতীয় বিভাগীয় কার্যকারক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী, বি. এল. মহাশয় সভাপতিত্ব করেন। তিনি রাজ্য মধ্যে ব্যাংকিং-এর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নাতীদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। স্থানীয় ব্যবসায়ীবর্গের বিশেষত বনজ বস্তু ব্যবসায়িকবর্গের পক্ষে এই ব্যাংকের অফিসটি কত সাহায্যকারী হইবে তাহাও তিনি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন। স্থানীয় বহু লোক এবং চা-বাগানের সত্ত্বাধিকারিগণ এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন এবং কৈলাসহর ব্যাংকের এজেন্ট ভার এস. এন. ঘোষ মহাশয় বিশেষ যত্ন সহকারে সকলকে আপ্যায়ন করেন এবং জলযোগে পরিতুষ্ট করেন। এই ব্যাংকের অপরাপর অফিস নিম্নলিখিত স্থানে আছে, ঢাকা, শ্রীমঙ্গল, সমসের নগর, কৈলাসহর, আগরতলা, ভানুগঞ্জ গঙ্গাসাগর।"[২৯]

১৯৩৫ সালে ঢাকায় ফেডারেল ব্যাংকের কার্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়। এই কার্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে *ঢাকা প্রকাশে* উল্লেখ করা হয়— "গত ২৭শে নভেম্বর বুধবার ঢাকা ফেডারেল ব্যাংক লিমিটেড-এর কার্যালয় প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ৩নং জনসন রোডে স্থানীয় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। আমরা আশা করি পরিচালকগণের কর্তব্যনিষ্ঠায় ফেডারেল ব্যাংক জনসাধারণের প্রীতি সম্পাদনে সমর্থ হইবে।"[৩০]

১৯৪৩ সালে ঢাকায় আরো একটি ব্যাংকের শাখা খোলা হয়। তাহলো 'বিক্রমপুর ব্যাংক'। এই ব্যাংক সম্পর্কে *ঢাকা প্রকাশে* উল্লেখ করা হয় "মুন্সীগঞ্জের খ্যাতনামা উকিল শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়দ্বয়ের উদ্যোগেও তত্রব্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের সহানুভূতিতে তথায় ব্যবসায়ে অর্থবিনিয়োগের সুবিধানকল্পে দুই বৎসর পূর্বে বিক্রমপুর ব্যাংক নামে যে প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে, গত বুধবার অপরাহ্ন ৬টার সময় ঢাকেশ্বরী কটন মিলের সুযোগ্য ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত সূর্যকুমার বসু মহোদয়, সমবেত বিক্রমপুরবাসিগণের অনুমোদনমতে, এ শহরের কোর্ট হাউজ স্ট্রিটস্থ ২৫ নং ভবনে, সেই ব্যাংকের ঢাকা-শাখার উদ্বোধন-কার্য সম্পাদন করিয়াছেন। সভারম্ভে ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টররূপে অম্বিকাবাবু সভাপতি ও সম্মিলিত সভ্যগণকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাহাতে জানা যায় কতিপয় বৎসর পূর্বে অম্বিকাবাবু ও সতীশ বাবুর যত্নে মুন্সীগঞ্জে এক লোন অফিস বা মহাজনী ব্যবসায় স্থাপিত এবং ক্রমে উহার এরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল যে, কর্তৃপক্ষ শতকরা ৫০ টাকা পর্যন্ত ডিভিডেন্ড বা লভ্যাংশ বিতরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু পরে আইনের কঠোর বিধানের অনুরূপ কার্যপরিচালন সুবিধাজনক না হওয়াতে দুই বৎসরের কিছু অধিককাল যাবত ঐ লোন অফিস ব্যাংকে পরিবর্তিত ও বিক্রমপুর ব্যাংক নামে অভিহিত হইয়াছে...। সভাপতি সূর্যবাবু এক হৃদয়গ্রাহী সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় এদেশে ও বিলাতে ব্যাংক স্থাপনের বিবরণ আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এদেশের লোকেরা ব্যাংকের কার্য পরিচালনে অযোগ্য বলিয়া যে অখ্যাতি প্রচারিত হইয়া থাকে, তাহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন; বরং শ্বেতাঙ্গগণেরই এ কার্যে অনেক অধিক অযোগ্যতার

Dhaka University Institutional Repository

পরিচয় পাওয়া গিয়া থাকে। এই উক্তি সমর্থনকল্পে সূর্যবাবু দেখাইয়াছেন যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বিলাতের সহস্রাধিক ব্যাংকের মধ্যে একটি ব্যতীত অপর সকলগুলিই ফেল হইয়াছে। পক্ষান্তরে ভারতের প্রায় পৌনে চারিশত ব্যাংকের মধ্যে মাত্র ২৪টি অকৃতকার্য্যতার জন্য বিনষ্ট হইয়াছে। সুতরাং এদেশবাসী ব্যাংকের কার্যপরিচালনে কখনই অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। ... আমরা আশা করি বিক্রমপুরের সুসন্তানগণ এই ব্যাংকের কার্যে সমুচিত সহানুভূতি প্রদর্শনে বিরত হইবেন না। ঢাকার বিভিন্ন স্থানের বহু ব্যাংকের শাখাই সংস্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু এতদিন ঢাকার নিজস্ব কোনো বিশিষ্ট ব্যাংক এখানে ছিল না। ঢাকাবাসী এ বিষয় স্মরণ রাখিয়া অতঃপর তাহাদের গৌরব রক্ষায় যত্নবান হইবেন; এরূপ আশা করা অসঙ্গত নহে।"[৩১]

সুতরাং দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, দেশভাগের আগে ঢাকা শহরে বিভিন্ন ব্যাংকের শাখা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু কোনো পূর্ণাঙ্গ ব্যাংক গড়ে ওঠে নি। আবার দেখা যায়, ঢাকা ছাড়া অন্যান্য অঞ্চলে যেসব ব্যাংক গড়ে উঠেছিল সেগুলোর বিশেরভাগ টিকে থাকে নি।

মূলত দেশভাগের আগে বাঙালির ব্যাংক ব্যবসা জমে উঠলেও ব্যাংক প্রতিষ্ঠার এই পর্ব শুরু হয় স্বদেশি আন্দোলনের (১৯০৬) সূত্র ধরে। স্বদেশি আন্দোলনের ডাক ছিল বিদেশি পণ্য বর্জন ও স্বদেশি সবকিছু গ্রহণ। এর ফলে শুধু ব্যাংক নয়, গড়ে ওঠে প্রচুর সংখ্যক দেশীয় শিল্প। কিন্তু নানা কারণে বিঘ্নিত হয়। প্রথম বিঘ্নটি কোম্পানি আইন থেকে। তাই কোম্পানি পরিচালনার সমস্যা নিরসনে ১৯১৩ সালে 'কোম্পানিজ এ্যাক্ট' পুনর্বিন্যাসিত করা হয়। এতে বেশ কিছু সমস্যার সমাধান হয়। কিন্তু ১৯১৪-১৯ সাল ব্যাপী সংঘটিত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সবকিছু তছনছ করে দেয়। তারপর ১৯২৯-৩০ সালের দিকে দেখা দেয় অর্থনৈতিক মন্দা। মন্দার পর ব্যাংকিং সমস্যা সামাল দিতে ১৯৩৫ সালে গঠিত হয় ভারতীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক। চার বছর পর শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫)। বিশ্বযুদ্ধ শেষ হতে না হতেই ১৯৪৬ সালে সংঘটিত হয় ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ১৯৪৭ সালে ঘটে দেশভাগ। একের পর একধরনের দুর্যোগের কারণে প্রচুর সংখ্যক ব্যাংক বন্ধ হয়। ড. আর এম. দেবনাথ উল্লেখ করেন যে, ১৯১৩-১৭ সালের মধ্যে অবিভক্ত ভারতে ৭৮টি ব্যাংক বন্ধ হয়। এরপর ১৯২২-৩২ সালের মধ্যে বন্ধ হয় ৩৭৩টি ব্যাংক। ১৯৩৭-৪৮ সালের মধ্যে বন্ধ হয় ৬২০টি।[৩২] তবে এসব ব্যাংকের বেশির ভাগই ছিল ঢাকার বাইরে।

ব্যাংক বন্ধের উপরোক্ত কারণগুলো ছাড়াও অন্যান্য যেসব কারণ ছিল তা হলো— কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণের অভাব, উপযুক্ত আইন কাঠামোর অনুপস্থিতি, সরকারি নিয়ন্ত্রণের অনুপস্থিতি, ব্যাংকগুলোর অল্প মূলধনভিত্তি, অসীম দায়সংবলিত ব্যাংক ব্যবস্থা, বিনিয়োগের ক্ষেত্রাভাব, ফটকাবাজীতে টাকা বিনিয়োগ, সমন্বিত নীতিমালার অভাব এবং ব্যাংকের মালিক ও কর্মচারীদের অসততা, জালিয়াতি ও টাকা আত্মসাৎ ইত্যাদি।

সুতরাং স্বাধীনতার পূর্বে ঢাকায় কোনো বাণিজ্যিক ব্যাংক ছিল না। 'দি ইম্পেরিয়াল ব্যাংক অব ইন্ডিয়া' বা পরবর্তীতে সেই ব্যাংক, 'ব্যাংক অব ইন্ডিয়া' নাম ধারন করে ট্রেজারি এবং সরকারি অন্যান্য কার্য পরিচালনা করত। ঋণদানকারী কোম্পানি 'দি ইউনিয়ন ব্যাংক'

Dhaka University Institutional Repository

এই জাতীয় অন্যান্য কলকাতা ব্যাংকের শাখা ছিল। যারা মূল্যবান স্বর্ণালংকার অথবা জমি জমা সম্পত্তির বিপরীতে ঋণ প্রদান করত। ঢাকার ব্যবসা-বাণিজ্য অভ্যন্তরীণ হওয়াতে কোনো বাণিজ্যিক ব্যাংক পরিচিত ছিল না এবং দরকারও ছিল না। নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিম, কমলাঘাট, নরসিংদী, বাবুরহাট, ঝিটকা, ধামরাই, এবং জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে অন্যান্য মোকাম ছিল মুখ্য ব্যবসা কেন্দ্র এবং ঢাকার বাণিজ্য কলকাতার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল।

যাহোক দেশভাগের পর পূর্বাঞ্চলকে তার নিজের পায়ে দাঁড়ানোর প্রয়োজন ছিল। ব্যাংকের ছিল নিজস্ব আমদানি রপ্তানি ব্যবসার ভার। কলকাতার প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকগুলো কাজ বন্ধ করে দিলে কোনো সাহায্য পাওয়া যায় নি। কাজেই বড় রকমের শূন্যতা পূরণ করার প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু হাতে সময় ছিল কম। বলা বাহুল্য, যে শূন্যতা সৃষ্টি হয় তা বাঙালি মুসলমান পূরণ করতে পারে নি। এর অনেক কারণ ছিল। "প্রথমত, সমতল সমাজ হওয়ায় বাঙালি মুসলমান সমাজে ব্যবসায়ী বলে কোনো সম্প্রদায় ছিল না। অধিকন্তু ছিল ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে অভিজ্ঞতার অভাব। এ কারণে দেখা যায় পুরো ব্রিটিশ আমলে (১৭৫৭-১৯৪৭) ব্যবসা-বাণিজ্যের জগতে বাঙালি মুসলমান প্রায় অনুপস্থিত। তারা নিয়োজিত ছিল মূলত কৃষিকাজে। এমতাবস্থায় পাকিস্তান সৃষ্টির পর নতুন সম্ভাবনা দেখা দিলেও তারা এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারে নি। শিক্ষার অভাব, চাকরি সূত্রে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার অনুপস্থিতি, পুঁজির অভাব, কৃষি থেকে উদ্বৃত্ত সংগ্রহে অপরাগতা ও প্রশাসনিক অভিজ্ঞতার অভাব ইত্যাদি এর প্রধান কারণ।"[৩৩]

এ অবস্থায় ভারতবর্ষ যখন পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটো দেশে রূপান্তরিত হয়, তখন বাঙালি মুসলমান সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়ে। এই সুযোগে শূন্যতা পূরণে এগিয়ে আসে ভারত থেকে শরণার্থী হিসেবে আগত অবাঙালি মুসলমান। তারাই পাকিস্তান আমলে ব্যবসা ও শিল্পে পূর্ব পাকিস্তান তথা সারা পাকিস্তানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

পাকিস্তান আমলের বাণিজ্যিক ব্যাংককে দুটো ভাগে ভাগ করা যায়— (১) তফসিলি বা scheduled banks, (২) অ-তফসিলি বা Non scheduled banks. একটি রিপোর্টে তফসিলি ব্যাংকের সংজ্ঞা দেয়া হয় এভাবে— A scheduled bank is a bank having paid up capital and reserve of Rs. 5 lakhs or more and declared to be a scheduled bank under section 37(3)(a) of the state Bank of Pakistan Act. 1956.[৩৪]

স্বাধীনতার পূর্বে অবিভক্ত ভারতের তফসিলি ব্যাংক ও অ-তফসিলি ব্যাংকের শাখা সংখ্যা সমান ছিল। পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত এলাকায় অ-তফসিলি ব্যাংকের শাখার সংখ্যা তফসিলি বা সিডিউল ব্যাংকের শাখার চেয়ে বেশি ছিল। ব্যাংক ব্যবসার ক্ষেত্রে অ-তফসিলি ব্যাংকের মাধ্যমে যে ঋণ ডিপজিট প্রদান করা হতো তার পরিমাণ ছিল সামান্য। সংখ্যা দেখে সহজে বোঝা যায় যে, অ-তফসিলি ব্যাংকের গুরুত্ব ক্রমশ হ্রাস পায় এবং এগুলোর সংখ্যা ১৯৪৭ সালে ৭০৪টি থেকে ক্রমশ হ্রাস পেয়ে ১৯৬৩ সালের দিকে ৪৯ টিতে দাঁড়ায়।[৩৫]

Dhaka University Institutional Repository

অন্যদিকে পাকিস্তানি আমলে তফসিলি ব্যাংকের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। স্বাধীনতার সময়ে ২টি ব্যাংকের বিপরীতে ১৯৬৩ সালের দিকে তাদের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫।[৩৬]

একটি রিপোর্টে ১৯৬৩ সালের ব্যাংকের অগ্রগতি সম্পর্কে জানা যায় যে, ১৯৬২ সালের শেষের দিকে ৩৫টি ব্যাংকের বিপরীতে ১৯৬৩ সালের শেষের দিকে তফসিলি ব্যাংকের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৬। এই সময় আরো কয়েকটি নতুন ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। The Standard Bank Ltd., The Commerce Bank Ltd., The Standard Co-operative ব্যাংক সম্পর্কে বলা হয় যে, The Standard Co-operative Bank Ltd. which was scheduled on August 25, 1962 was descheduled with effect from July 8, 1963.[৩৭]

অন্যদিকে তফসিলি ব্যাংকের শাখার সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকে। ১৯৬২ সালে-এর সংখ্যা ৮৩১টি থেকে ১৯৬৩ সালে ১১৩০টি দাঁড়ায়। এই ১১৩০টি শাখার মধ্যে ৩৬২টি পূর্ব পাকিস্তানে এবং ৭৬৮টি পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত। যেখানে ১৯৬২ সালে ছিল যথাক্রমে পূর্ব পাকিস্তানে ২৫৩টি এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ৫৭৮টি।

তফসিলি ব্যাংকের মূলধনের পরিমাণ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়—"The paid up capital and reserves of Pakistani scheduled bank showed marked increase from Rs. 20.85 crores and Rs. 8 crores at the end of 1962 to Rs. 22.73 crores and Rs. 8.56 crores resepectively at the end of 1963."[৩৮]

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির প্রাক্কালে দেশে আধুনিক ব্যাংক ছিল মাত্র একটি। এর নাম অস্ট্রেলেশিয়া ব্যাংক। এই ব্যাংকটি ছিল পাকিস্তান ভিত্তিক। দেশভাগের পর প্রথম ব্যাংক ছিল স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান (State Bank of Pakistan) এবং পরবর্তী ব্যাংক ছিল ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান (National Bank of Pakistan)।

রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার উত্তরাধিকারসূত্রে স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের কার্যালয় করাচিতে স্থাপিত হয় ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট। ১৬৬ জন কর্মচারী এবং নিম্নবর্ণিত বিভাগ নিয়ে স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান গঠিত হয়। এগুলো—

১. ইস্যু বিভাগ (Issue Department)।

২. ডিপজিট একাউন্ট বিভাগ (Deposit Accounts Department)।

৩. এক্সচেইঞ্জ কনট্রোল বিভাগ (Exchange Control Department)।

পাকিস্তানের উভয় অংশে তথা পূর্ব ও পশ্চিম অংশে ব্যাংকের কেন্দ্রীয় দপ্তরের নয়টি অফিস ছিল। এরমধ্যে তিনটি পূর্ব পাকিস্তানে এবং ৬টি পশ্চিম পাকিস্তানে। কেন্দ্রীয় পরিদপ্তরের অধীনে ব্যাংকের কার্যক্রম পরিচালিত হতো।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে করাচিতে পাবলিক ডেট অফিস (Public Debt Office) স্থাপন করা হয়। ১৯৪৮ সালের এপ্রিলে করাচিতে 'The Public Accounts Department' খোলা হয়।[৩৯]

উপরে উল্লিখিত বিভাগ ছাড়াও অন্যান্য বিভাগ স্থাপন করা হয়। সুতরাং স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান নিম্ন বর্ণিত বিভাগ নিয়ে গঠিত ছিল[৪০]—

1. Chief Accounts Department
2. Secretary's Department
3. Establishment Department
4. Inspection Department.

Inspection Department আবার ৩টি ভাগে বিভক্ত ছিল :

   a. Inspection Division
   b. Organisation and Methods Division
   c. Audit Division.

5. Banking Control Department.

এই বিভাগের কাজ অনেক ব্যাপক ছিল। যা State Bank of Pakistan -এ উল্লেখ করা হয় এভাবে—

a. Supervision and control of commercial banks with a view to developing a sound and healthy banking system.

b. Execution of Credit Control Policies so far as they concern credit institutions particularly commercial banks.

c. Promotion of banking and credit facilities in the country.

d. Dealing with loan applications from banks and requests of Government for grant of counter finance facilities to banks to meet Government's special requirements.

উল্লেখ্য এই বিভাগ (Banking Control Department) উপরের দায়িত্ব নিম্নলিখিত বিধিবদ্ধ আইনের মাধ্যমে সম্পাদন করত:[৪১]

a. State Bank of Pakistan Act, 1956.

b. Banking Companies (Control) Act, 1948.

c. Banking Companies (Restriction of Branches) Act, 1946.

d. Banking Companies (Inspection) Ordinance, 1946.

Dhaka University Institutional Repository

e. Capital Issues (Continuance of control) Act, 1947.

f. Part XA of the Companies Act, 1913.

g. Banking Companies (Control) Rules, 1949.

h. State Bank of Pakistan Scheduled Banks Regulations.

আরো যে সব বিভাগ ছিল[৪২]—

6. Exchange Control Department

7. Agricultural Credit Department

8. Department of Statistics

9. Research Department.

10. Engineering Department.

এখন দেখা যাক ঢাকায় স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের কার্যক্রম কী ছিল। স্বাধীনতার পূর্বে পাকিস্তানে 'রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার' কোনো শাখা ছিল না। কলকাতা রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার মাধ্যমে এই অঞ্চলে সকল কেন্দ্রীয় কার্যক্রম পরিচালিত হতো। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে তৎকালীন সরকার ঢাকায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথা ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার ১টি শাখা খোলার জন্য অনুরোধ করে। কিন্তু আবাসন, দক্ষ জনবল ও সংগঠনের তীব্র সমস্যা ছিল। একসময় এই সমস্যা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে একটি শাখা উদ্বোধন করা হয়।

মাত্র দুটি বিভাগ নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে-এর কার্যক্রম শুরু হয়। বিভাগ দুটি হলো— 'দ্যা ডিপজিট একাউন্টস ডিপার্টমেন্ট' (The Deposits Accounts Department), দ্যা 'এক্সচেইঞ্জ কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্ট' (The Exchange Control Department)।

এরপরই Public Debt Office স্থাপন করা হয়। তারপর The Issue Department এবং সবশেষে ১৯৪৮ সালে অক্টোবর মাসে The Public Account Department স্থাপন করে ব্যাংকিং-এর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পূর্ণ করে। পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাংক ব্যবস্থার সংস্কার এবং ব্যাংক ব্যবস্থায় উন্নয়নের জন্য ১৯৪৯ সালে ঢাকায় ব্যাংকিং কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্ট (Banking Control Department) চালু হয়। পূর্ব পাকিস্তানে অর্থনৈতিক সমস্যার পর্যবেক্ষণের জন্য রিসার্চ এন্ড এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট সেকশন (Research and Agricultural Credit Section) চালু করা হয়। ফলে পূর্ব পাকিস্তানে কৃষি ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা এবং এর বৃদ্ধির জন্য ১৯৬১ সালের জানুয়ারিতে ঢাকায় "দ্যা এগ্রিকালচারাল ডিপার্টমেন্ট (The Agricultural Department) স্থাপন করা হয়।

এছাড়া পূর্ব পাকিস্তান তথা ঢাকায় স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের কার্যক্রম সম্পর্কে আরো বলা হয়[৪৩]—

Dhaka University Institutional Repository

"In order to eliminate delays involved in referring certain matters for decision to the Central Directorate of the Bank at Karachi and also to study economic problems of East Pakistan on the spot and suggest remedies, a Deputy Governor has been stationed at Dacca."

দেশে বাণিজ্যিক ব্যবসার উন্নয়নে ১৯৪৯ সালের নভেম্বরে 'ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাকালীন সময় এর মূলধনের পরিমাণ ছিল ৬০ মিলিয়ন রুপি। যার মধ্যে ২৫ মিলিয়ন রুপি কেন্দ্রীয় সরকার প্রদান করে। ব্যাংকটি তার সকল কার্যক্রমের পরিবেশ সফলভাবে স্থাপন করে। ১৯৫০ সালে ব্যাংকের ডিপজিটের পরিমাণ ছিল ৬৪.৪ মিলিয়ন রুপি, ১৯৫১ সালে ২০০.৮ মিলিয়ন রুপি এবং ১৯৫২ সালে ২৮৬.০ মিলিয়ন রুপি এবং ১৯৫৩ সালে ৩৪০.৩ মিলিয়ন রুপি বৃদ্ধি পায়। ১৯৫০-এর দশকে এ ব্যাংকের তিনটি বিদেশি শাখাসহ (জেদ্দা, কলকাতা এবং লন্ডন) ৬০টি শাখা ছিল।[৪৪]

ন্যাশনাল ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পর থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য স্বল্প মেয়াদি ঋণ সরবরাহ করা হতো। এছাড়া এই ব্যাংক দেশের অর্থকরী ফসল (পাট, সুতা) বাজারজাতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। এই বিষয়ে ১৯৬০-এর দশকের একটি রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে, "The National Bank of Pakistan emerged as the saviour of the cotton trade when it was under the grip of crisis during 1950-51. The magnitute of the work done by the Bank can be Judged from the fact that during this period more than 75 per cent of the cotton finance of the country was provided by it. Today it is still the largest financier of Jute and Cotton in the country."[৪৫]

১৯৫০ সালের ৪৭.৭ মিলিয়ন রুপি এবং ১৯৫১ সালের ২০৮.৯ মিলিয়ন রুপির তুলনায় ১৯৫২ সালে সবচেয়ে বেশি অগ্রিম প্রদান করা হয়। O. G. L. বাতিল করা সত্ত্বেও এই ব্যাংক আমদানিকৃত দ্রব্যের বিপরীতে সুবিধাজনক অন্য বস্তুর জন্য অগ্রিম প্রদান করে। ১৯৫৩ সালে যার পরিমাণ ছিল ২৪৪.৪ মিলিয়ন রুপি[৪৬] [Despite the cancellation of the O.G.L. resulting in an appreciable fall in the demand for accommodation against imported goods, advances, granted by the Bank in 1953 amounted to Rs. 244.4 million]

১৯৫০-এর দশকে অর্থনৈতিক পর্যবেক্ষণে আরো উল্লেখ করা হয় যে, The Bank also finalized the Agency Agreement with the State Bank of Pakistan early this year and is now operating 20 currency chests and 5 sub-chests, thus making remittance facilities under the State Bank's Scheme available to the public.[৪৭]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬২ সালের রিপোর্টে দেখা যায় যে, ঢাকা শহরে ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তানের ৪টি শাখা, ৫টি প্রধান অফিস (Principal Office) এবং ২টি উপ-শাখা (Sub-Branch) ছিল। এগুলো হলো—

সারণি-১

National Bank of Pakistan

Sl. No.	Principal Office	Branch	Sub-Branch
1.	Airport, Dacca	Azimpur, Dacca	Cantt. Dacca
2.	Municipality, Dacca	Chowk Bazar, Dacca	Moulvi Bazar, Dacca
3.	P. I. D. C, Dacca	Paribagh, Dacca	-
4.	New Market, Dacca	Ramna, Dacca	-
5.	University, Dacca	-	-

উৎস : *Banking Statistics of Pakistan* 1961-62, State Bank of Pakistan, pp. 115-122.

এছাড়া পাকিস্তান সৃষ্টির পর ১৯৪১ সালে বোম্বেতে প্রতিষ্ঠিত 'হাবিব ব্যাংক' তার প্রধান কার্যালয় পাকিস্তানের রাজধানী করাচিতে স্থানান্তরিত করে। তারপর ১৯৪৮ সালে আরো দুটো ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত সালের সেপ্টেম্বরে প্রতিষ্ঠিত হয় 'মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক' এবং অক্টোবরে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ব্যাংক অব ভাওয়ালপুর'।

১৯৬২ সালের রিপোর্টে দেখা যায় যে, হাবিব ব্যাংক ও মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংকের শাখা ঢাকায় ছিল। ঢাকা শহরের যেসব জায়গায় এই দুটো ব্যাংকের শাখা ছিল তা হলো—

Habib Bank Ltd.

a. Nawabpur Road, Dacca.
b. Tejgaon, Dacca.
c. Moulvi Bazar, Dacca.
d. Sadarghat, Dacca.
e. Ramna, Dacca.

Muslim Commercial Bank

a. Mitford Road, Dacca.
b. Johnson Road, Dacca
c. New Market, Dacca.
d. Ramna, Dacca.

উৎস : *Banking Statistics of Pakistan* 1961-62, Department Statistics, state of Pakistan, pp. 115-122.

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-২

Banking Satatistics

Liabilities and Assets of Certain Schedule Banks operation in East Pakistan during the years 1954-1955

(Figures are in thousands of Rupees

Sl. No	Names and Addresses of the Banks	Date of Balance Sheet	Paid up capital	Reserves	Acceptance loans and bills payable	Miscella-neous credit
1	2	3	4	5	6	7
1.	United Bank of India Ltd., Dacca	31st December 1954	-	-	27,61	16,38
		31st December 1955	-	-	63,36	13,02
2.	Habib Bank, Maulivi Bazar, Dacca	31st December 1955	1,50,00	1,50,00	5,12,66	9,08,35
3.	The Muslim Commercial Bank, Ltd. Dacca	30th september 1954	75,03	19,79	3,72,24	11,88
4.	National Bank of Pakistan, Dacca	31st December 1954	1,50,00	50,00	15,44,51	30,70
		31st December 1955	1,50,00	65,00	11,80,76	13,54

Dhaka University Institutional Repository

Deposits and current accounts	Profit or loss(-)	Total Liabilities or Assets	Cash in hand and at Bank and Bullion	Investments in Government and other securities	Bill of Exchange and Bill recivable	Bills discounted loans and advances	Buildings and sundries including loans and advances	No. of Branch Offices in East pakistan
8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.11.77	6	4.55.82	1.09.22	2.14.11	17.44	85.09	29.96	15
4.90.66	12	5.67.16	88.74	2.89.88	53.78	10.308	31.68	15
46.87.26	8.58	64.88.85	13.10.63	24.26.12	11.86.79	14.90.11	75.20	9
10.37.46	2.60	15.19.00	1.56.44	3.08.67	2.72.35	7.40.54	41.00	6
33.02.66	18.41	50.96.28	18.64.93	12.63.98	37.27	18.28.34	1.01.76	17
40.18.50	3.04	54.30.84	12.76.20	15.43.35	41.22	24.56.92	1.13.15	18

উৎস : *Statistical Abstract for East Pakistan*, Government of East Pakistan, vol. IV (1st Impression), 1958, pp. 320-321.

সারণি-৩

Habib Bank Index of Shares

(April, 1963 to March, 1964)

Group	April 1963	June 1963	August 1963	October 1963	December 1963	January 1964	February 1964	March 1964
Banks	324.07	298.71	290.18	277.64	287.03	287.20	393.94	285.43
Insurance	407.29	396.00	380.91	360.50	357.59	363.11	363.37	360.59
Textiles	355.86	318.27	308.39	290.81	303.42	302.79	316.17	307.31
Jutes	176.70	173.42	171.00	162.04	169.56	170.15	176.67	176.57
Miscellaneous	160.16	150.83	147.38	143.34	154.25	155.72	163.26	158.55
All shares (index)	273.14	254.06	246.66	235.01	241.73	242.86	250.71	245.00

উৎস : *Economic Survey of Pakistan 1963-64*, Ministry of Finance, Rawalpindi, p. 169.

Dhaka University Institutional Repository

এদিকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ১২ বছর পরেও পূর্ব পাকিস্তানভিত্তিক কোনো আধুনিক ব্যাংক গড়ে না ওঠায় অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। ইতোমধ্যে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন জোরদার হয়। ভাষার প্রতি বৈষম্যের পর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাঙালিদের উপেক্ষা করা হয়। এর প্রতিফলন ঘটে রাজনীতিতে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে শাসক দল মুসলিম লীগের ভরাডুবি হয়। এ প্রেক্ষাপটে আইয়ুব খানের সামরিক শাসন আসে ১৯৫৮ সালে। ইত্যবসরে সরকারি মহলে ধারণা সৃষ্টি হয় যে, পুঁজির অভাবে পূর্ব পাকিস্তানি উদ্যোক্তারা ব্যাংক গঠনে এগিয়ে আসতে পারছে না। তাই সিদ্ধান্ত হয় সরকারি উদ্যোগে এখানে শিল্প ও ব্যাংক ইত্যাদি সৃষ্টি করা। বলা হয় পুঁজি দিয়ে উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা সম্ভব। এই প্রেক্ষাপটে পাকিস্তান আমলের মাঝামাঝি সময়ে (১৯৫৯) ব্যাংক ব্যবসায় বাঙালির আবির্ভাব হয়। প্রতিষ্ঠিত হয় 'ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক'। উল্লেখ্য ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক পুরোপুরি বাঙালি মালিকানাধীন ছিল না। এটি ছিল বাঙালি-অবাঙালির যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ব্যাংক। চট্টগ্রামে প্রধান কার্যালয় স্থাপন করে ব্যাংকটির যাত্রা শুরু হয় ১৯৫৯ সালের ১১ মে। পূর্ব পাকিস্তানে এটিই তফসিলি ব্যাংক। এই ব্যাংকের মূলধনে 'স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান' অংশগ্রহণ করে। সরকারি সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত 'ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক'-এর উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন (১) গ্রাহামস ট্রেডিং কোম্পানি (পাকিস্তান) লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও. আর. নিজাম, (২) এ. কে. খান এন্ড কোম্পানি লিমিটেডের পক্ষে শিল্পপতি এম. আর. সিদ্দিকী, (৩) চা ব্যবসায়ী খান বাহাদুর মুজিবুর রহমান, (৪) ব্যবসায়ী মির্জা মোহাম্মদ আলী ইস্পাহানী, (৫) বগুড়া কটন স্পিনিং কোম্পানি লিমিটেডের অংশীদার এবং ম্যানেজিং এজেন্ট ও শিল্পপতি হাবিবুর রহমান, (৬) পাবনার ইস্ট পাকিস্তান ড্রাগস এন্ড কেমিক্যাল (এডরুক ল্যাবরেটরি)-এর ব্যবস্থাপনা অংশীদার এ. এইচ. খান। ব্যাংকটির অনুমোদিত মূলধন ছিল পঞ্চাশ লক্ষ টাকা, যা দশ টাকা মূল্যের পাঁচ লক্ষ শেয়ারে বিভক্ত ছিল। ছয়জন উদ্যোক্তার প্রত্যেকেই মূলধন হিসেবে দশ হাজার টাকা করে প্রদান করেন। সূচনা পর্বে ব্যাংকটিকে পঁচিশ লক্ষ টাকা মূলধন ইস্যু করার অনুমতি প্রদান করা হয়। ১৯৭০ সালে ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন ত্রিশলক্ষ পঁচিশ হাজার টাকায় উন্নীত হয়। ব্যাংকের পরিচালনা বোর্ডে যে সাতজন পরিচালক ছিলেন তাঁরা হলেন : (১) সাবেতুন রহমান, (২) ড. নঈমুর রহমান, (৩) এ. এফ. এম. নূরুল মতিন, (৪) আব্দুস সালাম, (৫) আলহাজ্ব মাজহারুল হক চৌধুরী, (৬) এস. এম. হোসেইন, (৭) মঞ্জুরুর রহমান।

১৯৭০ সালে মার্কেন্টাইল ব্যাংকের শাখা সংখ্যা ১০৫টি এবং মোট আমানত ছিল ৩২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা।[৪৮] উল্লেখ্য এই ব্যাংকের দুটি শাখা ঢাকা শহরে ছিল।

১৯৬০-এর দশকের গোড়াতে পশ্চিম পাকিস্তানে অনেক ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে একটি ব্যাংক ছিল ব্যতিক্রমধর্মী। এটি হচ্ছে 'ইউনাইটেড ব্যাংক লিমিটেড'। হাবিব ব্যাংক থেকে বেরিয়ে এসে আগা হাসান আবেদি নামীয় এক আগা খানি ব্যবসায়ী এটি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ব্যাংকিং শুরু করেন। পূর্ব পাকিস্তানি আমলা, রাজনৈতিক নেতা, ভূ-স্বামী ও প্রভাব প্রতিপত্তিশালী লোকদের সন্তান-সন্ততি ও পোষ্যদের

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর ব্যাংকে নিয়োগ দিয়ে তিনি পূর্ব পাকিস্তানে তাঁর ব্যাংকের কার্যাবলি কেন্দ্রীভূত করেন। শাখা খুলেন গ্রাম-গ্রামান্তরে। ঢাকা শহরে এই ব্যাংকের ৪টি শাখা ছিল; এগুলো হলো—

১. ইমামগঞ্জ, ঢাকা

২. রমনা, ঢাকা

৩. নবাব রোড, ঢাকা

৪. সদরঘাট, ঢাকা

উৎস: *Banking Statistics of Pakistan* 1961-62, pp. 115-122.

এদিকে প্রতিযোগিতায় বাধ্য হয়ে হাবিব ব্যাংক ও মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক ইত্যাদিও গ্রামাঞ্চলে শাখা খুলতে শুরু করে। কিন্তু এতেও বাঙালির অসন্তোষ দূর হয় নি। বলা হয় পাকিস্তানভিত্তিক এসব ব্যাংকে বাঙালিকে 'ব্যবস্থাপক' 'মহাব্যবস্থাপক' ইত্যাদি করা হয় না, ব্যবস্থাপনা পরিচালক তো দূরের কথা, বাঙালিকে ব্যবহার করা হয় শুধু আমানত সংগ্রহের কাজে। আমানত সংগ্রহ করে তা পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠানো হয়। বাঙালি অফিসারকে ক্রেডিট ও ফরেন একচেঞ্জ বিভাগের কাজ শেখানো হয় না। ধূমায়িত এই অসন্তোষের মাঝেই বাঙালি নিজস্ব একটি ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এই প্রেক্ষাপটে সম্পূর্ণ বাঙালি মালিকানায় ১৯৬৫ সালের ২৮ জানুয়ারি গঠিত হয় ইস্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশন। এই ব্যাংকে সরকার অথবা 'স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের' কোনো পুঁজি ছিল না। ঢাকায় প্রধান কার্যালয় স্থাপন করে ইস্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশন ১৯৬৫ সালের জুন মাসের ২২ তারিখ 'তফসিলি ব্যাংক' হিসেবে কাজ শুরু করে। প্রাথমিক অবস্থায় এই ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন ছিল ১৪ লক্ষ ২১ হাজার টাকা। ইস্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশন, নাথ ব্যাংক, এর শাখাসমূহ ও এদের সম্পদ এবং দায়-দায়িত্ব অধিগ্রহণ করে। ব্যাংকের প্রধান প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন (১) ব্যবসায়ী জহুরুল ইসলাম, (২) প্রাক্তন চিফ ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল জব্বার, (৩) ক্যাপ্টেন জগদীশ দেবনাথ। প্রথম চেয়ারম্যান হন নুরুল আমীন। যিনি পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন।

স্বাধীনতার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে এ ব্যাংকের পরিচালনা বোর্ডে ছিলেন (১) এন. হামিদুল্লাহ (বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রাক্তন গভর্নর), (২) দৈনিক সংবাদের সম্পাদক ও চা ব্যবসায়ী আহমুদুল কবীর, (৩) নুরুল আমীন, (৪) মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ব্যবসায়ী সাঈদুল হাসান, (৫) ব্যবসায়ী কাজী মেজবাহ উদ্দিন, (৬) ময়মনসিংহের গফরগাঁও-এর ক্যাপ্টেন জগদীশ দেবনাথ।

স্বাধীনতার পূর্বে 'ইস্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশনের' আদায়কৃত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিলের পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৬ লক্ষ টাকা। এ সময়ে ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ২৮ কোটি টাকা এবং সর্বমোট শাখা সংখ্যা ছিল ১৪৯৩। এখানে উল্লেখ্য যে, ইস্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশন ও ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক দুটো মূলত ছিল পূর্ব পাকিস্তানকেন্দ্রিক। অন্যান্য পাকিস্তানি ব্যাংকের তুলনায় এই ব্যাংক দুটো আকারে ও সম্পদে ছোট ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান কৃষি ব্যাংক (Agricultural Bank of Pakistan) ১৯৫৯ সালের ৯ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৫৯ সালের জানুয়ারিতে পূর্ব পাকিস্তানে ঋণ বা লোন কার্যক্রম আরম্ভ করে এবং পশ্চিম পাকিস্তানে একই বছরের এপ্রিলে শুরু হয়। প্রথম বছর ২১০০ জন কৃষকের জন্য ৯ মিলিয়ন রুপি ঋণ অনুমোদন করে।[৪৯]

এভাবে ১৯৬০ সালের মার্চ মাসের শেষের দিকে দেখা যায় যে, ১২ বছরের কম সময়ে পাকিস্তানের সিডিউল (Schedule) ভিত্তিক ব্যাংকের সংখ্যা ২৫ থেকে ৩৩৭-এ বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বরের শেষের দিকে ব্যাংকের অগ্রগতি সম্পর্কে নিম্নবর্ণিত তালিকা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাবে—

সারণি-৪

As on 1st July 1948 No. of scheduled banks	No. of Bank Offices			As at the end of December 1959 No. scheduled banks	No. of Bank Offices		
	W.pak	E.pak	Total		W.pak	E.pak	Total
Pakistan Bank – 2	23	2	25	10	253	71	324
Indian Bank- 29	45	106	151	10	10	27	37
Exchange Bank-7	16	3	19	9	23	12	35
38	84	111	195	29	286	110	396

উৎস :: *Pakistan Trade*, October 1960, p. 146.

উপরের তালিকায় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, পাকিস্তানের সিডিউল ব্যাংকের সংখ্যা ১৯৪৮ সালে যেখানে ২টি ছিল, ১০ বছর পর তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১০টি। আরো দেখতে পাওয়া যায় যে, পাকিস্তানের এসব তফসিলি ব্যাংকের অফিসের সংখ্যা পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে বেশি ছিল। অপর দিকে ১৯৪৮ সালে ভারতীয় ব্যাংক বা Indian Bank-এর তফসিলি বা Scheduled ব্যাংকের সংখ্যা ছিল ২৯। কিন্তু ১০ বছর পর তথা ১৯৫৯ সালে কমে ১০টি হয়। এছাড়া এসব ভারতীয় ব্যাংকের অফিসের সংখ্যা পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে পূর্ব পাকিস্তানে বেশি ছিল। আবার ১৯৪৮ সালে Exchange Bank-এর সংখ্যা ছিল ৭টি, ১০ বছর পর এই ব্যাংকের সংখ্যা হয় ৯টি। পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে এই ব্যাংকের অফিসের সংখ্যা বেশি ছিল। সুতরাং বলা যায় যে, এই সময় (পাকিস্তানি আমলে) পাকিস্তানি ও ভারতীয় ব্যাংকের আধিপত্য ছিল। বাঙালির নিজস্ব মালিকানাধীন ব্যাংকের সংখ্যা ছিল না বললেই চলে। তবে ১৯৫৯ সালে গঠিত ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক ছিল বাঙালি-অবাঙালির যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ব্যাংক।

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন ব্যাংক (Industrial Development Bank of Pakistan (I.D.B.P)):

শিল্পের উন্নয়ন পাকিস্তান শিল্পায়ন নীতির একটি বড় উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য কার্যকর করতে আইডিবিপি একটি বড় ভূমিকা রাখে। অনুন্নত অঞ্চলের মাঝারি ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের মধ্য থেকে নতুন প্রতিযোগীদের একটি সংখ্যাকে এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য আইডিবিপি সাহায্য করত। এই ব্যাংকের প্রাথমিক উদ্দেশ্য অনুসারে এর লক্ষ্য ছিল ঋণের ব্যাপ্তি এবং মালিকানার ভিত্তি এমনভাবে স্থাপন করা যাতে একটি মাঝারি শ্রেণির শিল্প উদ্যোক্তা সৃষ্টির প্রক্রিয়া তৈরি হয়। যে সকল ব্যক্তিগত প্রকল্পের সাধারণ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে তাদেরকে অর্থায়ন করতে এই ব্যাংক ছিল অঙ্গীকারাবদ্ধ। সুতরাং স্বতন্ত্র প্রকল্পের উৎপাদনশীলতায় বিনিয়োগের জন্য প্রতিটি ইউনিটকে বিবেচনায় আনা হয়। শিল্প বিনিয়োগ সময়সূচিতে প্রতিফলিত দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আওতায় শিল্পের উপর জোর দেয়া হয়। যার মূল উদ্দেশ্য ছিল—ক. পাকিস্তানের উৎপাদনের উদ্বৃত্ত উপাদান ব্যবহার করা (Lead to the use of Pakistan's surplus factors of production), খ. বৈদেশিক বিনিময় অর্জন / সঞ্চয়ে সাহায্য করা (Possess foriegn exchange earnings/ savings potential)।[৫০]

এই ব্যাংক নতুন শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠা এবং বিদ্যমান ইউনিটের আধুনিকায়নের জন্য অর্থ প্রদান করে। স্বতন্ত্র হিসেবে পূর্বগামী থেকে P.I.F.C.O; (Pakistan Industrial Finance Corporation), I.D.B.P (Industrial Development Bank of Pakistan) সীমাবদ্ধ দায়যুক্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানেক্ষেত্রে (লিমিটেড কোম্পানিজ) ধারের স্তর ১০ লক্ষ রুপি হ্রাস করা হয় এবং অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ৫ লক্ষ রুপি হ্রাস করা হয়।[৫১] এখানে আরো বলা হয় যে, "This ceiling, however did not apply to Jute, Cotton, inland water transport, mining and such other industries as might be specified by the Government of Pakistan from time to time."[৫১(ক)]

এক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আমদানিকৃত যন্ত্রপাতির মূল্য, অভ্যন্তরীণ মূল্য এবং উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের প্রকৃতমূল্য অকল্পনীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফলে সীমাবদ্ধ দায়যুক্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে (লিমিটেড কোম্পানিজ) বৈদেশিক বিনিময় ১৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষে বৃদ্ধি পায় এবং অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য ৫ লক্ষ থেকে ১০ লক্ষে বৃদ্ধি পায়।[৫২]

বিনিয়োগ কার্যক্রমে আইডিবিপি-এর ভূমিকা

পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, আইডিবিপি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের উভয় অংশের জন্য ২৯.৪৫ কোটি রুপি (দেশীয় রুপি ও বৈদেশিক মুদ্রায়) অনুমোদন করে। এর মধ্যে ১৬.৪৯

Dhaka University Institutional Repository

কোটি রুপি পূর্ব পাকিস্তানের জন্য অনুমোদন করে এবং অবশিষ্টাংশ পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠানো হয়।[৫৩] মোট ঋণের ৬.৯৬ কোটি রুপি দেশীয় মুদ্রায় মঞ্জুর করা হয়।

এই সময় (১৯৬৩-৬৪) ব্যাংকের নীতি অনুসারে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রয়োজনীয় ঋণের চাহিদা পূরণ করতে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হয়। ব্যাংকের ঋণ বা ধার দেয়ার পরিমাণ ১০ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ রুপিতে বৃদ্ধি পায়। এছাড়া মাঝারি বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করতে ব্যাংকের কার্যক্রম অনেক নমনীয় ছিল।

এদিকে আগাম ঋণের ক্ষেত্রে এই ব্যাংক বিভিন্ন ধরনের শিল্প ও অঞ্চলের মধ্যে ঋণ ও বিনিয়োগ বণ্টনের নীতি অনুসারে পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করত। তবে এরূপ নীতি দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগে না ন্যূনতম ঝুঁকি গ্রহণ করে, না কোনো শিল্পের উন্নয়নের দিকে নজর দেয়। যা পাকিস্তানের মত উন্নয়নশীল দেশের দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

মঞ্জুরীকৃত ঋণের ক্ষেত্রে এই ব্যাংক বিদ্যমান এবং নতুন ইউনিটের মধ্যে বণ্টনের ভারসাম্য তথা সমবণ্টনের চেষ্টা করত। নতুন ইউনিট (শিল্প) স্থাপন করতে প্রায় ৫৮% ঋণ অনুমোদন করে। পূর্ব পাকিস্তানের নতুন শিল্পকারখানা স্থাপনের জন্য ৪২৬টি ঋণের মধ্যে ৩০৬টি ঋণ (প্রায় ৭৯%) এবং ২১% বিদ্যমান পুরাতন শিল্পকারখানার আধুনিকায়নের জন্য অনুমোদন করে।[৫৪] পূর্ব পাকিস্তানের নতুন শিল্পের জন্য ঋণের অনুপাতের সত্যতা প্রতিপাদন করা হয় ঐ প্রদেশের মূলধন গঠনের স্বল্পতা এবং শিল্পের অভাবের মাধ্যমে।

অপরদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের ঋণের অধিকাংশ (সংখ্যাগরিষ্ঠ) অংশ তথা ৫৯% বিদ্যমান শিল্পের বিস্তার, আধুনিকীকরণ, ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য অনুমোদন করা হয়। এক্ষেত্রে কার্যকর উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং ব্যাংক ব্যবসায় কার্যকর বিনিয়োগের মূলনীতির মাধ্যমে ঋণের অনুপাতের সত্যতা প্রতিপাদন করা হয়।[৫৫]

ঋণ ছাড়াও এই ব্যাংকের যেসব কার্যক্রম ছিল সেই সম্পর্কে ১৯৬০-এর দশকের এই রিপোর্টে বলা হয়— "The Bank has sanctioned on its own account, it was also called upon to administer foreign currency loans to different projects on behalf of the Government. Loans totalling Rs. 4.17 crores in foreign exchange derived from Japanese, Yugoslav and German credits, and relating to two large projects have been administered on behalf of the Government."[৫৬]

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নে ব্যাংকের মূলধন গঠনের উৎস দেখানো হলো—

সারণি-৫

Rupee Resources Position

(As on March 31, 1964)

Sl. No.	Resources	Rupees
1.	Share Capital	300,00,000
2.	Reserves	45,65,000
3.	Government loans	6,1400,000
4.	Credit lines- I. From State Bank of Pakistan against Government Guarantee	500,00,000
	II. From State Bank of Pakistan against Government Securities	29,00,000
	III. Bills rediscounting facility from the State Bank of Pakistan	100,00,000
	IV. From National Bank of Pakistan against Government guarantee	2,25,00,000
	Total : Rs.	**18,13,65,000**

Sl. No.	Uses and requirements	Rupees
1.	Loans outstanding	15,95,60,000
2.	Investments	47,76,000
3.	Fixed assets	5,58,000
		16,48,94,000
	Loans sanctioned awaiting disbursement	5,76,30,000
	Total Rs.	**22,25,30,000**

Deficit 4,11,59,000

উৎস : *Economic survey of Pakistan* 1963-64, p. 161.

Dhaka University Institutional Repository

উপরের টেবিলে ব্যাংকের রুপির উৎস দেখানো হয়েছে এবং সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে দেখা যায় যে, ৪.১২ কোটি রুপির ঘাটতি ছিল এবং প্রায় ২২.২৫ কোটি রুপি ব্যাংক প্রদান করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়।

১৯৬৩ সালের ৩০ শে জুন থেকে ১৯৬৪ সালের ৩১ মার্চ ঘাটতি বৃদ্ধি পেয়ে হয় ০.৫৮ কোটি রুপি থেকে ৪.১২ কোটি রুপি।[৫৭]

অবশেষে বিভিন্ন পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, ব্যাংক মোট ঋণের ১৯৫.৩০ মিলিয়ন ডলারের মধ্যে ১৫৩.০৮ মিলিয়ন ডলার বণ্টন করে। নিম্নে ১৯৬৪ সালের মার্চ মাসের বণ্টন ও অনুমোদনের অবস্থা দেখানো হলো—

সারণি-৬

Position of the Allocation and Sanctions

(As on March 31,1964)

(In crore rupees)

Sl. No.	Foreign Credits	Amount allocated to I.D.B.P.	Amount allocated by I.D.B.P.
1.	Second U.K. Loan	12.98	12.97
2.	Third U.K. Loan	4.34	4.34
3.	Fifth U.K. Loan	9.35	9.35
4.	Sixth U.K. Loan ($7.6 for Jute looms)	12.00	9.55
5.	1st Japanese Textiles Credit	20.00	20.29
6.	1st yen credit	4.11	3.80
7.	2nd Japanese Textile Credit	13.00	12.98
8.	2nd Yen Credit	1.00	0.17
9.	2nd Yen Credit (Soda Ash. plant)	4.00	-
10.	3rd Yen Credit (soda Ash. Plant)	1.50	-
11.	3rd Yen Credit	1.00	-
12.	3rd Yen Credit (PVC Plant)	4.00	4.00
13.	Eximbank Credit	6.40	6.60
14.	Eximbank Credit	2.50	0.52

Dhaka University Institutional Repository

15.	1st German Credit	38.58	38.58
16.	2nd German Export Credit (Httar Cement)	2.50	2.50
17.	2nd and 3rd German Credits	21.00	10.81
18.	2nd and 3rd German Credit (Soda Coustic)	0.75	0.63
19.	French Credit	2.00	2.34
20.	French Credit (Oil storage)	3.00	3.00
21.	Yugoslav Credit	6.50	5.90
22.	Swiss credit	2.50	0.49
23.	Guarantees under Eximbank Loan	11.31	4.26
24.	8th U.K. credit for Jute Mills	10.00	-
	Total	**195.30**	**153.08**

উৎস : *Economic survey of Pakistan* 1963-64, Rawalpindi, p. 162.

নিম্নে এই ব্যাংকের (I.D.B.P) নতুন মূলধন সরবরাহ লাভের উপায়/উৎস দেখানো হলো :[৫৮]

1. Borrowings from the Central Government.

2. Borrowings from the State Bank of Pakistan secured by the guarantee of the Pakistan Government.

3. Re-discounting of Bills with the State Bank of Pakistan.

4. Enhancement of the share capital of the Bank.

এভাবে দেখা যায়, পাকিস্তান আমলে আধুনিক শিল্পকারখানা গড়ে তোলার জন্য আইডিবিপি বিভিন্ন ধরনের ঋণ দিয়ে সহায়তা করত। যদিও তা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত। তথাপি এই ব্যাংকের মাধ্যমে ঢাকাস্থ সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের ব্যবসায়ীরা লাভবান হয়।

Agricultural Development Bank of Pakistan বা পাকিস্তান কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক : পূর্বের Agricultural Development Finance Corporation (1952) এবং The Agricultural Bank of Pakistan (1957) একত্রিত হয়ে ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় The Agricultural Development Bank of Pakistan। কৃষকদের ঋণের সুযোগ

Dhaka University Institutional Repository

সুবিধা বৃদ্ধিতে এটি চালু করা হয়। যদিও এই সময় (১৯৬১) ব্যাংকের মূলধন তেমন বৃদ্ধি পায় নি, যার অবশিষ্ট ছিল ১০ কোটি রুপি। স্টেট ব্যাংক থেকে ধারের মাধ্যমে এই ব্যাংক তার ঋণের কার্যক্রম চালাত এবং তার আমানতের মাধ্যমে কিছুটা পূর্বের অবস্থায় ফিরে যায়।

১৯৬২-৬৩ সালে করাচিতে প্রধান অফিস ছাড়াও ব্যাংকের ১০০টি অফিস ছিল। জেনারেল ম্যানেজারের দপ্তর পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকায় অবস্থিত ছিল এবং ৯টি প্রধান আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের দপ্তরের মধ্যে ৪টি পূর্ব পাকিস্তানে এবং ৫টি পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত। প্রতিটি প্রদেশে ৫টি করে আরো ১০টি অফিস ছিল। ফলে দেখা যায় যে, দপ্তর/ অফিসের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১২০-এ দাঁড়ায়। যার মধ্যে ৬৬টি পশ্চিম পাকিস্তানে এবং ৫৪টি পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত।

পাকিস্তান কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক কৃষকদের জন্য সবধরনের ঋণের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে। স্বতন্ত্র কোনো প্রতিষ্ঠান ছাড়াও কৃষি অথবা কৃষির উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত সরকারি ও বেসরকারি সীমিত প্রতিষ্ঠানকে ব্যাংক ঋণ দেয়া হয়। ১৮ মাসের মধ্যে পরিশোধযোগ্য স্বল্পমেয়াদি ঋণ দেয়া হতো। যেমন— বীজ, সার, উদ্ভিদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা এবং নির্দিষ্ট শস্যের জন্য শ্রমিকের মজুরি দেয়া। মাঝারি ধরনের ঋণ যার সময়সীমা ছিল ১৮ মাস থেকে পাঁচ বছর। এই ব্যবস্থায় যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় তাহলো– কৃষি কাজে ব্যবহৃত ক্ষুদ্র হাতিয়ার, ভূমি সমতল করা, কুয়া খনন করা, এবং গাড়ি টানার কাজে ব্যবহৃত পশু, যেমন— ঘোড়া, যান্ত্রিক চাষের জন্য আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণ (The adoption of modern method of mechanized farming) এবং ভূমির অধিক উন্নতিসাধনের জন্য পাঁচ বছরেরও বেশি সময়ের জন্য দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ পদ্ধতি গ্রহণ করা/ প্রদান করা। যেমন— টিউবওয়েল স্থাপন করা, ট্রাক্টর ক্রয় করা এবং ফলবাগান গড়ে তোলা। উদ্যান বিদ্যা (Horticulture), অরণ্যবিদ্যা (Forestry), মৎস্য চাষ (Fisheries), পশু ব্যবস্থাপনা (Animal Husbandry), হাঁস-মুরগির খামার, দুগ্ধ খামার/ গব্য খামার ব্যবসা (Dairying), মৌমাছি পালন (Bee Keeping), রেশম চাষ (Sericulture) এবং গ্রামীণ এলাকায় কুটির শিল্পের জন্যও এই ব্যাংক ঋণের আরো সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে। অপব্যবহারের সম্ভাবনা থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে যতদূর সম্ভব বিভিন্ন ধরনের ঋণ দেয়া হয়। স্বল্প এবং মাঝারি ধরনের ঋণের জন্য সুদের হার ছিল ৭% এবং দীর্ঘমেয়াদি ঋণের জন্য ৬% সুদ ধরা হয়।[৫৯]

নিম্নবর্ণিত তালিকায় ব্যাংকের ঋণের কার্যক্রমের অগ্রগতি দেয়া হলো—

সারণি-৭

(হাজার রুপি)

বছর	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান	পাকিস্তান
১৯৫২-৫৩	-	৮০	৮০
১৯৫৩-৫৪	১৯১	৬৯৬	৮৮৭

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫৪-৫৫	৬০৬	১,৭৮২	২,৩৮৮
১৯৫৫-৫৬	১,২৯০	২,৭৭০	৪,০৬০
১৯৫৬-৫৭	২,৯৪২	৪,৫১৯	৭,৪৬১
১৯৫৭-৫৮	৬,৬৬০	৮,১৪৬	১৪,৮০৬
১৯৫৮-৫৯	১৫,২৬১	১৩,৮০২	২৯,০৬৩
১৯৫৯-৬০	৩৪,৩৩৯	৩৮,৫৭৪	৭২,৯১৩
১৯৬০-৬১	৭,২৫,৩০	৬৯,৪৭৩	১,৪২,০০৩
১৯৬১-৬২	১,১৩,০৭৪	১,১৬,৩৮৫	২,২৯,৪৫৯
১৯৬২-৬৩	১,৫০,৭৪৩	১,৫৭,০৫৬	৩,০৭,৭৯৯
১৯৬৩-৬৪ (মার্চ পর্যন্ত)	১,৭৬,৪৮৪	১,৮৫,১২৮	৩,৬১,৬১২

উৎস : *Economic Survey of Pakistan* 1963-64, p. 164.

ব্যাংকের শুরু থেকে মোট ৫,১৬,২৮৯ জন কৃষককে ৩৬.১৬ কোটি রুপি অগ্রিম প্রদান করে। দেখা যায় যে, ১৯৬৩ সালের এপ্রিল মাস থেকে ১৯৬৪ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত তথা ১২ মাসে পাকিস্তান কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ৮৪,৫৪২ জন কৃষককে ৭.৩৯ কোটি রুপি অগ্রিম প্রদান করে। পূর্ব পাকিস্তানের ভূসম্পত্তি কম পরিমাণে ছিল এবং শস্য উত্তোলনের জন্য ঋতুর প্রয়োজন অনুসারে স্বল্পমেয়াদি ঋণের চাহিদা ছিল। তাই ঋণের বেশিরভাগ ক্ষুদ্র চাষিদের কাছে চলে যেত, যার গড় মোট পরিমাণ ছিল প্রায় ৪৯৫ কোটি রুপি। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের ভূসম্পত্তি তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল বিধায় এখানে মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণের প্রচুর চাহিদা ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানে ঋণের মোট পরিমাণ ছিল প্রায় ৩,০৪৮ রুপি।[৬০] দায়বদ্ধকরণ শস্যের বিপরীতে অর্থকরী ও সুনির্দিষ্ট খাদ্যশস্যের উন্নয়নের জন্য একচেটিয়াভাবে বিশেষ ধরনের ঋণ বিপুল পরিমাণে দেয়া হতো। এই ধরনের ঋণ কৃষকদের কাছে জনপ্রিয় ছিল। কারণ ঋণের কার্যপ্রণালি সহজ ছিল। ফলে ঋণগ্রহীতাদেরকে ভূমি/ জমি বন্ধক দিতে হতো না অথবা জামানত পেশ করতে হতো না (or to produce surities) ব্যাংকের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয় যে, "It is easier to supervise and recover these loans, as they are given mainly in kind and recoveries are made through a third party, brokers in the case of tea, ginning factories in the case of cotton, sugar mills in the case of sugercane, and the Department of Food, Government of East Pakistan in the case of paddy (in East Pakistan). Loans against hypothecation of crops are also helpful to agriculturists who have no property to offer as security."[৬১]

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নে দায়বদ্ধকরণের বিপরীতে যেসব শস্যের জন্য অগ্রিম ঋণ দেয়া হতো তার পরিমাণ দেয়া হলো —

সারণি-৮

Loans advanced against hypothecation of various crops.

A. Loans to tea estates :

(East Pakistan only)

Period	Against mortgage	Against hypothecation
Since inception to March 1964	Rs. 23,62,717	Rs. 93,64,483
From April 1963 to March 1964	Rs. 10,12,915	Rs. 30,08,125

B. Loans against hypothecation of paddy crops : (East Pakistan only)

Since inception to March 1964	Rs. 53,25,621
From April 1963 to March 1964	Rs. 4,43,387

C. Loans against hypothecation of sugarcane crop :

Period	East Pakistan	West Pakistan	Pakistan
Since inception to March 1964	Rs. 91,45,083	Rs. 60,13,806	Rs. 1,51,58,889
From April to March 1964	Rs. 30,02,223	Rs. 9,66,625	Rs. 9,68,848

D. Loans against hypothecation of cotton crop : (West Pakistan only)

Since inception to March 1964	Rs. 38,71,352
From April 1963 to March 1964	Rs. 11,44,904

E. Tobacco marketing loans (In Mardan district only) (In West Pakistan)

Since inception to March 1964	Rs. 19,650

Dhaka University Institutional Repository

F. Jute marketing loans (East Pakistan only)

Since inception to March 1964	Rs. 3,30,865
From April 1963 to March 1964	Rs. 50,373

উৎস : *Economic survey of Pakistan* 1963-64, pp. 165-66.

পাকিস্তান কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক পূর্ব পাকিস্তানে Crash Programme (জরুরি কর্মসূচি) এবং পশ্চিম পাকিস্তানে মডেল স্কিমের (Model Scheme) মাধ্যমে প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে ১৯৬৪ সালের মার্চ পর্যন্ত মোট ৩৯৮ লক্ষ রুপি ঋণ প্রদান করে। এর মধ্যে ৩০৭ লক্ষ রুপি প্রদান করা হয় পূর্ব পাকিস্তানের Crash Programme-এ এবং পশ্চিম পাকিস্তানকে প্রদান করা হয় ৯১ লক্ষ রুপি। ১৯৬৩ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৬৪ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে মঞ্জুরকৃত মোট ঋণের পরিমাণ ছিল ৬২.৪৯ লক্ষ রুপি এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ৪.৯৮ লক্ষ রুপি। এই ব্যাংক শুরু থেকেই সামুদ্রিক মৎস্য চাষের উন্নয়নের জন্য পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে ৩৮.৮৮ লক্ষ রুপি অগ্রিম প্রদান করে।

এই ব্যাংকের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে বলা হয় "The overall position of recoveries since inception till the end of March 1964, is 77 per cent in both East and West."[৬২]

সুতরাং পাকিস্তান কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক উভয় অংশের জন্য প্রচুর পদক্ষেপ গ্রহণ করে। বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের চাষিদের জন্য। কেননা পূর্ব পাকিস্তানে বিশেষ কিছু শস্য (পাট, ধান) ভালো উৎপাদিত হতো। এসব শস্যের বিশেষ যত্ন নেয়ার জন্য ও কৃষকদের উৎসাহিত করার জন্য এই ব্যাংক বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। যা কৃষকদের জন্য সহায়ক হয়। আর ঋণ ব্যবস্থার এই কার্যক্রম ঢাকার দপ্তর (Office) থেকে পরিচালিত হতো। সেক্ষেত্রে এই ব্যাংকের একটি শাখা হিসেবে ঢাকায় অবস্থিত শাখা অগ্রণী ভূমিকা পালন করত।

১৯৬২ সালের ১টি রিপোর্টে দেখা যায় ঢাকা শহরে যে সমস্ত ব্যাংকের শাখা, উপ-শাখা, সাব-অফিস ছিল তার তালিকা দেয়া হয়। নিম্নবর্ণিত ব্যাংকগুলো উল্লেখ করা হলো—

1. Agricultural Development Bank of Pakistan (B)
2. Central Bank of India Ltd. (B)
3. Comrade Bank Ltd. (B)
4. Habib Bank Ltd. (5B)
5. Eastern Mercentile Bank Ltd (2B).
6. Industrial Development Bank of Pakistan.
7. Muslim Bank (pak) Ltd. (R.O)

Dhaka University Institutional Repository

8. Nath Bank (pak) Ltd. (R.O)
9. National Bank of Pakistan (4B, 6p. o & 2S. B)
10. National & Grindlays Bank Ltd. (B)
11. State Bank of India (B).
12. United Bank Ltd. (4B).
13. United Bank of India (Pr.O).

Note : B=Branch, R.O= Regional Office, P.O= Principal Office, S.B= Sub-Branch office.

উৎস : *Banking Statistics of Pakistan* 1961-62, Department of Statistics, State Bank of Pakistan, p. 126.

নিম্নে পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকায় যে সমস্ত তফসিলি এবং অ-তফসিলি ব্যাংক ও ব্যাংকের শাখা, উপ-শাখা ছিল তার তালিকা দেয়া হলো—

List of Scheduled Banks Office in East Pakistan of Dacca on 30th June 1962 :

1. Agricultural Development Bank of Pakistan (B)
2. Eastern Mercantile Bank Ltd., Dacca city (B).
3. Habib Bank Ltd.
   a. Nawabpur Road, Dacca (B)
   b. Tejgaon, Dacca (B)
   c. Moulvi Bazar, Dacca (B)
   d. Sadarghat, Dacca (B)
   e. Ramna, Dacca (B)
4. Industrial Development Bank of Pakistan (B)
5. Muslim Commercial Bank Ltd.
   a. Mitford road, Dacca (B)
   b. Johnson Road, Dacca (B)
   c. New Market, Dacca (B)
   d. Ramna, Dacca (B)
6. National Bank of Pakistan
   a. Airport, Dacca (P.O)
   b. Azimpur, Dacca (B)
   c. Cantt. , Dacca (S.B)
   d. Chowk Bazar, Dacca (B)

Dhaka University Institutional Repository

e. Municipality, Dacca (P.O)
f. Moulvi Bazar, Dacca (S.B)
g. New Market, Dacca (P.O)
h. Paribagh, Dacca (P.O)
i. University, Dacca.
j. Ramna, Dacca (B)
k. Sadarghat, Dacca (B)

7. National and Grindlays Bank Ltd.,

I. Dacca (B)

8. State Bank of India,

I. Dacca (B)

9. United Bank of India Ltd., Dacca (Pr.O)

10. United Bank Ltd.
a. Imamganj, Dacca (B)
b. Ramna, Dacca (B)
c. Nawabpur Road, Dacca (B)
d. Sadarghat, Dacca (B).

List of Offices of non-scheduled Banks in Pakistan, Dacca as on 30th June, 1962.

11. Commercial Bank Ltd.

I. Dacca (B)

12. Nath Bank (pak) Ltd., Dacca (R.O).

I. Dacca (R.O)

উৎস : *Banking Statistic of Pakistan* 1961-62, pp. 115-22.

উপরের তালিকায় পাকিস্তান আমলে তফসিলি ও অ-তফসিলি ব্যাংক থাকলেও পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকায় এসব ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ছিল না। বেশিরভাগই ছিল শাখা। নীতি-নির্ধারণের দায়-দায়িত্ব ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের। সেখান থেকেই পরিচালনা করা হতো।

১৯৬৯ সালের *ঢাকা গেজেটিয়ারে* উল্লিখিত ব্যাংক ছাড়াও যেসমস্ত ব্যাংক ঢাকায় কাজ করত তাও উল্লেখ করা হয়—

1. The Commerce Bank
2. The Standard Bank Ltd.

Dhaka University Institutional Repository

3. The Dacca Central Co-operative Bank.
4. The East Pakistan Provincial Co-operative Bank.

The Dacca Central Co-operative Bank এবং The East Pakistan Provincial Co-operative Bank সম্পর্কে বলা হয় যে, "The two Bank are The Government sponsored Co-operative Organisation which advance money to the Agriculturists as well as to the petty artisans through the affiliated banks."[৬৩]

নিম্নে ১৯৫২-৫৩ থেকে ১৯৫৪-৫৫ সালের ঢাকা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংকের হিসাবের বর্ণনা দেয়া হলো—

সারণি-৯

[পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন]

স্বাধীনতার ঠিক পূর্ববর্তী কয়েকবছরে বাঙালি-অবাঙালি মালিকানাধীন ব্যাংকের প্রতিযোগিতায় ব্যাংক ব্যবসার কিছুটা প্রসার ঘটে। শহরাঞ্চলের বাইরে ব্যাংকের শাখা স্থাপিত হয়। কিন্তু ব্যাংক ঋণের কার্যক্রম সীমিতই থেকে যায়। কৃষি ঋণ অথবা গ্রামীণ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে ব্যাংক ঋণ ছিল যৎসামান্য। এমন একটা অবস্থার মধ্যেই পাকিস্তান আমলের ব্যাংকিং-এর সমাপ্তি ঘটে।

সারণি-১০

ব্যাংকিং চিত্র ১৯৭০

(কোটি রুপি)

ক্রমিক নং	সাল	পূর্ব পাকিস্তান	মোট পাকিস্তান (পূর্ব+পশ্চিম পাকিস্তান)
১.	মোট আমানত (ডিসেম্বর, ১৯৫০)	-	১১৩.৪৮
২.	মোট ঋণ (জুন, ১৯৫৫)	-	৮৮.৪১
৩.	মোট তফসিলি ব্যাংক (ডিসেম্বর, ১৯৭০)	১২	৩৬
৪.	শাখা সংখ্যা (মার্চ, ১৯৭১)	১১০০	৩,৩৪৮
৫.	মোট আমানত (মার্চ, ১৯৭১)	২৭৫	১,৩১৭.৫
৬.	মোট ঋণ (মার্চ, ১৯৭১)	-	১,১৬৮.১৮
৭.	মোট মূলধন (ডিসেম্বর, ১৯৭০)	-	৪৮.১৩
৮.	মোট সংরক্ষিত তহবিল (ডিসেম্বর, ১৯৭০)	-	২৬.৮৩

উৎস : ড. আর. এম. দেবনাথ, *বাঙালির ব্যাংক ব্যবসা*, পৃ. ৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-৯

নিম্নে ১৯৫২-৫৩ থেকে ১৯৫৪-৫৫ সালের ঢাকা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংকের হিসাবের বর্ণনা দেয়া হলো —

Figures are in lakhs of rupees

Year	Capital and Reserves				Deposits and Loan from					Loans Due by			
	Paid up share capital	Reserve Fund	Other funds	Total	Non-members and members in individual capacity	Provincial and Central Banks	Societies	Government	Total	Members (individual)	Banks and Societies	Total	Cash in hand
1952-53	1.67	1.93	1.61	5.21	4.30	0.45	0.30	0.15	5.20	-	6.14	6.14	-
1953-54	1.67	1.94	1.60	5.21	5.87	0.41	0.06	-	6.34	-	5.44	5.44	0.03
1954-55	1.59	1.92	1.60	5.12	4.85	0.05	-	0.06	4.96	-	4.54	4.54	0.03

উৎস : *Statistical Abstract for East Pakistan*, Vol : IV, 1958, p. 330.

Dhaka University Institutional Repository

উল্লিখিত তথ্য ও অন্যান্য প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের যাত্রা শুরু মাত্র দুটো ব্যাংক অর্থাৎ ব্যাংক অব অস্ট্রেলেশিয়া ও হাবিব ব্যাংক দিয়ে। তিন বছরের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৫০ সালে পাকিস্তানে ব্যাংকগুলো মাত্র ১১৩.৪৮ কোটি রুপির আমানত সংগ্রহ করে। ১৯৫৫ সালের জুনে পাকিস্তানের ব্যাংকগুলো কর্তৃক প্রদত্ত মোট ঋণের পরিমাণ মাত্র ৮৮.৪১ কোটি রুপি। ১৯৭০ সালের মধ্যে অবশ্য পাকিস্তানে 'তফসিলি ব্যাংকের' সংখ্যা ৩৬টিতে উন্নীত হয়। এরমধ্যে মাত্র ১২টি ছিল পূর্ব পাকিস্তানে কার্যরত। বারোটি কার্যরত ব্যাংকের মধ্যে ১টি ছিল বাঙালি মালিকানাধীন ও আরেকটি ছিল আংশিক। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে ৩৬টি 'তফসিলি ব্যাংকের' মোট শাখা সংখ্যা ছিল ৩,৩৪৮টি। এরমধ্যে মাত্র ১১০০টি শাখা ছিল পূর্ব পাকিস্তানে। আমানতের ক্ষেত্রে ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে পাকিস্তানের ব্যাংকগুলোর সর্বমোট আমানত ছিল ১,৩১৭.৫ কোটি রুপি। এরমধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত ব্যাংকগুলোর আমানত ছিল ২৭৫ কোটি রুপি। এদিকে ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে সর্বমোট পরিশোধিত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিল ছিল ৪৮.১৩ ও ২৬.৮৩ কোটি রুপি।[৬৪]

জনসংখ্যার ভিত্তিতে তুলনা করলে একটি বিষয় পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ে, ১৯৭০ সালের দিকে পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৫% ছিল বাঙালি। অথচ তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে যখন ৩৬টি ব্যাংক কার্যরত তখন পূর্ব পাকিস্তানে মাত্র ১২টি। আবার শাখার দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তানে যখন মাত্র ১১০০ শাখা কার্যরত তখন পশ্চিম পাকিস্তানে কার্যরত ২,২৪৮টি। আর আমানতেরক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানে কার্যরত ব্যাংকগুলোর আমানত যখন মাত্র ২৭৫ কোটি রুপি, তখন পশ্চিম পাকিস্তানে কার্যরত ব্যাংগুলোর আমানতের পরিমাণ ১০৪২.৫ কোটি রুপি।[৬৫]

উপরে উল্লিখিত ব্যাংক ছাড়াও পাকিস্তান আমলের শুরুতে আরো কিছু প্রতিষ্ঠান ঋণ প্রদান করত।

Pakistan Industrial Finance Corporation : Pakistan Industrial Finance Corporation ১৯৪৯ সালে গঠিত হয়। শিল্পে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণের সুযোগ-সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৪ সালের ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত শিল্প সংশ্লিষ্ট আবাসনের জন্য এই কর্পোরেশনের মাধ্যমে যে অর্থ মঞ্জুর করা হয় তার পরিমাণ হলো ৩৮.১ মিলিয়ন রুপি।[৬৬]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫২ সালে পাকিস্তান ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন এ্যাক্ট ১৯৪৯ অনুযায়ী একত্রীভূত বা একত্রীভূত না এমন সকল শিল্পকে আর্থিক সহযোগিতা ও ঋণ প্রদান করতে এই কর্পোরেশনের ক্ষমতা বাড়ানো হয়। এই আইনের মাধ্যমে মূলত কর্পোরেশনকে সরকারি সীমাবদ্ধ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান/ কোম্পানি বা সমবায় সমিতিকে ঋণ প্রদান করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়। আইন সংশোধনীর পর কর্পোরেশন কয়েকটি ক্ষেত্রে যে পরিমাণ ঋণ অনুমোদন করে তা একটি রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে, "The Corporation sanctioned loans amounting to about Rs. 3.3 million to individuals and Rs. 10.3 million to private limited companies as against Rs. 4.3 million for public limited companies."[৬৭]

অপরদিকে ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় Pakistan Industrial Development Corporation যা দেশের শিল্প সংক্রান্ত উন্নয়নে ঋণের সুযোগ-সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এটি সাড়ে ৮ বছর একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে। ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বরের শেষের দিকে পিআইডিসি ৫০টি প্রকল্প সম্পাদন করে এবং বিনিয়োগ করে ৯৯৮.৪ মিলিয়ন রুপি।[৬৮]

House Building Finance Corporation : House Building Finance Corporation ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর কার্যক্রম শুরু হয় ফেডারেল রাজধানী এলাকায়। অন্যান্য / বিভিন্ন প্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোতে-এর ব্যবসা সম্প্রসারণ করে এবং ঢাকা ও লাহোরে দুটি আঞ্চলিক দপ্তর খোলা হয়। যতদূর সম্ভব এই কর্পোরেশন ২.৫ মিলিয়ন রুপিরও বেশি ঋণ অনুমোদন করে।[৬৯] আবাসন সমস্যা সমাধান করতে শহর এলাকায় বাড়ি তৈরির জন্য এই প্রতিষ্ঠান আর্থিক সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করত। ১৯৬২-৬৩ সালে এই কর্পোরেশন রেকর্ড পরিমাণ ঋণ অনুমোদন করে যার পরিমাণ ছিল ৪.৮৭ কোটি রুপি। ১৯৬১-৬২ সালে যার পরিমাণ ছিল ২.৮৫ কোটি রুপি।[৭০]

এই ঋণের মধ্যে করাচির জন্য ২১২ লক্ষ রুপি (৪৩%) পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ১৫৯ লক্ষ রুপি (৩২%) এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ ছিল ১১৬ লক্ষ রুপি (২৪%)।[৭১]

১৯৬৩ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের সার্বিক ঋণ বণ্টনের অনুমোদনের একটি হিসাব পাওয়া যায় তাহলো— Karachi Zone Rs. 1,011 lakhs, West Pakistan Zone Rs. 455 lakhs; and East Pakistan Zone, Rs. 353 lakhs, total Rs. 1,819 lakhs.[৭২]

Agricultural Development Finance Corporation : অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মত আরেকটি প্রতিষ্ঠান ছিল Agricultural Development Finance Corporation. ১৯৫৩ সালের মার্চ মাসে এই প্রতিষ্ঠান তার কাজ শুরু করে এবং কৃষির উন্নয়ন ও কৃষিজাত দ্রব্য (উদ্যান বিদ্যা, বনবিদ্যা, মৎস্য চাষ, পশু ব্যবস্থাপনা, হাঁস-মুরগির খামার, দুগ্ধ খামার) তৈরি করে। এছাড়া কৃষির যান্ত্রিককরণের জন্য যন্ত্রপাতি সরবরাহ, পানি উত্তোলনের

Dhaka University Institutional Repository

যন্ত্রপাতি, ট্রাক্টর, রসায়ন এবং অন্যান্য সার উৎপাদন ও বণ্টন, বীজ, কৃষিজাত হাতিয়ার/ অস্ত্র ক্রয় এবং বণ্টন এবং পশুর প্রজনন ক্রিয়া ইত্যাদির জন্য কৃষকদেরকে ঋণের সুযোগ সুবিধা প্রদান করে।

সাধারণত দ্রব্যের মাধ্যমে ঋণ দেয়া হতো। আবার নগদ অর্থও দেয়া হতো। ঋণের পরিমাণ ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে ১,০০,০০০ রুপি এবং কোনো কোম্পানি বা সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে অর্ধ মিলিয়ন রুপি পর্যন্ত অনুমোদন করা হতো। তবে বিশেষ সময় সরকার এই আইন শিথিল করে। যথাক্রমে ২,০০,০০০ রুপি এবং ২ মিলিয়ন রুপি পর্যন্ত করতে পারত। ১৯৫৪ সালে ব্যক্তিগত/ স্বতন্ত্র ধরনের ক্ষেত্রে সুদের হার ৬.২৫% থেকে ৫% হ্রাস করা হয় এবং সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে ৪% হ্রাস করা হয়।[৭৩]

এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান অফিস ছিল করাচি এবং দেশের বিভিন্ন ইউনিটের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করতে ৩টি আঞ্চলিক অফিস ঢাকা, লাহোর এবং সুক্কুরে (Sukkur) অবস্থিত ছিল।

এই সময় দেশের কৃষি ঋণের সমস্যা ছিল ব্যাপক এবং জটিল। এই প্রতিষ্ঠান তার কার্যক্রমের প্রথম বছর ২.৫ মিলিয়নেরও বেশি রুপি ৫৩০ জন কৃষকের জন্য অনুমোদন করে। সুতরাং এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পাকিস্তান আমলের শুরুতে কৃষি ও শিল্পের উন্নয়নের বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়।

Pakistan Industrial Credit and Investment Corporation : এটি ১৯৫৭ সালের অক্টোবরে স্থাপিত হয়। বেসরকারিখাতে নতুন ও বিদ্যমান পুরাতন শিল্পের উন্নয়নে আর্থিক সহায়তা প্রদানে এটি গঠিত হয়। এক বছর এবং অর্ধ বছরের চেয়েও কম সময়ের মধ্যে ১৯৫৯ সালের মার্চ মাসে এই প্রতিষ্ঠান ৪৮.২ মিলিয়ন পরিমাণ রুপি অনুমোদন করে। যার মধ্যে ৩৩.৮ মিলিয়ন রুপি অথবা ৭০% ছিল বৈদেশিক বিনিয়োগ।[৭৪]

আবার ১৯৬৩-৬৪ সালের একটি রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে, "Sixty per cent of the capital has been subscribed by private Pakistani investors, while the remaining forty per cent is held by private interests in the U. S. A., the U. K., Japan and West Germany and the I. F.C. (International Finance Corporation). The International Finance Corporation (IFC) became a shareholder of P. I.C.I.C in 1963 when it was allotted shares worth Rs. 20 lakhs."[৭৫]

পিআইসিআইসি (P.I.C.I.C) বোর্ড অব ডিরেক্টর ২০ জন পরিচালক নিয়ে গঠিত। যার মধ্যে ১২ জনকে পাকিস্তানি শেয়ারহোল্ডার-এর মাধ্যমে, ৪ জন বিদেশি শেয়ার হোল্ডারের মধ্যে একজন আইএফসি (I.F.C)-এর মাধ্যমে এবং ৩ জন সরকারের মাধ্যমে নিয়োগ করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

এই কর্পোরেশন দেশীয় ও বিদেশি মুদ্রার মাধ্যমে দীর্ঘ ও মাঝারি মেয়াদি ঋণ প্রদান করত। বড় প্রকল্পের অর্থায়নের ক্ষেত্রে বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সাথে ভাগাভাগি করে নিত। এছাড়া কর্পোরেশন যেসব কাজ সম্পাদন করে সে সম্পর্কে বলা হয় যে, "The Corporation also underwrites shares as part of its programme to assit in the development of the capital market. P.I.C.I.C. has received two long-term loans totalling Rs. 6 crores from the Central Government. These loans are subordinated to all its other liabilities and the share capital and hence count as equity for all purposes. It has also received several lines of credit in foreign currencies from the World Bank, U.S. Agency for International Development (A.I.D) and some friendly countries."[৭৬]

নিম্নে যেসব দেশ থেকে P.I.C.I.C ঋণ গ্রহণ করত তা দেয়া হলো—

সারণি-১১

Foreign Currency Credit received by P.I.C.I.C

Country/Agency	In million dollar	In million rupees
I. B. R. D	49.20	234.28
U. S.	21.70	103.33
West Germany	25.00	119.06
Japan	12.00	57.12
France	8.00	38.10
U. K.	2.50	11.91
Total	**118.40**	**563.80**

P. I. C. I. C. মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল ৬৭.১২ কোটি। নিম্নে দেখানো হলো —

Paid up capital and reserves	Rs. 4.74 crores
Long-term Ggovernment loans	Rs. 6.00 crores
Lines of credit in foreign currencies	Rs. 56.38 crores
Total	**Rs. 67.12 crores**

উৎস : *Economic Survey of Pakistan*, 1963-64, p. 157.

শুরু থেকে P.I.C.I.C. ১৯৬৪ সালে ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ৫৯.৩৯ কোটি রুপি অনুমোদন করে। যার মধ্যে ৫৫.৮৭ কোটি রুপি বৈদেশিক মুদ্রা ছিল এবং স্থানীয় মুদ্রা ছিল ৩.৫২ কোটি রুপি।[৭৭]

এছাড়া P.I.C.I.C ১০টি প্রকল্পের জন্য সুদবিহীন ০.৮৮ কোটি রুপি দিয়ে সহায়তা করে। ১.৬৩ কোটি রুপি দিয়ে সরকারি পাঁচটি ইস্যুর দায়িত্ব সম্পূর্ণ গ্রহণ করে। এছাড়া বড়

Dhaka University Institutional Repository

ধরনের ৬টি প্রকল্পের বাস্তবায়নের জন্য বিদেশ থেকে ১৩.৭৫ কোটি রুপির ব্যবস্থা করে। ১৯৬৪ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত P.I.C.I.C. মোট সহায়তার পরিমাণ ছিল ৭৪.১৫ কোটি রুপি।[৭৮]

নিম্নের তালিকার মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট করে তুলে ধরা হলো—

সারণি-১২

Assistance Through P.I.C.I.C :

Loans in foreign currencies	Rs. 55.87 crores
Loans in local currency	Rs. 3.52 crores
Direct participation in equity	Rs. 0.88 crores
Underwriting of public issues for Rs. 1.63 crores of which P.I.C.I.C. had to take up	Rs. 0.13 crores
Direct loans from abroad for P.I.C.I.C projects	Rs. 13.75 crores
Total	**Rs. 74.15 crores.**

উৎস : *Economic Survey of Pakistan* 1963-64, p. 157.

এছাড়া P.I.C.I.C. কিছু গুরুত্বপূর্ণ অর্থায়নের চিত্র হলো[৭৯]—

1. Of the projects financed, thirteen were joint ventures resulting in inflow of foreign capital of Rs. 2.80 crores besides valuable technical know-how and Co-operation.

2. As many as 187 were new projects and in 72 of these, the entrepreneurs were entering the industrial field for the first time.

3. Of 372 projects (with a total investment of nearly Rs. 146.11 crores) financed by P.I.C.I.C. 176 had been completed up to March 31, 1964 and were in production.

4. P.I.C.I.C. endeavours to broaden the base of industrial ownership by requiring as a condition of finance that larger enterprises should be public limited companies with a general issue of shares to the public. As a result, 42 enterprises have been, or will soon be, converted into joint stock companies; the shares of 22 companies are already listed on the Stock Exchange.

উল্লেখ্য ১৯৫২ সালে পাকিস্তান সরকার একটি স্টক-এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠা করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল ঢাকায় পাকিস্তানি শেয়ার ও জামিন দলিলপত্রের (Securities) কারবার চালান এবং সেই সাথে স্থানীয় ব্যবসায়ী ও অর্থনীতিকে সহায়তা করা।[৭৯ক]

Dhaka University Institutional Repository

উপরের অর্থায়ন ছাড়াও P.I.C.I.C'র মাধ্যমে মঞ্জুরীকৃত ঋণ বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে বণ্টন করা হয়। ১৯৬২ সালে P.I.C.I.C. পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন শিল্পের আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণের জন্য ৩.৪৩ কোটি রুপি প্রদান করে। ১৯৬৪ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত দেখা যায় যে, বস্ত্র শিল্পের জন্য ২১.৬২ কোটি রুপি এবং অন্যান্য শিল্পের মধ্যে আখ এবং আখ দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্য (৯.৪৬ কোটি রুপি); ইঞ্জিনিয়ারিং, ধাতু এবং ইলেকট্রিকাল ইন্ডাস্ট্রির জন্য (৫.৬৩ কোটি রুপি); সিমেন্ট, কাচ, মাটি, সিরামিক (৪.৩৭ কোটি রুপি); কাগজ এবং কাগজজাত দ্রব্য (৪.৩৪ কোটি রুপি); কেমিক্যাল এবং ফার্মাসিউটিকল (৪.০৩ কোটি রুপি); খাদ্যদ্রব্য এবং খাদ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের জন্য (৩.৭৮ কোটি রুপি) এবং অন্যান্য শিল্পের জন্য (২.৭৩ কোটি রুপি) ঋণ প্রদান করে।[৮০]

সুতরাং P.I.C.I.C. পাকিস্তান তথা পূর্ব ও পশ্চিমের শিল্পের আধুনিকীরণের জন্য বিভিন্ন অর্থ দিয়ে সহায়তা করত।

বিমা ব্যবসা

এদিকে ভারতীয় উপমহাদেশে বিমা ব্যবসার প্রবর্তক ছিল খ্রিষ্টান ধর্মযাজকরা। ১৮১৮ সাল থেকে ১৮৪৯ সালের মধ্যে কলকাতা, লাহোর ও মাদ্রাজে ইউরোপীয় ৩টি বিমা কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে। ভারতীয়দের উদ্যোগে প্রথম বিমা কোম্পানি 'বোম্বে মিউচ্যুয়াল' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭১ সালে। তিন বছর পর ১৮৭৪ সালে ভারতীয় পুঁজিতে গঠিত হয় 'দ্যা ওরিয়েন্টাল গভর্নমেন্ট সিকিউরিটি লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানি'। *ঢাকা প্রকাশে* এই ইন্সুরেন্সের সমালোচনা করে বলা হয়, "আমরা উপর্যুক্ত জীবনবিমা কোম্পানির ইং ১৯৩৮ সনের কোম্পানি ব্যবসায়ের বিস্তারিত বিবরণ সংবলিত ডিরেক্টারগণের রিপোর্টের একখণ্ড প্রতিলিপি প্রাপ্ত হইয়াছি। রির্পোটখানা আমরা আদ্যোপান্ত সতর্কতার সহিত পাঠ করিয়াছি এবং তৎসম্পর্কে আমাদের মন্তব্য হইল :

আলোচ্য বৎসরে কোম্পানির মোট ৯ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকার মোট ৫৩ হাজার ৩ শত ৮৮ খানা বিমাপত্র বিতরণ করিয়াছে; কিন্তু পূর্ব বৎসরে কোম্পানি ৯ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকার মোট ৫৫ হাজার ২ শত ২৮ খানা বিমাপত্র বিতরণ করিয়াছিল। ইহাতে দেখা যায়, পূর্ব বৎসরের তুলনায় আলোচ্যবর্ষে কোম্পানির নূতন বিমাপত্রের পরিমাণ ২১ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়াছে। আলোচ্য বৎসরের নূতন ব্যবসায়ের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, কোম্পানি একটি বিমাপত্রেই ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। পূর্বাবধি এ পর্যন্ত কোম্পানি মোট ৭৭ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকার ৩৫ লক্ষ ৫৯ হাজার বিমাপত্র বিতরণ করিয়াছে। বর্তমানে দেশে ব্যবসায়ের অবস্থা খুবই মন্দা চলিতেছে। এ অবস্থায় কোম্পানির নূতন ব্যবসায় যে আশাতীত রূপেই সন্তোষজনক হইয়াছে, তাহা অনায়াসেই বলা যাইতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায় যে, পূর্ব বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে নূতন ব্যবসায়ের পরিমাণ ২১ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়াছে, কিন্তু বর্তমান মন্দা ব্যবসায়ের সহিত তুলনা করিলে উহাকে কোনোক্রমেই হ্রাস আখ্যা প্রদান করা যাইতে পারে না। দ্বিতীয়ত কোম্পানি একটি মাত্র বিমাপত্রে যে সর্বোচ্চ পরিমাণ দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে তাহাতে কোম্পানির আর্থিক

Dhaka University Institutional Repository

ভিত্তির দৃঢ়তা এবং উহার উপর গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত করিবার স্বপক্ষে লোকের গভীর আস্থাই সূচিত হইতেছে। তৃতীয়ত কোম্পানির নূতন ব্যবসায়ের উত্তরোত্তর বৃদ্ধিতে উহার জনপ্রিয়তাও অবিসংবাদিত প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

পূর্ব বৎসরের জের তহবিল ২২ লক্ষ টাকাসহ আলোচ্য বৎসরে কোম্পানির চাঁদার আয় হইয়াছে মোট ৪ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে ২ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়া পরবর্তী বৎসরের জের তহবিল রহিয়াছে ১ কোটি ৯৯ টাকা। পূর্ব বৎসরের ব্যয়ের হার শতকরা ২২.৯-এর তুলনায় এ বৎসর ব্যয় শতকরা ২২ টাকা হইয়াছে। একদিকে উত্তরোত্তর ব্যবসা বৃদ্ধি এবং অপরদিকে ব্যয় হ্রাস দ্বারা কোম্পানির পরিচালকগণের কর্মদক্ষতা ও মিতব্যয়িতার পরিচয়ই সুস্পষ্ট হইয়াছে। কোম্পানির মোট ইনভেস্টমেন্ট ২৫ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে ২২ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিতে, ২ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা কোম্পানির বিমাপত্র আবদ্ধ রাখিয়া এবং অবশিষ্ট ৬৭ লক্ষ ইমারতাদি আবদ্ধ রাখিয়া ও অন্যান্য বিষয়ে প্রযুক্ত হইয়াছে। বিমা তহবিলের উপর্যুক্ত প্রয়োগ ব্যবস্থা হইতে কোম্পানির আর্থিক ভিত্তির দৃঢ়তারই যে সম্যক পরিচয় পাওয়া যাইতেছে সে কথা আর বিশেষ করিয়া না বলিলেও চলে।"[৮১]

তারপর থেকে একে একে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় বিমা কোম্পানিগুলো হচ্ছে, (১) নিউ ইন্ডিয়া, (২) ব্রিটিশ ইন্ডিয়া, (৩) জুপিটার (৪) ন্যাশনাল, (৫) জেনারেল ইন্সুরেন্স, (৬) বোম্বে লাইফ, (৭) হিন্দুস্তান কো-অপারেটিভ। এই ৭টি বিমা কোম্পানির মধ্যে ন্যাশনাল লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানির অন্যতম উদ্যোক্তা এন এন সরকার। এদিকে 'হিন্দুস্তান কো-অপারেটিভ জেনারেল ইন্সুরেন্স সোসাইটি লি.-এর সাথে জ্যোতিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নলিনী রঞ্জন সরকার জড়িত ছিলেন। ১৯৩২ সালে প্রতিষ্ঠিত দ্যা ইস্টার্ন ফেডারেল ইউনিয়ন ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি.-এর উদ্যোক্তা ছিলেন অবাঙালি আবদুর সিদ্দিকী। এ কোম্পানির সাথে বর্ধমানের এম. এ. মোমেনও জড়িত ছিলেন।

সুতরাং দেখতে পাওয়া যায় যে, দেশবিভাগের আগে ব্যাংকের মত ইন্সুরেন্সের ক্ষেত্রেও কোনো পাকিস্তানি উদ্যোক্তা ছিল না। সব ইন্সুরেন্স কোম্পানি পূর্ব থেকে স্বাধীনতা পর্যন্ত ভারতীয় অথবা বিদেশিদের দ্বারা পরিচালিত হতো। অতীতে একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইন্সুরেন্সের মূলধন গঠন সন্তোষজনক ছিল না।

কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ষাটের দশকে বড় ধরনের পরিবর্তন হয়। ১৯৬৯ সালে ঢাকায় পাকিস্তানি এবং বিদেশিদের দ্বারা পরিচালিত ৪০টি ইন্সুরেন্স কোম্পানি ছিল। এগুলো হলো— (১) আদমজি ইন্সুরেন্স, আদমজি কোর্ট (Adamjee Insurance Adamjee Court), (২) এল্যায়েন্স ইন্সুরেন্স (Alliance Insurance), (৩) এ্যাটলাস ইন্সুরেন্স কোং লিমিটেড (Atlas Insurace Co. Ltd.), (৪) আলফা ইন্সুরেন্স (Alpha Insurance), (৫) আমেরিকান লাইফ ইন্সুরেন্স (American Life Insurance), (৬) ব্রিটিশ ইন্ডিয়া জেনারেল ইন্সুরেন্স (British India General Insurance Ltd.), (৭) আসানী মিউচ্যুয়াল ইন্সুরেন্স (Asani Mutual Insurance), (৮) সেন্ট্রাল ইন্সুরেন্স কোং লিমিটেড (Central

Dhaka University Institutional Repository

Insurance Ltd.), (৯) সেন্ট্রাল লাইফ ইন্সুরেন্স (Central Life Insurance), (১০) কো-অপারেটিভ ইন্সুরেন্স সোসাইটি (Co-Operative Insurance Society of Pakistan), (১১) ক্রিসেন্ট স্টার ইন্সুরেন্স কোং লি. (Crecent Star Insurance Co. Ltd.), (১২) ঈগল স্টার ইন্সুরেন্স (Eagle Star Insurance), (১৩) ইস্ট পাকিস্তান কোং অপারেটিভ ইন্সুরেন্স সোসাইটি (East Pakistan Co-operative Insurance Society), (১৪) ইস্টার্ন ইন্সুরেন্স কোং লিমিটেড (Eastern Insurance Co. Ltd.), (১৫) ইস্টার্ন জেনারেল ইন্সুরেন্স কোম্পানি (Eastern General Insurance co.), (১৬) ইস্টার্ন ফেডারেল ইউনিয়ন ইন্সুরেন্স কোং লিমিটেড (Eastern Federal Union Insurance Co.), (১৭) হাবিব ইন্সুরেন্স (Habib Insurance), (১৮) হ্যানোভার ফায়ার ইন্সুরেন্স (Hanover Fire Insurance), (১৯) হিন্দুস্তান জেনারেল ইন্সুরেন্স সোসাইটি (Hindustan General Insurance Society), (২০) হোমল্যান্ড ইন্সুরেন্স কোং (Homeland Insurance Co.), (২১) হোম ইন্সুরেন্স কোম্পানি (Home Insurance Company), (২২) মুসলিম ইন্সুরেন্স কোং লিমিটেড (Muslim Insurance Co.), (২৩) ন্যাশনাল ইন্সুরেন্স (National Insurance), (২৪), নিউ ইন্ডিয়া ইন্সুরেন্স (New India Insurance), (২৫) নিউ জুবিলি ইন্সুরেন্স (New Jubilee Insurance), (২৬) নরউইচ ইউনিয়ন ইন্সুরেন্স (Norwich Union Insurance), (২৭) ওরিয়েন্টাল ফায়ার এ্যান্ড জেনারেল ইন্সুরেন্স (Oriental Fire and General Insurance), (২৮) ওরিয়েন্টাল মিউচ্যুয়াল লাইফ ইন্সুরেন্স (Oriental Mutual life Insurance), (২৯) পাক ইন্সুরেন্স (Pak Insurance), (৩০) পাকিস্তান ইন্সুরেন্স কর্পোরেশন (Pakistan Insurance Corporation), (৩১) পাকিস্তান জেনারেল ইন্সুরেন্স (Pakistan General Insurance), (৩২) প্রিমিয়ার ইন্সুরেন্স কোং অব পাকিস্তান (Premier Insurance Co. of Pakistan), (৩৩) প্রুডেনশিয়াল ইন্সুরেন্স কোং (Prudential Insurance Co.), (৩৪) পাকিস্তান মোটর ওনারস মিউচ্যুয়াল ইন্সুরেন্স (Pakistan Motor Owners Mutual Insurance), (৩৫) কুইনসল্যান্ড ইন্সুরেন্স কোং (Queens Land Insurance Co.), (৩৬) রোভাল এক্সচেইঞ্জ এ্যাসুরেন্স (Roval Exchange Assurance), (৩৭) ইউনাইটেড ইন্সুরেন্স কোং অব পাকিস্তান (United Insurance Co. of Pakistan), (৩৮) মার্কেন্টাইল মিচ্যুয়াল ইন্সুরেন্স অব পাকিস্তান লিমিটেড (Mercantile Mutual Insurance of Pakistan Ltd), (৩৯) মার্কেন্টাইল ফায়ার এ্যান্ড জেনারেল ইন্সুরেন্স কোং অব পাকিস্তান (Mercantile Fire and General Insurance Co. of Pakistan Ltd.), (৪০) দ্যা গ্রেট ইস্টার্ন ইন্সুরেন্স কোং লিমিটেড (The Great Eastern Insurance)।

১৯৬০-এর দশকে একটি রিপোর্টে বিমা ব্যবসা সম্পর্কে বলা হয়, "The life insurance business in 1961 amounted to Rs. 373 million, the share of indigenous insurers being Rs. 241 million. The premium derived from general i.e. non-life insurance business in that year was Rs. 84 million of which Rs. 45 million was of local insurers".[৮২]

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালিদের মধ্যে যারা বিমা ব্যবসায়ে উদ্যোগী ও অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে তারা হলেন, (১) এ. কে. খান, (২) ফজলুর রহমান, (৩) এ. কে. এম. ফজলুল হক মাওলা, (৪) এন. এ. চৌধুরী, (৫) মজিবুর রহমান, (৬) আফিলউদ্দিন, (৭) গোলাম মাওলা। পাকিস্তান আমলে বাঙালির মালিকানায় ও বাঙালি কর্তৃক পরিচালিত বিমা কোম্পানির সংখ্যা ১২টিতে উন্নীত হলেও বিমা ব্যবসার সিংহভাগ ছিল অবাঙালিদের হাতে। ৪৩টি পরিবার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ১৪টি পাকিস্তানি কোম্পানি মোট বিমা ব্যবসায় ৭৫ ভাগের মালিক ছিল। এই ১৪টি কোম্পানির মোট সম্পদের মধ্যে দুই শতাংশের মালিক ছিল এ. কে. খানের 'ইস্টার্ন ইন্সুরেন্স'। ১৯৬৯-৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তানের মোট জীবন বিমার মাত্র ১০ শতাংশ ছিল বাঙালি বিমা কোম্পানিগুলোর নিয়ন্ত্রণে।

নিম্নে ১৯৫০ থেকে ১৯৫৩ সালের বিমা ব্যবসার একটি হিসাব দেয়া হলো—

সারণি ১৩ ও ১৪ [পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন]

সুতরাং দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, দেশভাগের আগে পূর্ববাংলা তথা ঢাকায় তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য ব্যাংক ছিল না। যা ছিল তা যৎসামান্য এবং তাদের কর্মপরিধি ছিল সীমিত। কেননা দেশভাগের আগে সকল ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে শুরু করে ব্যাংক ব্যবসা কলকাতা কেন্দ্রিক ছিল। সে কারণে রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার (১ এপ্রিল ১৯৩৫) কোনো শাখা ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় নি। দেশভাগের পর থেকে অর্থাৎ ১৯৪৭ সাল থেকে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সাথে সাথে ব্যাংক ব্যবসার ক্ষেত্রে বড় ধরনের পরিবর্তন দেখা যায়। উল্লেখ্য ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে কাজ করে। ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের দ্বারা পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত হতো। বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায় যে, ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত ঢাকায় ১৩টি ব্যাংক ছিল ; তার বেশিরভাগই ছিল শাখা, উপশাখা, অন্যান্য অফিস। এদের বেশির ভাগেরই সদর দপ্তর পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত। মাত্র দুটো বাণিজ্যিক ব্যাংকের সদর দপ্তর ঢাকায় অবস্থিত ছিল। এগুলো হলো ইস্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিমিটেড (Eastern Banking Corporation Limited) ও ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড (Eastern Mercantile Bank Ltd.)। এই দুটি ব্যাংকের শাখা সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২১ ও ৫৮টি। (উল্লেখ্য যে, পূর্ব পাকিস্তান তথা ঢাকায় ১৩টি ব্যাংকের মধ্যে ২টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাকীগুলো বাণিজ্যিক ব্যাংক ও সমবায় প্রতিষ্ঠান)। আর এই দুটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান হলো— Industrial Development Bank of Pakistan অপরটি হলো Agricultural Development Bank of Pakistan. এবং স্বাধীনতার উত্তরকাল পর্যন্ত I.D.B.P ও A.D.B.Pসহ পশ্চিম পাকিস্তানি মালিকানাধীন ব্যাংক ১২টি। ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত ঢাকায় ৫টি বিদেশি ব্যাংক কার্যকর ছিল।[৮৩] (1) The State Bank of India, (2) The Central Bank of India, (3) The United Bank of India, (4) The National Bank and Grindlay's Ltd. and (5) The Australasia Bank Ltd.

সারণি-১৩

Statement relating to Life Insurance business effeeted in East Pakistan during the years 1950 to 1953

Name of Insurance Companies (a)	Year	(A) New Business during the year			(B)Total Business at the end of the year			Paid	(C) Total Claims			Ann uitie s	Commis sion.
		Number of Policies	Sum Insured	Total premia accrued	Number of policies in force	Sum Insured	Total Premier accrued		Outstan ding	Surrenders	Cash Bonus and reduction of premium		
			Rs.	Rs.		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
The Eastern Federal Union Insurance Co. Ltd.	1950	859	17,13,250	90,064	2,993	65,96,200	3,46,315	8,579	28,582	...	...	...	86,142
	1951	1,482	49,84,400	2,69,821	3,952	1,05,60,023	5,54,424	15,466	35,440	2,422	325	...	1,22,958
	1952	1,660	70,26,650	3,64,633	4,870	1,25,46,680	7,66,407	50,605	35,210	12,000	...	...	1,39,420
	1953	1,741	94,71,550	4,58,816	6,902	2,09,75,207	9,03,019	45,840	31,541	19,804	...	...	2,50,581
General Assurance Society Ltd.	1950	14	30,500	1,390	5,621	48,33,910	2,70,214	59,399	1,87,956	23,214	...	...	3,287
	1951	221	4,46,500	24,778	5,291	46,78,868	1,96,637	60,886	2,55,620	55,876	...	...	9,922
	1952	352	6,11,250	36,736	5,316	48,81,564	2,53,851	60,251	1,44,162	28,951	...	...	9,340
	1953	610	11,40,750	74,738	5,328	53,56,574	2,69,621	57,914	1,51,746	20,890	...	...	19,059
The Indian Life Insurance Co. Ltd.	1950	573	12,43,750	44,255	2,562	45,55,348	1,99,840	8,376	10,961	1,869	...	...	43,290
	1951	1,182	29,35,500	1,49,465	3,327	67,11,693	3,26,483	17,892	5,593	506	...	...	93,736
	1952	1,201	27,54,500	1,44,606	3,839	79,78,972	4,09,406	22,491	6,555	1,237	...	...	1,04,071
	1953	1,455	33,98,500	1,85,772	4,573	97,82,965	5,28,366	15,569	16,908	870	...	...	1,24,913

a) Information not available

উৎস : *Statistical Abstract for East Pakistan* Vol. IV, 1958, p. 340.

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-১৪

Statement relating to Fire, Marine and Miscellaneous Insurance Business effected in East Pakistan during the years 1950 to 1953

Name of Insurance Companies	Year	Premium less re-insurance dureing the year			Total claim less re-insurance – paid			Total claim less re-insurance outstanding			Commission		
		Fire	Marine.	Miscellaneous	Fire	Marine	Miscella-neous	Fire	Marine	Miscella-neous	Fire	Marine	Miscella-neous
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
National Fire and General Insurance C0. Ltd.	1950	60,528	73,920	27,239	3,213	13,743	129	..	5,242	600	18,991	2,506	3,760
	1951	2,02,808	74,406	36,986	36,019	7,659	6,323	5,770	10,561	1,389	68,856	16,625	2,026
	1952(a)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	1953(a)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
The General Assurance Society Ltd.	1950	..	14,198	260	..	..	..	..	..	..	..	523	..
	1951	1,580	16,577	342	..	..	..	..	..	..	2,439	1,562	..
	1952	210	11,919	510	..	4,501	..	1,134	2,154	1,881	440	1,.016	..
	1953	46,388	51,162	32,058	16,618	3,339	9,180	5,146	20,999	5,529	1,40,053	7,416	1,396
The Eastern Federal Union Insurance Co. Ltd.	1950	9,01,268	10,71,992	36,605	3,080	32,983	6,388	6	..	738	1,15,990	1,11,038	1,257
	1951	22,00,663	22,99,270	74,223	31,332	23,107	20,261	25,104	..	3,047	1,17,484	2,20,679	1,757
	1952	17,45,512	16,31,150	1,14,844	62,892	43,444	24,746	..	3,152	9,559	1,27,410	1,43,706	2,458
	1953	16,59,612	10,87,236	1,01,540	16,42,255	46,844	35,413	1,80,132	11,920	31,098	1,46,550	91,864	4,960
Pakistan Motor Owners	1950	..	..	50,105	..	..	..	..	..	..	..	..	14,303
	1951	..	..	79,236	..	..	13,568	..	..	13,568	..	..	32,73
	1952	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

Dhaka University Institutional Repository

Mutual Insurance	1953	..	..	63,414	..	..	2,670	..	..	2,670	..	..	21,866
The Western Assurance Company	1950	3,61,670	1,04,805	7,212	2,895	..	2,609	23,000	..	..	1,06,386	15,721	722
	1951	3,83,378	2,53,098	6,576	1,725	215	1,654	5,000	407	1,004	1,05,429	37,964	658
	1952	2,01,943	1,79,897	4,950	3,727	34,119	1,244	..	..	1,470	49,759	26,954	495
	1953	2,27,328	1,60,509	6,250	..	4,943	1,372	270	..	2,551	62,371	24,076	625
The Brtish-America Assurance Company	1950	1,99,814	..	..	..	..	..	..	..	..	57,949	..	..
	1951	1,23,252	..	..	..	..	..	..	..	..	33,894	..	..
	1952	99,851	..	..	..	..	..	..	..	..	27,459	..	..
	1953	47,664	..	..	..	..	..	..	..	..	13,108	..	..
The State Assurance Co. Ltd.	1950	67,044	..	..	..	..	..	..	..	..	19,561	..	..
	1951	57,661	..	..	..	..	..	..	..	..	15,857	..	..
	1952	29,962	..	..	1,437	..	..	..	..	..	8,239	..	..
	1953	48,177	..	..	..	..	..	163	..	..	13,249	..	..
Co-operative Insurance Society of Pakistan Ltd.	1951	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	1952	2,87,103	8,106	192	..	..	62	6,165	..	263	99,089	3,120	457
	1953	2,16,448	1,942	2,405	..	..	98	48,309	15,009	34	1,40,688	1,675	388

(a) Information not available

উৎস : *Statistical Abstract for East Pakistan* No.1, IV, 1958, p. 241.

Dhaka University Institutional Repository

এই দুটো ব্যাংক সরকারি মালিকানাধীন ছিল। স্বাধীনতার পূর্বে ঢাকায় কোনো বাণিজ্যিক ব্যাংক ছিল না। কিন্তু স্বাধীনতার পরে ঢাকায় ১২টি বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে এসব ব্যাংকের বেশিরভাগেরই শাখা ঢাকাসহ সারা পাকিস্তানে ছিল। এই শাখার মাধ্যমে ঢাকার ব্যবসা চলত। এছাড়া আরো দেখতে পাওয়া যায় কতগুলো ভারতীয় ও বিদেশি ব্যাংকের শাখা ছিল। তবে ড. আর. এম. দেবনাথ উল্লেখ করেন যে, এসব ভারতীয় ব্যাংক বস্তুত অকার্যকর ছিল। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের পর সরকার এগুলোকে 'শত্রু সম্পত্তি' বলে ঘোষণা করে।[৮৪] ব্যাংকগুলোর ব্যবস্থাপনার ভার দেয়া হয় 'ডেপুটি কাস্টডিয়ান'-এর উপর। কারণ এগুলো ছিল অবসায় (লিক্যুইডেশন) কার্যক্রমের অধীনস্ত।

কৃষি ও শিল্প ব্যাংক দুটো ক্ষেত্রেই উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তবে এক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে পশ্চিম পাকিস্তানকেই বেশি সুবিধা দেয়া হয়। যেকোন ব্যাংকের শাখার নীতি নির্ধারণী, কাজ, মুদ্রা ও ব্যাংকিং জাতীয় যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ হতো করাচিতে। ঢাকা কার্যালয় শুধু ঐসব সিদ্ধান্ত কার্যকর করত। মূল কেন্দ্রীয় ব্যাংকিংয়ের কাজে ঢাকা কার্যালয়ের ভূমিকা ছিল খুবই সীমিত। তাছাড়া পাকিস্তান আমলে যেসব ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় তার অধিকাংশেরই মালিক অবাঙালি পাকিস্তানি (১০টি) ও বাঙালি মালিকানাধীন ছিল ২টি (Eastern Marcantile Bank Ltd. & Eastern Banking Corporation)। পাকিস্তান আমলের সব ব্যাংক (১২) ছিল ব্যক্তিমালিকানাধীন।

পাকিস্তান আমলে (১৯৪৭-৭১) সীমিত আকারে ব্যাংক ব্যবসাতে বাঙালি উদ্যোক্তাদের যে যাত্রা শুরু হয়, স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর তা রুদ্ধ হয়ে যায়। শুধু পাকিস্তানি অনুপস্থিত মালিকদের ১০টি বাণিজ্যিক ব্যাংক নয়, প্রাক স্বাধীনতাকালের বাঙালি মালিকানাধীন দুটো ব্যাংকসহ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানও স্বাধীনতা উত্তরকালে জাতীয়করণ করা হয়। ফলে পাকিস্তান আমলে ব্যাংক ব্যবসাতে অর্জিত বাঙালির স্বল্প অভিজ্ঞতা স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে কাজে লাগানোর আর সুযোগ থাকে নি। স্বাধীনতার পর দেখা যায়, ব্যাংক, বিমা, শিল্প-কলকারখানা, আমদানি-রপ্তানি প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য উল্লেখযোগ্য আর্থিক সম্পদের সিংহভাগের পাকিস্তানি মালিকরা অনুপস্থিত। তাদের বিষয় সম্পত্তি ও সম্পদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করা জরুরি হয়ে পড়ে।

একথা সকলেরই জানা যে, স্বাধীনতার ঠিক পর মুহূর্তে দেশ ছিল অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত ও সামাজিকভাবে অস্থির। ভবিষ্যৎ স্বপ্নে মানুষ উচ্চাভিলাষী এবং এক শ্রেণির সুযোগ সন্ধানী মানুষ সম্পদ গ্রাসে বেপরোয়া। এমতাবস্থায় অনেকের মতে, বেসরকারি খাতে পরিত্যক্ত সম্পদ ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত মারাত্মক পরিণতি বয়ে আনতে পারে। তাছাড়া নীতি নির্ধারকদের সামনে ছিল পাকিস্তানি আমলের রাজনৈতিক একটি অভিজ্ঞতা। পুরো পাকিস্তান আমলে বেসরকারি বড় ব্যবসা ও শিল্প সম্বন্ধে বাঙালির মনে ছিল বিরূপ ধারণা। বলাবাহুল্য ব্যাংকিং খাত-এর বাইরে ছিল না। ব্যাংকগুলো সম্বন্ধে তখন অনেক অভিযোগ ছিল। এদের শাখাগুলো বেশিরভাগই ছিল শহরে ও মফস্বল শহরে। গ্রামাঞ্চলে শাখা ছিল খুব কম। গ্রামের উন্নয়ন ও দরিদ্র জনসাধারণের মঙ্গলে কোনো ভূমিকা ছিল না। অভিযোগ

Dhaka University Institutional Repository

ছিল ব্যাংকগুলো মানুষের কাছ থেকে শুধু আমানত সংগ্রহ করে এবং বড় লোককে ঋণ দিয়ে আরও বড় করে। কিছু পরিবার ব্যাংকের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগত করে দরিদ্র শ্রেণির লোক, সাধারণ মানুষ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে শোষণ করত। শিল্পায়নের নামে ব্যাংকগুলো বাংলার সম্পদ লুটপাট করত। এসব অভিযোগের প্রেক্ষাপটে ব্যাংক, বিমা, পাট, অন্যান্য শিল্প এবং আমদানি-রপ্তানি ব্যবসা জাতীয়করণের দাবি ওঠে।

দাবিগুলো এতই জোরালো হয়ে ওঠে যে, ৬ দফা আন্দোলনের (১৯৬৬) পর ১৯৬৯ সালে গণ-অভ্যুত্থানের সময় যে ১১ দফা প্রণীত হয় তাতে অন্যতম প্রধান দফা হিসেবে ব্যাংক জাতীয়করণের দাবি অন্তর্ভুক্ত করে। বলা বাহুল্য ১১ দফা আন্দোলন ছাত্রদের কর্তৃক সূচিত হলেও দেশবাসীও দাবিগুলোর প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানায়। বস্তুত ১১ দফা আন্দোলনই বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট রচনা করে। তখন মুখে মুখে ছিল পাকিস্তানের ২২ পরিবারের শোষণের কাহিনি। ঘটনাক্রমে এই ২২টি পাকিস্তানি পরিবারই নিয়ন্ত্রণ করত ব্যাংক, বিমাসহ পাকিস্তানের সিংহভাগ ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প। ২২ পরিবার বিরোধী আন্দোলনে ১১ দফা ছিল একটি মাইল ফলক। এই ১১ দফার ভিত্তিতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সকল ছাত্র সংগঠন একত্রিত হয়। ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ফলে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতি এক অভাবনীয় মোড় নেয়। এর ফলস্বরূপ 'আওয়ামী লীগ' ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের নিরঙ্কুশ এবং পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। এই সংখ্যাগরিষ্ঠতাই ধীরে ধীরে মুক্তিযুদ্ধের দিকে মোড় নেয়।

তবে একথা উল্লেখ করতে হয় যে, যত বাধাবিপত্তির কথা আমরা বলি না কেন পাকিস্তান আমলেই পূর্ব পাকিস্তান তথা ঢাকার ব্যাংক ব্যবসা প্রসার লাভ করে। যদিও তা সীমিত পরিসরে। কেননা বর্তমান অভিসন্দর্ভের আলোচ্য সময়ের শুরু থেকে ঢাকায় তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য ব্যাংক ছিল না। যা ছিল তা ক্ষুদ্র পরিসরে। তখন ব্যাংক ব্যবসা পরিচালিত হতো কলকাতাকে কেন্দ্র করে। তাই বলা যায় যে, পাকিস্তান আমলের সীমিত ব্যাংক ব্যবসার জ্ঞান নিয়েই পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা তথা কেন্দ্রীয় ব্যাংক গড়ে ওঠে। কেননা বাংলাদেশের পক্ষে সাময়িকভাবে স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে কাজ করার কোনো সুযোগ ছিল না। উপমহাদেশে এই ধরনের একটি নজির ছিল। ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের পর 'রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া' (আর.বি.আই) ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে কাজ করে।[৮৫] কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ১৯৭১ সালে ১৬ই ডিসেম্বরের পর এটি সম্ভব ছিল না। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে স্বাধীনতা অর্জন করায় বাংলাদেশ পাকিস্তানের কোনো উত্তরাধিকারী রাষ্ট্র ছিল না। সরকারিভাবে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তরে ও ক্ষমতা গ্রহণের কোনো ঘটনা এখানে ছিল না। এমতাবস্থায় কালবিলম্ব না করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক গড়ে তোলা জরুরি হয়ে পড়ে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয় ঢাকাস্থ 'স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের' প্রাদেশিক কার্যালয় ঘিরে। পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকাস্থ কার্যালয়টি ছিল ডেপুটি গভর্নরের

Dhaka University Institutional Repository

কার্যালয়। তাছাড়া ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও বগুড়াতে ৪টি শাখা ছিল এবং সিলেট ও রাজশাহীতে ছিল দুটো নিয়ন্ত্রণাধীন কার্যালয়। মূল কেন্দ্রীয় ব্যাংকিংয়ের কাজে ঢাকা কার্যালয়ের ভূমিকা ছিল সীমিত। অথচ এই কার্যালয়টিকে ১৯৭১ সালে ১৬ ডিসেম্বর দেশ সম্পূর্ণ শত্রুমুক্ত হলে পূর্ণ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দায়িত্ব নিতে হয়। শুধু কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দায়িত্ব নয়, পুরো ব্যাংক ব্যবস্থার পুনর্বাসনের দায়িত্বও জরুরি ভিত্তিতে বর্তায় এই কার্যালয়ের উপর। এটি করতে গিয়ে আইনগত জটিলতার সৃষ্টি হয়। তা দূরীকরণের লক্ষ্যে১৯৭১ সালে ১৭ই ডিসেম্বরে রাষ্ট্রপতির আদেশ (বাংলাদেশ ব্যাংক টেম্পরারি-অর্ডার) বলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক গঠন করা হয়।

সুতরাং বলা যায় যে, পাকিস্তান আমলের ব্যাংক ব্যবস্থার অভিজ্ঞতা নিয়েই স্বাধীন বাংলাদেশের ব্যাংক গঠন করা হয়। এই সময়ই বাণিজ্যিক ব্যাংক গড়ে উঠলে ব্যবসার সম্প্রসারণ ঘটে। পূর্ব পাকিস্তানে আধুনিক ধরনের মাঝারি ও ভারি শিল্পকারখানা গড়ে ওঠে এই ব্যাংকগুলোকে ঘিরে। যা পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

তথ্যনির্দেশ

১. এস. এন. গুপ্ত, *দ্যা ব্যাংকিং 'ল' থিউরি এ্যান্ড প্রাক্টিস* : ইউনিভার্সেল বুক ট্রেডার্স : নিউ দিল্লী, ১৯৯৪। উদ্ধৃত, ড. আর. এম. দেবনাথ, *বাঙালির ব্যাংক ব্যবসা*, নবযুগ প্রকাশনী, ২০০৩, পৃ. ১২।

২. B. Nogara, *Modern Monetary System*, p. 163, উদ্বৃত : B. Ramachandra Rau, *Present Day Banking in India*, Third Edition, Published by the Unversity of Calcutta. 1930, p. 246.

৩. ড. আর. এম. দেবনাথ, *বাঙালির ব্যাংক ব্যবসা*, নবযুগ প্রকাশনী, ২০০৩, পৃ. ১৩।

৪. H. D. Macleod, *Theory of Credit*, Vol. 1, p. 90, উদ্বৃত, B. Ramachandra Rau, *Present Day Banking in India*, Third Edition, Published by the Unversity of Calcutta. 1930, p. 246.

৫. ঐ, p. 246.

৬. ঐ, p. 246.

৭. B. Ramachandra Rau, *Present Day Banking in India*, Third Edition, Published by the Unversity of Calcutta, 1930, p. 247.

৮. ঐ, p. 247.

৯. ঐ, p. 247.

১০. ঐ, p. 247.

১১. S.N. Sen, *Ancient History of Bangladesh*, India and Pakistan Academic Publishers, Dhaka, উদ্ধৃত, ড. আর. এম. দেবনাথ, *বাঙালির ব্যাংক ব্যবসা*, পৃ. ১৪।

১২. Dr. P. Banerjee, *Public Administration in Ancient India*, উদ্বৃত, *Present Day Banking in India*, p. 248.

Dhaka University Institutional Repository

১৩. Burnell and Hopkins, *Ordinance of Manu*, উদ্বৃত, *Present Day Banking in India*, p. 248.

১৪. জেমস ওয়াইজ, *পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও পেশার বিবরণ* (অনুবাদ : ফওজুল করিম) ইউনিভার্সিটি প্রেস লি., ডিসেম্বর ২০০২, পৃ. ১৮৬।

১৫. *ঐ*

১৬. *ঐ*, পৃ. ১৮৬-১৮৭।

১৭. ড. আর. এম. দেবনাথ, *বাঙালির ব্যাংক ব্যবসা*, পৃ. ২২।

১৮. *ঐ*, পৃ. ২২।

১৯. রমণীমোহন দেবনাথ, *ব্যবসা ও শিল্পে বাঙালি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫। উদ্ধৃত, ড. আর. এম. দেবনাথ, *বাঙালির ব্যাংক ব্যবসা*, পৃ. ২২।

২০. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *ঢাকা ইতিহাস ও নগরজীবন* (১৮৪০-১৯২১), একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবলিশার্স লাইব্রেরি, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ১১৬।

২১. জে. এইচ. লিটল, *হাউজ অব জগতশেঠ* : এন. কে. সিনহার ভূমিকা : কলকাতা হিস্টরিক্যাল সোসাইটি, ১৯৬৭, উদ্ধৃত, ড. আর. এম. দেবনাথ, *বাঙালির ব্যাংক ব্যবসা*, পৃ. ২৬।

২২. মুসতাসীর মামুন, *ঢাকার স্মৃতি-বিস্মৃতির নগরী*, অনন্যা প্রকাশনী, জুলাই ২০০৮, পৃ. ২৮।

২৩. ড. আর. এম. দেবনাথ, *বাঙালির ব্যাংক ব্যবসা*, পৃ.৩০।

২৪. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *ঢাকা ইতিহাস ও নগরজীবন* (১৮৪০-১৯২১), পৃ. ১২৫।

২৫. *ঐ*

২৬. *ঐ* , পৃ. ১২৭।

২৭. *ঐ*, পৃ. ১৩০।

২৮. ড. আর. এম. দেবনাথ, বাঙালির ব্যাংক ব্যাসা, পৃ. ৪০।

২৯. *ঢাকা প্রকাশ*, ১৬ জুলাই ১৯৩৯, ৩১ শে আষাঢ়, ১৩৪৬।

৩০. *ঢাকা প্রকাশ*, ২৯শে ডিসেম্বর ১৯৩৫, ১৩ই পৌষ, ১৩৪২।

৩১. *ঢাকা প্রকাশ*, ৩০ মে, ১৯৪৩, ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০।

৩২. ড. আর. এম. দেবনাথ, *বাঙালির ব্যাংক ব্যবসা*, পৃ. ৪১।

৩৩. *ঐ*, পৃ. ৫৩।

৩৪. *Economic Survey of Pakistan* 1963-64, p. 152. (*DUL*)

৩৫. *ঐ*, p. 152

৩৬. *ঐ*, p. 152

৩৭. *ঐ*, p. 152

৩৮. *ঐ*, p. 152

৩৯. *The State Bank of Pakistan, Its Growth, Function and Organisation*, Development of Research, State Bank of Pakistan, pp. 18-27. (*DUL*)

৪০. *ঐ*, pp.18-27

৪১. *ঐ*, pp. 18-27

Dhaka University Institutional Repository

৪২. ঐ, p. 30
৪৩. ঐ, pp. 18-27
৪৪. *Pakistan* 1953-54, Pakistan publication, Karachi, p. 33. (*DUL*)
৪৫. *Pakistan Trade*, October 1960, p. 147. *(DUL)*
৪৬. *Pakistan* 1953-54, Pakistan publication, Karachi, p. 33.
৪৭. ঐ, p. 33
৪৮. ড. আর. এম. দেবনাথ, *বাঙালির ব্যাংক ব্যবসা*, পৃ. ৫৫।
৪৯. *Pakistan Trade*, October 1960, p. 147.
৫০. *Economic Survey of Pakistan* 1963-64, Economic Adviser to the Government of Pakistan, Ministry of Finance, Rawalpindi, p. 160. (*DUL*)
৫১. ঐ, p. 160
৫১(ক). ঐ, p. 160
৫২. ঐ, p. 160
৫৩. ঐ, p. 160
৫৪. ঐ, p. 160
৫৫. ঐ, p. 160
৫৬. ঐ, p. 161.
৫৭. ঐ, p. 162.
৫৮. ঐ, p. 163.
৫৯. ঐ, p. 164.
৬০. ঐ, p. 164
৬১. ঐ, p. 164
৬২. ঐ, p. 166.
৬৩. S.N.H Rizvi, *East Pakistan District Gazetteers, Dacca 1969*, p. 244.
৬৪. ড. আর. এম. দেবনাথ, *বাঙালির ব্যাংক ব্যাবসা*, পৃ. ৫৭.
৬৫. ঐ, পৃ. ৫৭
৬৬. *Pakistan* 1953-54, Pakistan Publication, Karachi, p. 34.
৬৭. ঐ, p. 34
৬৮. *Pakistan Trade*, October 1960, p. 148.
৬৯. *Pakistan*, 1953-54, p. 35.
৭০. *Economic Survey of Pakistan*, 1963-64, p. 166.
৭১. ঐ, p. 166
৭২. ঐ, p. 166
৭৩. *Pakistan, 1953-54*, pp. 34-35.
৭৪. *Pakistan Trade*, October 1960, p. 148.

Dhaka University Institutional Repository

৭৫. *Economic Survey of Pakistan,* 1963-64, p. 156.

৭৬. *ঐ,* p. 57.

৭৭. *ঐ,* p. 158.

৭৮. *ঐ,* p. 158

৭৯. *ঐ,* p. 158

৭৯ ক. এ কে এম গোলাম রব্বানী, 'ঢাকার অর্থনৈতিক পরিবতন/বিবর্তন পাকিস্তান আমল ১৯৪৭-১৯৭১' এম মোফাখখারুল ইসলাম ফিরোজ মাহমুদ (সম্পাদিত), *রাজধানী ঢাকার ৪০০ বছর ও উত্তরকাল: ২য় খণ্ড- অর্থনীতি ও সংস্কৃতি*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১২, পৃ-৪৪.

৮০. *Economic Survey of Pakistan,* 1963-64, p. 158

৮১. *ঢাকা প্রকাশ*, ১৯৩৯ সালের ২৪ জুন।

৮২. *Pakistan* 1962-63. Pakistan Publication, Karachi, p. 57.

৮৩. S.N.H Rizvi : *East Pakistan District Gazetteers, Dacca 1969,* p. 245

৮৪. ড. আর. এম. দেবনাথ, *বাঙালির ব্যাংক ব্যাবসা*, পৃ. ৬৮.

৮৫. ড. আর. এম. দেবনাথ, *বাঙালির ব্যাংক ব্যাবসা*, পৃ. ৫৯.

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনামলের প্রথম দিকে উপমহাদেশে যে ধরনের নতুন ক্ষমতা, কাঠামো ও সমৃদ্ধির সূচনা হয়, ঢাকা সে সুযোগ গ্রহণ করতে পারে নি। এর প্রধান কারণ ছিল নতুন শাসকবর্গের স্বার্থ বৃদ্ধির সাথে সাথে ঢাকার নিজস্ব স্বার্থের বা উন্নয়ন ক্ষেত্রের সরাসরি সংঘাত। এর ফলে ঢাকার রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক জীবনে যেমন দুঃসময়ের ছায়া পড়ে, তেমনি এর অর্থনৈতিক জীবনেও নেমে আসে এক বড় রকমের ধস। কিন্তু তারপরও শহরটির অবস্থানগত গুরুত্ব থেকে যায়। যা অচিরেই ঢাকার পুনরুজ্জীবনের সহায়ক হিসেবে কাজ করে। ড. শরীফ উদ্দিন আহমেদ উল্লেখ করেছেন যে, সরকারি নীতিমালা এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও একই সাথে অবদান রাখে। এ আলোকেই ঢাকার অগ্রযাত্রা শুরু হয় যা বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তোলে এর আধুনিকায়নকে।[১] মধ্যযুগীয় একটি প্রাচ্য নগরী থেকে উত্তরণ ঘটে পাশ্চাত্য প্রভাবিত আধুনিক ঢাকার। যার প্রকাশ ঘটেছে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে—বিশেষ করে প্রশাসন, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে।

অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ঢাকা শহরের কুটির শিল্পজাত প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। কেননা কুটির শিল্পজাত দ্রব্যকে কেন্দ্র করে ঢাকায় ব্যাপক বাণিজ্য হয়। যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। যে কোনো দেশেই কুটির শিল্প হলো ঐ দেশের একটি অর্থনৈতিক শক্তি। এই সম্পর্কে *ঢাকা প্রকাশের* একটি প্রতিবেদনেও উল্লেখ করা হয়,

> "কুটির শিল্পের উন্নতি ও সুব্যবস্থা সমাজ জীবনে মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে বিশেষ শক্তি ও মর্যাদা দান করে। এরিস্টটলের মতে, যে রাজনৈতিক সমাজ মধ্যবিত্ত নাগরিক লইয়া গঠিত তাহাই শ্রেষ্ঠ। তিনি বলেন, যে রাষ্ট্রে অপর শ্রেণি অপেক্ষা মধ্যবিত্তের সংখ্যা বেশি সেই রাষ্ট্রের পরিচালন ব্যবস্থা সবচাইতে ভালো। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণি যাহাতে অপর দুই শ্রেণির কর্তৃত্বকে সামলাইয়া রাখিতে পারে সেইরূপ হওয়া একান্তই বাঞ্ছনীয়। ছোট ছোট শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে যদি যথাযথভাবে বর্ধিত করা যায় এবং তাহাদের সকল রকম সুবিধার দিকে নজর রাখা যায়, তাহা হইলেই মধ্যবিত্ত শ্রেণির উন্নতি সাধন করা সম্ভব হইবে।
>
> ...এই ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানই জাতির অর্থনৈতিক বুনিয়াদ কায়েম করে। দেশের নব নব আবিষ্কার ও পরিকল্পনার বেশির ভাগই ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানের নিকট দায়ী। এই সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবসা ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উৎসাহ জাতীয় জীবনে সর্বাপেক্ষা বেশি প্রয়োজনীয়।...

ছোট ছোট ব্যবসা ও কুটির শিল্পের সম্প্রসারণের দ্বারা বাজারের একাধিপত্যকে বাধা দান করা যায়। অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান যখন এক সঙ্গে মাথা উঁচু করিবার চেষ্টা করিতে থাকে এবং উহাদের মধ্যে যখন অনেকগুলিই সার্থকতা লাভ করে, তখন কোন এক নির্দিষ্ট ব্যবসায়ীর পক্ষে সম্পূর্ণ বাজারে একাধিপত্য কায়েম করা সম্ভব নয়। শিল্পক্ষেত্রে এই সকল

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতার ফলে বহু বেকার লোকের চাকুরি হয় এবং দেশবাসীর জন্য নানা সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়।

কুটির শিল্পের উন্নয়নের জন্য পূর্ববঙ্গ সরকারও কতগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। কুটির শিল্প বোর্ড স্থাপন করা হইয়াছে। কুটির শিল্পীদের জন্য কাঁচামাল সংগ্রহ ও তৈরি দ্রব্য বিভিন্ন বাজারে পাঠাইবার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। আমদানি ও রপ্তানিকর ধার্য করা সম্পর্কে বিশেষ কড়াকড়ি না করারও এক প্রস্তাব সরকার করিয়াছেন। কিন্তু উপসর্গ দমিত হইলেই রোগ সারিয়া যায় না, কাজেই অন্যান্য সমস্যার মত কুটির শিল্প সমস্যার কথাও সরকারকে পূর্ণভাবে বিবেচনা করিতে হইবে"।[২]

উপরের উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, একটি দেশের উন্নয়নের জন্য কুটির শিল্প থাকা খুবই জরুরি এবং এর যত্ন নেয়াও দরকার। ঢাকা শহরে এক সময় কুটির শিল্পজাত দ্রব্যকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক মানের ব্যবসা-বাণিজ্য হতো এবং পৃথিবী জুড়ে এসব দ্রব্যের সুনাম ছিল। বর্তমান অভিসন্দর্ভের আলোচ্য সময়ে ঢাকার ঐতিহ্যবাহী কিছু কুটির শিল্প বিলুপ্ত হলেও কিছু কিছু চলমান ছিল। আবার কিছু নতুন শিল্পের আবির্ভাবও হয়েছে। যেমন—ট্যানারি শিল্প। অভিসন্দর্ভের আলোচ্য সময়ের শুরুর দিকে এ শিল্প ছিল না। পরবর্তীতে দেশভাগের পর এই শিল্পের আবির্ভাব হয়। এই সময় অধিকাংশ ট্যানারি কুটির শিল্প পর্যায়ের ছিল। এসব ট্যানারিতে আধুনিক পদ্ধতিতে চামড়া পাকাকরণ হতো না, সজি শোধিত ট্যানিং হতো। ঢাকার সজিশোধিত পাকা চামড়া স্থানীয় বাজার, পাকিস্তান, তুরস্ক এবং ইরানে রপ্তানি করা হতো। কাবুলি চপ্পল তৈরির জন্য এই চামড়ার ব্যাপক চাহিদা ছিল।[৩] পরবর্তীতে ১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝিতে Chrome Tan চালু হয়। পাকিস্তান আমলে ৩০টিরও বেশি মাঝারি ও বড় আকারের ট্যানারি ছিল। এসব ট্যানারির অধিকাংশ মালিক ছিল পাকিস্তানি ও ভারত থেকে আগত অবাঙালি। তবে দেখা যায় যে, অধিকাংশ আড়তদার কাঁচা চামড়া সরবরাহকারী ছিল বাঙালি। বাঙালিদের এই শিল্প সম্পর্কে তেমন কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। কেননা তারা শিক্ষিত ছিল না। এটি ছিল তাদের কাছে নতুন একটি শিল্প। যদিও ব্রিটিশ যুগ থেকে আলোচ্য সময় পর্যন্ত বিপুল পরিমাণে কাঁচা চামড়া কলকাতা ও পাকিস্তানে পাঠানো হত। আর এই চামড়া রপ্তানি করে যে লাভ হতো তার বেশির ভাগই পাকিস্তানিরা ভোগ করত।

অপরদিকে এই সময়ই ঢাকার চামড়ার গুণাগুণ সম্পর্কেও জানা যায়। গবেষণায় দেখা যায় যে, পূর্ববাংলা তথা ঢাকার কাঁচা চামড়ার সবচেয়ে অনুকূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-এর ত্বকের মসৃণতা। কেননা ইউরোপীয় চামড়ায় Fibre অবকাঠামো মজবুত হলেও ত্বকের মসৃণতা উঁচু-মানের হয় না। এই অঞ্চলের ছাগলের চামড়ার Grain Pattern এতই আর্কষণীয় যে, Fashionable Glaze Kid চামড়ার মসৃণতা মহিলাদের জুতা ও ব্যাগের জন্য বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। তাই এদেশের ফিনিসড চামড়া প্রাকৃতিক কারণেই মানানসই এবং আকর্ষণীয়। এ দেশের চামড়া সম্পর্কে তাই যুগে যুগে মানুষ বলে এসেছে "There is nothing like leather"

Dhaka University Institutional Repository

আবার এটাও দেখতে পাওয়া যায় যে, কাঁচা চামড়া সংরক্ষণ এই অঞ্চলের একটি প্রধান সমস্যা। কেননা কাঁচা চামড়া যেহেতু একটি প্রাকৃতিক কাঁচামাল তাই এটি পচনশীল। একটি সদ্য ছড়ানো কাঁচা চামড়া পরীক্ষা করলে এতে সক্রিয় এনজাইম পাওয়া যায়। সংরক্ষক কিছু ব্যবহৃত না হলে অল্প সময়ের মধ্যে এই এনজাইম কাঁচা চামড়ার প্রোটিন অবকাঠামো ভাঙতে আরম্ভ করে। এজন্যই বাংলাদেশের মত গ্রীষ্ম প্রধান দেশে কাঁচা চামড়ার সংরক্ষণ একটি বিরাট সমস্যা। শুধু উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে এদেশে কাঁচা চামড়ায় বছরে শত কোটি টাকার ক্ষতি হয়। এ ক্ষতি অতীতেও হতো, বর্তমানেও হচ্ছে।

যেহেতু চামড়া শিল্প একটি ঝুঁকি বহুল শিল্প তাই সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারলে ঝুঁকির মাত্রা হ্রাস পাবে। আবার চামড়া শিল্প হচ্ছে কেমিক্যাল বহুল শিল্প। কাঁচা চামড়া সংরক্ষণের শুরু থেকে ফিনিসড চামড়া সংরক্ষণ পর্যন্ত অসংখ্য কেমিক্যালের প্রয়োজন হয়। তবে আলোচ্য সময়ে আধুনিক কোন যন্ত্রপাতি ও কেমিক্যাল ব্যবহৃত হতো না। বর্তমানে যেসব কেমিক্যাল ব্যবহৃত হয় তার মেয়াদ মাত্র ৬ মাস পর্যন্ত থাকে, অবশ্য কিছু কিছু কেমিক্যালের মেয়াদ হচ্ছে এক বছর পর্যন্ত থাকে। চামড়া শিল্পকে সংরক্ষণ করে লাভজনক করতে কেমিক্যালের অবদান অনেক। পাকিস্তান আমলে এই সুযোগ ছিল না। পাকিস্তান আমলে ট্যানারি শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার যেসব পদক্ষেপ নেয় তার মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হলো ট্যানিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা। ১৯৫০ সালে ঢাকা শহরের নিকটে হাজারিবাগে The East Pakistan Institute of Leather Technology প্রতিষ্ঠিত হয় ইন্ডাস্ট্রিজ ডিপার্টমেন্টের অধীনে। এই ইনস্টিটিউট বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ।

দেশ স্বাধীনের পর (১৯৭১) পাকিস্তানিরা চলে যায়। এই সময় ৩০টিরও বেশি ট্যানারি ছিল। পরবর্তীতে এর কিছু বন্ধ হয়ে যায় এবং প্রায় ২৪টি ট্যানারি জাতীয়করণ করা হয়। ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ ট্যানারি কর্পোরেশন। ১৯৭৬ সালে বিটিসি (Bangladash Tannery Corporation) বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশনের (বিসিআইসি) সাথে যুক্ত হয়। এই সময় বিসিআইসির অধীনে বড় ধরনের ১৯টি ট্যানারি ছিল। বাকিগুলো প্রাইভেট সেক্টরে দেয়া হয়। জাতীয়করণের ফলে ট্যানারি শিল্পের তেমন কোন উন্নতি হয় নি। বেশির ভাগ ট্যানারি ব্যাংকের কাছে ঋণী ছিল। পরবর্তীতে সব ট্যানারি ব্যক্তিগত মালিকানায় দেওয়া হয়। আর এভাবেই ট্যানারি শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং এই শিল্পের রপ্তানি আয় বৃদ্ধির মানসে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর মাধ্যমে একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয়। এ সমস্ত চড়াই-উৎরাই পার হয়ে এ শিল্পের উদ্যোক্তা ও সরকারীপক্ষের নিরবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় এ শিল্প দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বর্তমান অবস্থানে দাঁড়াতে পেরেছে।

অপরদিকে অন্যান্য কুটির শিল্পজাত দ্রব্য (বোতাম, শঙ্খ, কাঁসা-পিতল) নিয়ে ব্যাপক ব্যবসা হলেও অভিসন্দর্ভের আলোচ্য সময়ে অল্প পরিসরে ব্যবসা হতো। এর কারণ বিকল্প দ্রব্যের ব্যবহার। যেমন—হাড়, শিং-এর বোতামের পরিবর্তে সেলুলয়েডের বোতাম প্রচলন, কাঁসা-পিতলের পাত্রের পরিবর্তে কমদামি বিকল্প দ্রব্য বা এলুমিনিয়ামের বা অন্যান্য দ্রব্যের

Dhaka University Institutional Repository

প্রচলন। কাঁসা-পিতল শিল্পের ক্রমাবনতির কারণ সম্পর্কে *দৈনিক বার্তায়* বলা হয়, "কাঁচামালের দুষ্প্রাপ্যতা, মূল্যবৃদ্ধি, জ্বালানির অভাব, মহাজন ও ফড়িয়া শ্রেণির অধিক মুনাফা লাভের আশা। ... এ শিল্পের সাথে জড়িত যারা তাদের অধিকাংশই মূলধনহীন। তারা মহাজনদের অধীনে কাজ করে জীবিকা অর্জন করে থাকে। কাঁসা-পিতলের ব্যবহার কমে যাওয়ায় এ জাতীয় শ্রমিকরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। ...এর জন্য সর্বাগ্রে যা প্রয়োজন তা হলো এই শিল্পে মূলধনের যোগান দেয়া। সেই সাথে কাঁচামালের যে অভাব রয়েছে তা পূরণ করার দিকেও দৃষ্টি দিতে হবে। এই দুটি প্রয়োজনীয় বিষয়ে সঠিক পদক্ষেপ গৃহীত হলে এই শিল্পের উৎপাদন ব্যয় অবশ্যই কম হবে। তাহলে এর ব্যবহারও বেড়ে যাবে। কাঁসা শিল্প উন্নয়নে যত্নবান হলে এবং প্রয়োজনীয় কারুকার্যখচিত কাঁসা-পিতলের পণ্য উৎপাদন করা গেলে তা বিদেশে রপ্তানি করার একটা উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। এদেশের কুটির শিল্পের বিদেশে ভালো চাহিদা রয়েছে। সেদিক থেকে কাঁসা শিল্পের বিদেশে বাজার সৃষ্টি করা সম্ভব বলে আমরা মনে করি। এসব সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করে অনতিবিলম্বে এই শিল্পের প্রসার এবং পুনরুজ্জীবনের জন্য সচেষ্ট হওয়া অপরিহার্য।"[৪]

স্বল্প পরিসরে হলেও এসব প্রতিষ্ঠানে অনেক লোক কাজ করত। যারা ঢাকার অর্থনৈতিক বুনিয়াদ এবং ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখতে সহায়তা করে এবং একটি বিশেষ শ্রেণি (কাঁসারি) হিসেবে আজও টিকে আছে।

১৯৪৭ সালের পূর্বে পূর্ববাংলার জনসংখ্যার প্রায় ৯৮ ভাগই ছিল পল্লীবাসী। ঐ সময় প্রাক্তন পশ্চিম পাকিস্তান অঞ্চলে শহরবাসীর সংখ্যা কিছু বেশি ছিল অর্থাৎ শতকরা ৪.৮ জন। উপমহাদেশের অবশিষ্ট অংশের অর্থাৎ ভারতে শহরবাসীর সংখ্যা ছিল গড়ে শতকরা ১৩.৮ জন।[৫] শহরবাসীর শতকরা হার শিল্পোন্নয়নের নির্দেশক। তাই পূর্ব পাকিস্তান ১৯৪৭ সালের পূর্বে পশ্চিম পাকিস্তান ও ভারতের তুলনায় পশ্চাদপদ ছিল। ১৯৪৭-৪৮ সালের দিকে অবিভক্ত ভারতে প্রায় ২৫ হাজার সংগঠিত ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান ছিল। এর আদায়কৃত মূলধনের পরিমান ছিল মোট ৫৮৫ কোটি টাকা। পাকিস্তানের ভাগে গড়ে মাত্র ২.৮ সহস্র প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ প্রায় শতকরা দশ ভাগ। কিন্তু তৎকালীন পাকিস্তানে খাটানো মূলধনের পরিমাণ ছিল মাত্র ১৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের অংশে পড়ে ১.৩ সহস্র প্রতিষ্ঠান। যার আদায়কৃত মূলধন ছিল মাত্র ৩ কোটি টাকা।[৬] সে সময়ে পূর্ব পাকিস্তান অঞ্চলে ছোট আকারের যে কয়টি শিল্প প্রতিষ্ঠান ছিল তারও মালিক ছিল অমুসলমানগণ, যাদের অনেকেই পরবর্তীতে কলকাতায় চলে যায়।

আধুনিক শহর হিসেবে ঢাকার প্রতিষ্ঠা ও পরিকল্পনা ১৯৪৭ সালের পরের ঘটনা। পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী হিসেবে ঢাকা শহর বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে জন্ম লাভ করে এবং সে উন্নয়নের প্রকৃতি ও প্রক্রিয়া বর্তমানে চলছে। পাকিস্তান আমলের ২৪ বছরের শাসনে ঢাকার ব্যবসা-বাণিজ্য সে অর্থে ততটুকু উন্নতি হয় নি—যতটুকু আশা করা হয়েছিল। বরং বলা যায় শোষণ নির্যাতন আর সম্পদ পাচারের যে ইতিহাস ইংরেজ আমলে

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছিল কিছুটা বিরাম দিয়ে সে প্রক্রিয়াই পাকিস্তানে আমলেও চলে। যা বিভিন্ন অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে কাঁচামাল রপ্তানি ও বিদেশি দ্রব্য আমদানির মাধ্যমে।

১৯৪৭ সালে অপেক্ষাকৃত অসুবিধাজনক অবস্থা হতে শিল্পায়ন শুরু হয়। ঐ সময়ে পাকিস্তানের কোন অংশেই পাট, লোহা, সিগারেট ইত্যাদি শিল্প ছিল না। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে তথা ঢাকায় কয়েকটি কাপড়ের কল, একটি সিমেন্ট কারখানা, কিছু পাট বেইল করার কারখানা উল্লেখ করা চলে। নবগঠিত পূর্ব পাকিস্তান অঞ্চলের শিল্পজাত দ্রব্যের প্রয়োজন, প্রধানত ভারতের শিল্পোন্নত অঞ্চলের মাধ্যমে মেটানো হতো।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর কারিগরি কৌশল এবং মূলধনের অভাব পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান সমস্যা ছিল। এছাড়াও ছিল আধুনিক শিক্ষার অভাব অর্থাৎ শিল্প কারখানা গড়ে তোলার জন্য পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব।

কিন্তু তা সত্ত্বেও ১৯৬৭-৬৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানে মোট রেজিস্ট্রিকৃত ফ্যাক্টরির সংখ্যা ছিল ৩৫০০টিরও বেশি। এগুলির মধ্যে ৯৯৫টি বয়ন শিল্পের কারখানা, ৬৪২টি রাসায়নিক কারখানা এবং ৪৩০টি খাদ্য শিল্পের কারখানা।[৭] উল্লেখ্য ঢাকা শহরে যতগুলো কারখানা গড়ে উঠেছিল তা শিল্পকারখানা অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে। তবে এই সময় ঢাকা শহরে ভারি শিল্পের চেয়ে মাঝারি ও ছোট শিল্পকারখানা গড়ে ওঠে স্বল্প মূলধনে। ছোট ও মাঝারি হলেও এসব কারখানায় অনেক লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছিল। ১৯৫৫ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান কারখানাগুলোতে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ২ লক্ষেরও বেশি। ঢাকা শহরের বিভিন্ন কারখানাগুলোতে শ্রমিকের সংখ্যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

একটি পৃথক রাষ্ট্রের অংশ হিসেবে পৃথক একটি অর্থনৈতিক এলাকা পূর্ব পাকিস্তানের যেকোন শিল্প প্রচেষ্টা বাইরের প্রতিযোগিতা হতে কিছুটা রক্ষা পেয়েছিল। এমনকি তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের যেকোন শিল্পজাত দ্রব্য পূর্ব পাকিস্তানে আনতে গেলে এর পরিবহন ব্যয় এত অধিক হতো যে, ঐ ব্যয় পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প প্রচেষ্টাকে কিছুটা উৎসাহ দিয়েছে। সাধারণত পাকিস্তান আমলে দুই ধরনের শিল্প গড়ে উঠেছিল। প্রথমত কাঁচামাল হিসেবে বিদেশে প্রেরণ করা যেত এমন দ্রব্যের উপর ভিত্তি করে শিল্প, যেমন—চামড়া/ট্যানারি শিল্প। দ্বিতীয়ত যেসকল নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য পূর্বে বাইরে থেকে আমদানি করা হতো, যেমন—সাবান, সুতা, ঔষধ, ব্যাটারি, কাপড়। তবে এসব দ্রব্য স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হলেও আমদানি হতো বেশি। বিশেষ করে কাপড়, সুতা, ঔষধ। কেননা এই সময় উৎপাদিত শিল্পজাত দ্রব্যের মান তেমন উন্নত ছিল না এবং প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাতে পারত না।

আলোচ্য সময়ে ঢাকার যেসব ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তার বিপণন ব্যবস্থা যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে প্রত্যেক দ্রব্যেরই বিপণন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে

Dhaka University Institutional Repository

একই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ প্রত্যেকটি দ্রব্য উৎপাদক, সরবরাহকারী থেকে মহাজন এবং বিক্রেতা থেকে ক্রেতার কাছে পৌঁছাত।

অপরদিকে এই সময়ে ঢাকায় দুই ধরনের বাণিজ্যিক এলাকা গড়ে ওঠে। একটি দেশীয় বাণিজ্যিক এলাকা, অপরটি হলো আধুনিক বাণিজ্যিক এলাকা। দেশীয় বাণিজ্যিক এলাকা যেমন— শাঁখারিবাজার, পোস্ত, মালিটোলা, লক্ষ্মীবাজার, চক ইত্যাদি। এসব বাণিজ্যিক এলাকার বৈশিষ্ট্য হলো এখানকার ৫০% এলাকার দোকানের মালিক তাদের দোকানের সাথে বসবাস করত। দেশীয় বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলো ছিল জীর্ণ। এখানে প্রধানত স্থানীয় দ্রব্য বেশি বিক্রি হতো। যেমন— চকে ৫১% স্থানীয় দ্রব্য, ১৬% বিদেশি দ্রব্য, পাটুয়াটুলীতে ৪০% স্থানীয় দ্রব্য এবং ২২% বিদেশি দ্রব্য, বাংলাবাজারে ৪৭% স্থানীয় দ্রব্য এবং ৩১.৫% বিদেশি দ্রব্য পাওয়া যেত।[৮]

অপরদিকে আধুনিক ভবন, বিদেশি দ্রব্য এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নিয়ে ঢাকার নতুন পশ্চিমার্ধাংশের বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলো গড়ে ওঠে (মতিঝিলের ব্যবসা ৭৭.৭% পরিচালিত হতো বিদেশি দেশসমূহের সাথে, গুলিস্তানে ৫১% বিদেশি এবং ২৬.৬% স্থানীয় পর্যায়ে ব্যবসা হত)[৯]।

এই সময় আরেকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় সেটি হলো পরিকল্পিত শিল্পনগরী, যেমন— তেজগাঁও, হাজারিবাগ। ১৯৪৭ সালের পূর্বে ছোট শহর এবং স্বল্প পাট গাঁট প্রস্তুতের যন্ত্র ও আরদ নিয়ে ঢাকার আরেকটি অংশ নারায়ণগঞ্জ পাট ও অন্যান্য শিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়। নারায়ণগঞ্জে শিল্প বিশেষ করে পাট শিল্প দেশ স্বাধীনের পর খুব দ্রুত ও সম্ভবনা নিয়ে গড়ে ওঠে। পূর্বাঞ্চলের সর্ববৃহৎ পাটকল আদমজি পাটকল নারায়াণগঞ্জেই গড়ে ওঠে। আদমজি ছাড়া আরো কয়েকটি পাটকল এখানে গড়ে ওঠে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বস্ত্রকল এখানে গড়ে ওঠে। এছাড়া এই অঞ্চল হোসিয়ারি শিল্প হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। মূল ঢাকা শহর ঘনবসতি হওয়া সত্ত্বেও নদীর ধার ঘেঁষে ঢাকা নারায়ণগঞ্জ সড়কের পাশে পোস্তাগোলায় বিভিন্ন শিল্পকারখানা গড়ে ওঠে।

আবার পাকিস্তান সৃষ্টির প্রাক্কালে ঢাকার অধিবাসীগণ পেশাগত দিক থেকে প্রধানত ছয়টি শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। যথা (১) জমিদার শ্রেণি (২) চাকুরিজীবী (৩) ব্যবসায়ী (৪) কৃষিজীবী (৫) কারিগর সম্প্রদায় (৬) মাঝি ও জেলেসহ শ্রমজীবী শ্রেণি। পূর্ব পাকিস্তান সরকার কর্তৃক ১৯৫০ সালে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ ও প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়নের ফলে অন্যান্য অঞ্চলের মত ঢাকার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক সুদূর প্রসারী সম্ভবনাময় পরিবর্তনের সূচনা ঘটে। জমিদার শ্রেণি ধীরে ধীরে বিলুপ্তির পথে ধাবিত হয় এবং ১৯৫৬ সালের মধ্যে জমিদারি প্রথা সম্পূর্ণরূপে লোপ পায়।

এই আইনের ফলে কৃষক সম্প্রদায়ের বিশেষ করে ভূমিচাষী শ্রেণি সরাসরি রাষ্ট্রের প্রজা হিসেবে পরিগণিত হয় এবং তারা জমির উপর বংশানুক্রমিকভাবে স্থায়ী স্বত্বাধিকার ও হস্তান্তরের ক্ষমতা লাভ করে। এ সময় ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পকারখানা স্থানীয় পাকিস্তানি

Dhaka University Institutional Repository

এবং ভারত থেকে আগত মুসলমানদের হাতে ব্যাপকভাবে চলে যায়। তা সত্ত্বেও কিছু বৃহৎ শিল্প ও ব্যবসার ক্ষেত্রে বিশেষত কার্পাস শিল্প, পাট ব্যবসা ও স্বর্ণরৌপ্য অলংকার নির্মাণশিল্পে পূর্ববর্তী পুঁজিপতিদের প্রাধান্য বজায় থাকে। কিন্তু বাজার অর্থনীতিতে কর্তৃত্বকারী শক্তি হিসেবে তারা আর গণ্য হতো না। ষাটের দশকে মধ্যবিত্ত সমাজ তিন শ্রেণিতে বিভক্ত হয়। উচ্চ মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং নিম্নমধ্যবিত্ত। পূর্বের যেকোন সময়ের চেয়ে কৃষক সম্প্রদায় এই সময় অধিকতর আত্মনির্ভরশীল এবং কর্মতৎপর হয়ে ওঠে। অন্যদিকে দক্ষ এবং অদক্ষ উভয় প্রকার শ্রমিক শিল্প ও নির্মাণ কাজে নিয়োজিত হয়। যেহেতু ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে ঢাকার স্থানীয় শিল্পপতি ও বৃহৎ ব্যবসায়ীর অস্তিত্ব ছিল না বললেই চলে সেহেতু ঐ সময়ে শিল্পকারখানা ও ব্যবসা-বাণিজ্য বহিরাগত অবাঙালিদের কুক্ষিগত ছিল। শিল্পাঞ্চলের বিস্তার ও নতুন শিল্প এলাকা গঠনের প্রেক্ষিতে বিপুল পরিমাণে শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, দোকানদার ও কর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আবার ১৯৪৭ সালের পূর্বে ঢাকায় তেমন কোন নিজস্ব ব্যাংক বা বাণিজ্যিক ব্যাংক ছিল না। কলকাতার বিভিন্ন ব্যাংকের শাখা ছিল। যারা মূল্যবান স্বর্ণালংকার অথবা জমিজমা অথবা সম্পত্তির বিপরীতে ঋণ প্রদান করত। ঢাকার ব্যবসা-বাণিজ্য অভ্যন্তরীণ হওয়াতে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকের দরকারও ছিল না। দেশভাগের পর কলকাতার প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকগুলো বন্ধ হয়ে যায়। ফলে এই শূন্যতা পূরণ করার জন্য কিছু ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। যদিও এই সময় কলকাতার মত কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের শাখার সংখ্যাই বেশি ছিল। এসব ব্যাংকের পূর্ণ কর্তৃত্ব পাকিস্তানিদের হাতে ছিল। বাঙালিরা সাধারণ কর্মচারী হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণাধীনে কাজ করত। এসব ব্যাংকের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য খুব বেশি লাভ না হলেও কিছু কিছু ব্যাপারে শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে কাজ করে। কেননা কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমে এই অঞ্চলের কৃষির অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করা হয়, গৃহায়ণের ব্যবস্থা নেয়া হয়। যদিও এসব প্রচেষ্টা অল্প ছিল। তারপরও বলা যায় যে, পাকিস্তান আমলের অভিজ্ঞতা নিয়েই পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশ তার ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে তোলে। অপর দিকে এ সময় ব্যাংকার নামে একটি নতুন শ্রেণির প্রকাশ ঘটে।

পাকিস্তান আমলে যে কয়জন বাঙালি ব্যবসায়ী ও বৃহৎ শিল্পপতির উদ্ভব হয় তাদের সংখ্যা হাতে গোনা কয়েকজন। তারা অনেকেই স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হারায়। দেশ স্বাধীনের পর ধীরে ধীরে বাঙালি নব্য শিল্পপতি ও বৃহৎ ব্যবসায়ীর উদ্ভব হয়। কেননা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা জেলার জনগণ ক্রমাগত অধিক হারে কৃষির পরিবর্তে অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত হতে থাকে। অন্যান্য জেলা থেকে ক্রমাগত অধিকহারে কর্মপ্রার্থীর আগমন শুরু হয়। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের কলেবর বৃদ্ধির ফলে কেরানি, পিয়ন ও অন্যান্য শ্রেণির চাকুরিজীবীদের সংখ্যা বাড়ে। পাঞ্জাবি ও বহিরাগত বিহারিদের পরিবর্তে উচ্চ পদসমূহে বাঙালিরা নিয়োজিত হয়। সমাজে সম্ভ্রান্ত

Dhaka University Institutional Repository

উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব হয়। ঢাকা দেশের রাজধানী হওয়ায় বিভিন্ন স্থাপনা নির্মিত হতে থাকে। এতে নির্মাণ শ্রমিকের চাহিদা বেড়ে যায়। রাস্তাঘাট নির্মাণ ও সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটে। ফলে সংশ্লিষ্ট শিল্পে শ্রমিক সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এভাবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্প্রসারিত হওয়ার কারণে স্বাধীনতাত্তোর সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের কাঠামো দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, আলোচ্য সময়ের শুরুতে ঢাকায় তেমন উল্লেখযোগ্য কোন ব্যবসা-বাণিজ্য না হলেও পাকিস্তান আমলে ঢাকার ব্যবসা-বাণিজ্যে কতিপয় বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, পাকিস্তান আমলেই প্রথম বহুজাতিক কোম্পানির ব্যবসার প্রচলন হয়, যেমন— ঔষধ কোম্পানি; দ্বিতীয়ত, শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের মান অত্যন্ত নিম্ন পর্যায়ে চলে আসা, যে মসলিন কাপড়ের জন্য ঢাকা একসময় বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হতো, সেই মসলিন তৈরি তো দূরের কথা, সাধারণ কাপড়ের উৎপাদন মান এতই নিম্ন পর্যায়ে পৌছায় যে, এগুলি বাজারের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারে নি। যার ফলে শুরু হয় বিদেশ থেকে আমদানি ; যে প্রক্রিয়া আজো অব্যাহত রয়েছে। তৃতীয়ত, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান উন্নয়নের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যেও আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই পাকিস্তান আমলেই চিরাচরিত পণ্য উৎপাদন ও বিপণনের পাশাপাশি ঢাকার বাজারসমূহে ক্রমান্বয়ে ক্রয়-বিক্রয় হতে থাকে ফ্যাশন জাতীয় পণ্য যার অধিকাংশই বিদেশ থেকে আমাদানিকৃত, যেমন— ইলেকট্রনিক্স পণ্যসামগ্রী। চতুর্থত, ইংরেজ আমলের ন্যায় পাকিস্তান আমলেও ঢাকার ব্যবসা-বাণিজ্যে অবাঙালি আধিপত্য বেশি ছিল। বড় বড় ব্যবসা, যেমন— ব্যাংক, বিমা, শিল্পপ্রতিষ্ঠান, কলকারখানা ইত্যাদি অধিকাংশের মালিক ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি। পঞ্চমত, ব্যবসায়ে দুর্নীতি ঘুষ ইত্যাদি অব্যবসায়ীমূলক কার্যক্রম ঢাকার ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রবেশ করে। বর্তমান ঢাকার অদূরেই বিখ্যাত নকল পণ্যের পীঠস্থান জিঞ্জিরা তারই প্রমাণ।

প্রকৃত অর্থে সমগ্র পাকিস্তান আমলে ঢাকার ব্যবসা-বাণিজ্যের তেমন কোন অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায় না। ঢাকা আয়তনে কেবল সম্প্রসারিত হয় এবং তা হয় শোষণের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার জন্য, ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য নয়। ইংরেজ আমলে যে শহর কুটির শিল্প এবং বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে পৃথিবীব্যাপী পরিচিত ছিল, সেই ঢাকা শহর পাকিস্তান আমলে অধিক পরিচিত হয় পশ্চিম পাকিস্তানিদের শোষণ আর বাণিজ্য সংকোচন নীতির বিরুদ্ধে বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের শহর হিসেবে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে জন্মলাভের পর ঢাকা শহরের বাণিজ্যের ধারা আবার পরিবর্তিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

১. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *ঢাকা ইতিহাস ও নগরজীবন ১৮৪০-১৯২১*, একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবলিশার্স লাইব্রেরি, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ৩৪০।

২. *ঢাকা প্রকাশ*, ১৬ এপ্রিল ১৯৫০।

৩. M. M. Huq and K. M. Nabiul Islam, *Choice of Technology Leather Manufacturing in Bangaladesh*, Unversity Press Limited 1990, p. 17.

৪. *দৈনিক বার্তা*, ২০ এপ্রিল ১৯৭৮।

৫. আব্দুল্লাহ ফারুক, *বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস*, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪, পৃ. ৬৪।

৬. *ঐ*, পৃ. ৬৫।

৭. *ঐ*, পৃ. ৬৬।

৮. Sharif Uddin Ahmed (ed), *Dhaka, Past Present Future,* Asiatic Society of Bangladesh, 2nd Edition, 2009, p. 440.

৯. *ঐ*.

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১

DACCA HIDE & SKIN BUYERS & SHIPPERS ASSOCIATION

92, POSTHA, DACCA

To

The Secretary,

Ministry of Commerce,

Government of Pakistan,

Karachi.

Through,

The Ministry,

of Commerce, Labour & Industries,

Government of East Bengal,

Eden Building, Ramna,

Dacca.

Sir,

Subject : **Government Notification Mo.351/403/53 dated 1st October 1953 issued by the ministry of Commerce for imposing' Tariff Rates on the Export of Hide & Skins.**

I have the honour to enclose herewith the copies of our telegrams which has been sent to you and the Honourable Prime Minister on the 19th ultimo and 11th inst», in connection with the above Notification, and are therefore anxiously awaiting reply of our communication and the Government decision on the above subject.

The Shippers of Cowhides of this wing of Pakistan to when this Association represents, were terribly shocked and greatly disappointed to learn the sudden news of the above notification without a prior Notice to East Pakistan Shippers and without consulting the Exporters concerned. It is therefore regrettable.

Dhaka University Institutional Repository

Is it a justice from the part of the Government that a new rule should be enforced on trade and particularly on Exporters who earn the foreign Exchange for the Country, with immediate effects and without notifying the exporters concerned a few months earlier.

As explained in our recent telegrams sent to you and our last letter of the 10th ultimo.. the Shippers of Cowhides in East Pakistan had already made innumerable Contracts with the buyers of the foreign countries for supylying them the Dacca Drysalted Cowhides on the basis of the foreign prices ruling before 1st October. Those Contracts should have to be fulfilled before the end of this year by the Shippers. But the sudden enforcement of the above notification since October 1st for imposing high Tariff Rates on the export of Cowhides to realize the Customs Duty, is putting all the Shippers of Cowhides to suffer heavy losses in their previous Contracts and commitment.

Sir, if the Shippers are injured, the exports of the country would be injured. Would the Government be pleased if the Shippers sustain heavy losses and finally close down their foreign business. As far as we know the Government of all Countries always assists and back the businessmen, mainly the Exporters of Important commodities.

We do not want that the Government should not fix the Tariff Rates on the Exports of Hides & Skins, we quite appreciate the system of Tariff Rates and this Association is fully prepared to co-operate with the Government policy whole heartedly, but our petition is this Sir, that before introduction of Tariff Hates etc, the Exporters concerned must be consulted and should be informed at least a few month earlier, so that they might not undergo heavy losses in fulfillment of their previous Contracts and obligations with the foreign countries in facing the high Tariff Rates.

Sir, for your guidance I enclose herewith the monthly purchase report of cowhides which will indicate you the ruling prices of Dacca market for the last several months. It is therefore obvious that the new Tariff Rates imposed on cowhides since October 1st under the above Notification are extremely high than the current market rates. The Shippers are undergoing heavy losses and

Dhaka University Institutional Repository

the export of this very important commodity of our State is expected to be unjured unless the Government may kindly save it in time.

Sir, it is well understood that the 75% of the total production of cowhides in East Pakistan is of the infurior quality and not fit for the local consumption of our country. The following countries are the main buyers of these hides:

1. Japan. 2. Italy. 3. Greece.

The above countries have had largly imported the infurior grades of Dacca cowhides from East Pakistan since several years, but when the prices of the Dacca cowhides are above the level of the Worlds competition for one reason or the other, the above countries totally neglect the Dacca hides and cover their requirements from the rest of the world, like argentine in America and South Africa. They would never await or sit idle for the prices of Pakistani hides to become competitive.

Under all the above circumstances Sir, the members of this Association most earnestly and respectfully beg to state that the Government may kindly consider on the above subject very seriously and if our following suggestions could be acceptable to the Commerce Ministry:-

1. We suggest that the Government should kindly postpone the enforcement of the above Notification until 1st January 1954 so that the Shippers of cowhides must not undergo heavy losses on their Contracts with the foreign countries which have been made before 1st October.

2. That the Tariff Rates on cowhides should be reconsidered in a meeting to be held in Dacca or Karachi, and this Association be represented. The Tariff Rates should be based according to the current market rates of the said commodity in East Pakistan.

3. The Commerce Ministry of East Bengal Government may please investigate into the matter with the help of this Association and to recommend the Central Government for fixation of The Tariff Rates on Dacca Hides according to the prices prevailing here.

The Members of this Association are anxiously awaiting the final decision of the Government, and a prompt reply will be highly appreciated.

Yours faithfully,

Dhaka University Institutional Repository

For Dacca Hide & Skin Buyers & Shippers Association

Secretary

PRIMEMINISTER	**KARACHI**
CHIEF MINISTER	**EAST BENGAL KARACHI**
COMDIVIS	**KARACHI**
FINPAK	**KARACHI**
PAKREV	**KARACHI**
CHIFIMPEX	**KARACHI**

DACCA HIDE SKIN BUYERS SHIPPERS ASSOCIATION CALLED EMERGENT MEETING TO CONSIDER NEW TARIFF RATE FOR EXPORT DUTY ON COWHIDES VIBE COMMERCE MINISTRY NTOIFICATION 351/403/53 OCTOBER 1ST STOP BY RESOLUTION MARKET/ CLOSED 5TK AHD SHALL

MARK OF PROTEST 'UNTIL FAVOURABLE CABLE I MINISTRY RECEIVED STOP ASSOCIATION VIEWS AND EXTREMELY REGRETS SUDDEN IMPOSITION 03 WITHOUT PRIOR NOTICE AND CONSULTING ' EAST PAKISTAN HIDES EXPORTERS STOP EXPORTERS VTLL SUSTAIN HEAVY AND UNBEARABLE LOSSES IN LARGE CONTRACTS ALREADY MDE WITH FOREIGN BUYERS STOP. MOREOVER LOCAL MARKET RATES CANNOT COMPETE WITH OTHER FOREIGN HIDE MARKETS AND BESIDES THIS HEAVY TARIFF WILL HAMPER EXPORT OF HIDES FROM THIS WING OF PAKISTAN THUS DECREASING FOREIGN EXCHANGE EARNINGS OF PAKISTAN AS MORE THAN 75% OF TOTAL PRODUCTION OF COWHIDES FROM EAST PAKISTAN BEING KXPORTAABLE TO FOREIGN COUNTRIES STOP ASSOCIATION STRONGLY APPEALS GOVERNMENT TO CONSIDER DECREASE AI'JD POSTPONE ENFORCEMENT OF NEW TARIFF RATES TO JANUARY NEXT ENABLING EXPORTERS TO FULFIL PREVIOUS FOREIGN CONTRACTS WITHOUT UNDERGOING HEAVY L03S£S STOF A330CIATION HAS TODAY PASSED RESOLUTION TO REQUEST COMMERCE MINISTRY TO HOLD MEETING IN DACCA OR KARACHI FOR RECONSIDERATION AND THIS ASSOCIATION BE REPRESENTED IN IT STOP EARLY CABLE REPLY FROM COMMERCE MINISTRY SOCLICIATED.

SECRETARY,

DACCA HIDE & SKIN BUYERS & SHIPPERS ASSOCIATION, 92, POSTHA-DACCA.

Dhaka University Institutional Repository

COMDIVIS

KARACHI (W.Pak)

THANKS FOE TOUR TELEGRAM FIFTEENTH OCTOBER STOP EARNESTLY REQUESTING FOR IMMEDIATE DECESSION REGARDING TARIFF VALUES FOR COWHIDES STOP NEW TARIFF RATES BEING EXTREMELY HIGH THAN CURRENT MARKET RATES SHIPPERS WILL SUFFER HEAVY LOSSES WE SUGGEST HOLD MEETING EARLIEST POSSIBLE FOR RECONSIDERATION WITH OUR REPRESENTATION STOP PENDING YOUR FURTHER DECESSION KINDLY INSTRUCT TELEGRAPHI-CALLY COLLECTOR OF CUSTOMS CHITTAGONG FOR ALLOWING ALL COWHIDES SHIPMENTS ON OLD SYSTEM OF CUSTOMS DUTY UNTILL THIRTYFIRST DECEMBER FOR WHICH KINDNESS OUR ASSOCIATION WILL REMAIN GRATEFULL STOP ANXIOUSLY AWAITING REPLY .

SECRETARY DACCA HIDE &, SKIN BUYERS & SHIPPERS ASSOCIAATIOJ 92, POSTHA, -DACCA

Not to be telegraphed: Dated 19th Oct 1953-

Dacca Hide & Skin Buyers & Shippers -Association, 92, Postha -Dacca.

Dhaka University Institutional Repository

DAILY AVERAGE PRICE OF COWHIDES.

Purchased in Dacca **Market**
during the month of
May **1953.**

Date	No of Pieces	Average eight per piece	Average Price per lb. Rs-As-P
2.5.53.	1,817	10.62	-12- 6
4.5.53	2,245	11.38	- 8-10
5.5.53	1,789	11.24	-13-11
6.5.53	4,666	9.06	-12- 3
7.553	529	9.02	-9-6
9.5.53	2,591	10.13	-11-0
10.5.53	2,834	10.86	-10- 9
11.553	2,539	10.47	-12- 2
16.5.53	3,671	9.57	-10-8
19.5.53	3,290	10.63	-10- 0
20.5.53	1,531	10.97	-11-7
23.5.53	2,094	10.85	-11-1
24.5.53	1,237	11.21	-11-5
25.5.53	2,662	10.42	-13-3
26.5.53	1,186	10.13	-11-8
28.5.53	1,842	11.22	-12-8
30.5.53	2,563	10.81	-10-8
31.5.53	2,065	11.33	-9-2
Total	41,151	10.50	-11-4

Dhaka University Institutional Repository

DAILY AVERAGE PRICE OF COWHIDES.

Purchased in Dacca Market during the month of June 1953.

Date	No. of Pieces	Average weight per pc.	Average Price per lb. Rs.As.P
1.6.53	1,389	10.95	-.10.10
3.6.53	3,573	10.05	-.10.11
6.6.53	830	10.27	-.8.1
7.6.53	4,312	10.92	-. 9.11
9.6.53	5,893	9.86	-.11. 3
21.6.53	3,125	12.34	-.15.2
22.6.53	4,940	10.71	-.11. 5
24.6.53	2,645	11.37	-.12. 2
27.6.53	1,636	10.09	-11- 3
28.6.53	3,155	11.12	-.11. 5
29.6.53	2,559	11.01	-.10. 8
30.6. 53	3,079	10.69	-.10.4
Total	37,136	10.75	-.11.8

Dhaka University Institutional Repository

DAILY AVERAGE PRICE OF COWHIDES.

Purchased in Dacca Market
during the month of
July 1953.

Date	No. of Pieces	Average weight per pc.	Average Price per lb. Rs.As.P
1.7.53	4,944	10.41	-12-7
2.7.53	4,329	10.02	-12-3
5.7.53	3,230	10.11	-12-3
7.7.53	3,802	11.65	-10-2
9.7.53	1,363	10.00	-11-4
12.7.53	2,583	11.25	- 9- 2
13.7.53	2,855	10.08	-11-10.
14.7.53	3,442	10.82	- 9-10
15.7.53	2,052	10.26	-10- 3
16.7.53	2.654	10.48	-10- 6
18.7.53	1.597	11 .58	-12-1
19.7.53	1,107	11.59	-12- 7
20.7.53	1,371	11.26	-10-7
22.7.53	1,170	10.47	-10- 1
23.7.53	3, 895	11.84	-9-7
27.7.53	2,749	11.64	-9-2
28.7.53	1,238	11 .19	-7-9
29.7.53	4.326	10.13	-10- 6
30.7.53	1,925	9.69	- 9- 2
Total	50,632	10.31	-10-9

Dhaka University Institutional Repository

DAILY AVERAGE PRICE OF COWHIDES.

Purchased in Dacca **Market**
during the month of
August **1953.**

Date	No. of Pieces	Average weight per pc.	Average Price per lb. Rs.As.P
1.8.53	2,871	10.65	-.10-2
2.8.53	1, 975	9.75	-.10-8
3.8.53	1,606	11.23	-.9-4
4.8.53	1,735	9.14	-. 9-11
5.8.53	2,917	10.87	-.8-9
8.8.53	2,099	12.23	-.8-9
9.8.53	2,716	9.28	-.9-3
11.8.53	4,284	9.871	-.11-4
12.8.53	1,959	10.31	-.10-0
15.8.53	4,104	10.02	-.11-2
17.8.53	4,742	10.58	-.11-0
18.8.53	2, 858	11.14	-.10-5
19.8.53	1,395	10.63	-.10-4
31 .8.53	385	14.71	-.11-0
Total	35,646	10.45	-.10-2

Dhaka University Institutional Repository

DAILY AVERAGE PRICE OF COWHIDES.

Purchased in Dacca Market during the month of September 1953.

Date	No. of Pieces	Average weight per pc.	Average Price per lb. Rs.As.P
1.9.53	3,184	11.21	-11-6
5.9.53	8,714	12.92	-10-6
6.9.53	3,547	12.63	-10-4
7.9.53	8,322	12.23	-11-11
8.9.53	3,596	12.17	-11-4
9.9.53	2,337	11.59	-9-5
10.9.53	7,772	13.95	-9-4
12.9.53	5,999	13.52	-10-8
13.9.53	6,216	11.46	-12-0
14.9.53	3,462	12.15	-11-1
17.9.53	6,446	11.39	-10-11
19.9.53	12,715	11.08	-11-1
21.9.53	8,150	11.34	-11-3
23.9.53	6,117	11.59	-12-0
24.9.53	2,746	11.12	-11-9
26.9.53	3,463	12.07	-10-11
27.9.53	9,360	10.81	-11-3
28.9.53	4,103	12.21	-10-10
29.9.53	6,948	11.31	11-0
30.9.53	3,522	12.35	-9-11
Total	1,16,719	11.82	-10-10

Dhaka University Institutional Repository

DAILY AVERAGE PRICE OF COWHIDES.

Purchased in Dacca **Market**
during the month of
October **1953.**

Date	No. of Pieces	Average weight per pc.	Average Price per lb. Rs.As.P
1.10.53	1,023	12.22	-9-6
3.10.53	995	13.13	-10- 1
4.10 53	7,406	11.31	-10-9
6.10.53	6,210	11.64	-11- 5
13.10.53	5,288	10.39	-10-10
15-10-53	5,588	10.87	-14- 3
17.10.53	8,526	10.95	-11-5
18.10.53	2,897	10.33	-10- 4
19.10.53	4,274	10.39	-11- 4
20.10.53	4,098	10.50	-10- 3
22.10.53	4,833	11.24	-10-11
24.10.53	5,480	9.99	-13- 2
25-10.53	5,303	10.68	.11-11
28.10.53	2,910	9.71	-11-10
27.10.53	5,785	9.64	-12- 1
26.10.53	5,085	10.48	-12- 7
29.10.53	5.710	10.34	-11- 0
31.10.53	5,268	10.08	-11-9
Total	86,679	10.69	-11-7

উৎস : *B Proceedings*, B# 82, File no: ID— 21 of 1953, Branch: Commerce, Department: Commerce, Labour & Industries, Government of East Bangal 1954, pp-1-10 (*NAB*)

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-২ (ক)

To,
The Assistant Secretary,
Government of East Bengal,
Commerce, Labour & Industries Department.
Eden Buildings, Ramna,
Dacca.

Sub:- <u>Working of the Dacca Cotton Mills. Ltd</u>

Dear Sirs,
With reference to your letter No,1032- Ind. dated 1st June 1949, we have the honour to state that Mills was running in loss and is debtor of 8 (Eight) lacs or rupees.
But however, as soon as Government is pleased to sanction necessary permit of Yarn for the Mills. the Managing Agents will re-open the same.
The representative of the Mills will also go to Japan shortly to import new machineries.

Thanking you in anticipations.

Yours faithfully,
On behalf of
The Dacca Cotton Mills. Ltd.

উৎস : *B Proceedings*, B# 81, File no: 1I-18/53, Branch: Commerce Department: Commerce, Labour & Industries, Government of East Bangal-1953, p-11 (*NAB*)

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-২ (খ)

To

The Secretary, Industry and Labour
Through The Deputi Secretary of
Industry and Labour.

জনাব,

আমরা ঢাকা কটন মিলের শ্রমিকেরা আপনাকে জ্ঞাত করিতেছি যে আজ প্রায় ছয় মাস [illegible] বন্ধ থাকার দরুন আমাদের খুবই কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে। এই মিলের উন্নতি যাহাতে শীঘ্র হয় তাহার জন্যই আজ সজোরেই আপনার নিকট প্রার্থনা করি। আমরা আরও উচ্চ গভর্নমেন্টের নিকট এই প্রার্থনা করি যে এই মিল সত্বর চালু দিয়ে আমাদের এই ৫০০ শ্রমিক এবং পরিবারের প্রায় ২০০০ দুই হাজার লোকের জীবন ধারনের উপায় করিয়া বাধিত করিবেন।

আমরা এখন কাপড়ের মিলের শ্রমিকেরা অনুভব করিতেছি যে পূর্ব পাকিস্তানে কাপড়ের অভাব। বহু টাকার কাপড় বিদেশ থেকে আমদানী করিতে হয়। এই মিল থেকে [illegible] অনেক টাকা আমদানী হওয়ার [illegible] করিবে। এই মিলে প্রায় ৩৬০০০০০ লক্ষ গজ কাপড় উৎপাদন হয়।

[illegible] যদি এই মিল চালু করেন তবে এ, বি, সি শিফটে প্রায় ৮০০/৮৫০ শ্রমিক কাজ করিবে এই মিলের তাঁত ও অন্যান্য ম্যাশিনারী অন্যান্য মিল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যদিও ম্যাশিন পুরাতন তবুও [illegible] পার্ট গুলি বদল [illegible] ও কয়েকটি ম্যাশিন জাপান থেকে আমদানি হইলে নূতনের মত প্রোডাকশন হইবে।

অতএব জনাবের নিকট আমাদের এই প্রার্থনা যাহাতে এই মিলের সত্বর শ্রমিকদের সমস্যা সমাধান করিয়া দিতে আজ্ঞা হউক।

নিবেদক গণ
ঢাকা কটন মিলের
শ্রমিক বৃন্দ

উৎস : *B Proceedings*, B# 81, File no: 11-18/53, Branch: Commerce Department: Commerce, Labour & Industries, Government of East Bangal-1953, p-11 (*NAB*)

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৩

(INCORPORATED UNDER THE INDIAN COMPANIES ACT, 1913-36 AS ADAPTED IN PAKISTAN)

COMPANY LIMITED BY SHARES

MEMORANDUM OF ASSOCIATION

OF

DACCA MATCH FACTORY LIMITED

1. The name of the Company is " DACCA MATCH FACTORY."
2. The Registered Office of the Company will be situated in the Province of East Bengal (East Pakistan).
3. The objects for which the Company is established are :-
    1. To carry on the business of Manufacturer of Matches and other allied product.
    2. To buy, sell, distribute, cause to be distributed, deal or otherwise dispose of match, materials of Match and other allied products of Match.
    3. To import from foreign countries or to export to foreign countries, the various ingredients or materials, which are necessary for the production of Match.
    4. To carry on the business as distributors and to buy sail, import, export, manufacture, treat, prepare and deal in merchandise, commodities and articles of all kinds.
    5. To carry on the business of order securing, purchasing and selling and executing of Jute as an Aratdar, Retailer, seller, Stockist, a Bailer of both Katcha and Pucca, as Government Stockist, Selling Agent, Purchasing Agent, Export etc. etc.
    6. To carry on the business of indenting, order securing and executing of Cotton Tarn, Textile Fabrics, *Dyes* Dyes, Dyestuffs, Colours, Paints, Vernishes, Printing Chalks Chemicals, Medicines, Drugs, Toilet goods, Stationery goods, Cosmetics, Silk, Fertilizers, etc. etc

Dhaka University Institutional Repository

7. To carry on the business of General Merchants, Factory dealers, Commission Agents, brokers and underwriters.
8. To establish, own and operate Cotton Mills, Hosiery Mills, Handloom Factories, Oil Mills, Printing Ink Factories, Rice Mills, Sugar Mills, Jute Press, Cotton Pressing and Ginning Factories, Jute and Cotton Baling Factories, Plastic Factories, Fertilizer Factories, Glass Factories, Porcelain Factories, Machine Tool Manufacturing Factories, or any other Manufacturing concerns as the Company may deem fit.
9. To errect, construct, work, Maintain, improve, or alter, assist in the errection, construct, working, maintenance, improvement, or alteration, of any Mills, Factories, Plaint, Machinery, Dorics, Hallways, Sidings, Jetties, Wharves, Bridges, Roads, Ways, Water works, Tanks, Reservoirs, Vessels, Barges, Launches, Lorries, Cars, Wagons, and other works, conveniences, and to contribute to the expenses of constructing, improving, maintaining and working any of the same, and to pull down, rebuild and repair any of the same.
10. To take on Lease, hire, purchase, or acquire by license or otherwise rights over or connected with lands, Mills, Factories, Plants, Buildings, Works, Vessels, Barges, Launches, Lorries, Cars Wagons, Machinery, Apparatus, Stock-in-trade, Patents, Inventions, Trade Marks, Rights, Privileges, and movable or immovable property of all kinds and descriptions, which may be deemed necessary or convenient for any business, which the Company is authorized to carry on.
11. To least, let out on hire, mortgage, pledge, sell or otherwise, dispose of the whole or any part of the undertaking of the Company, or any lands, business, property, right or assets of any kind of the Company or any share of interest therein respectively, in such manner and for such consideration as the Company may think fit, and in particular for shares, debentures or securities of any other corporation having objects altogether or in part similar to those of the Company.

Dhaka University Institutional Repository

12. To pay any premiums or salamis and to pay for any property rights or privilege acquired in connection with the promotion of or of the business of the Company or to acquire any property for the Company or otherwise, either wholly or partially in cash or in shares, bonds, debentures, or other securities of the Company and to issue any such shares either as fully paid up or with such amount credited as paid up thereon as may be agreed upon and to charge any such bonds, debentures, or other securities upon all or any part of the property of the Company.
13. To pay all or any coats, charges and expenses preliminary and incidental to the promotion, formation, establishment and registration of the Company.
14. To purchase or otherwise acquire and undertake all or any part of the business", property and liabilities of any persons or corporation carrying on any business which the Company is authorized to carry on or possessed of property suitable for the purpose of the Company.
15. To promote any other Company for the purpose of acquiring all or any of the property of this Company, or advancing directly or indirectly the objects or interests thereof and to take or otherwise acquire and hold shares in any such Company, and to guarantee the payment of any defentures or other securities issued by any such Company.
16. To take or otherwise acquire and hold share in any other Company having objects altogether or in part similar to those of this Company, or carrying on any business capable of being conducted to as directly or indirectly benefit this Company.
17. To enter into partnership or into any arrangement for sharing profits, union of interest, co-operation, joint adventure, reciprocal concession or otherwise with any person or Company carrying on or engaged in or about to carry on or engage in any business or transactions which the Company is authorized to carry on, or engaged in any business or transactions capable of being conducted so as directly or

Dhaka University Institutional Repository

indirectly to benefit this Company and to take or otherwise acquire and hold shares or stock in any such Company.

18. To enter into any arrangements with any Governments or authorities Supreme, Municipal, Local or otherwise that may seem conducive to the Company's objects or any of them and to obtain from any such Government or Authority, any rights, privileges, and concessions which the Company may think it desirable to obtain and carry out, exercise, and comply with any such arrangement, rights, privileges and concessions.
19. To draw, make, accept, indorse, discount, execute and issue cheques, promisory notes, bills of exchange and other transferable or negotiable instruments.
20. To invest monies of the Company not immediately required upon such securities as may from time to time be determined.
21. To lend money to such persons and on such terms as may deem expedient, and in particular, to customers of and to other persons having dealings with the Company, and gurantee the performance of contracts by members of or persons having dealings with the Company.
22. To appoint Agents and Managers (including Managing Agents) and constitute agencies and branches in Pakistan or in any other country whatsoever.
23. To borrow and secure the payment of money in such manner and on such terms as the Directors may deem expedient, and to mortgage or charge the undertaking and all or any part of the property and rights of the Company present or future including uncalled capital.
24. To remunerate or make donations to any person or persons whether directors, officers or agents of this Company or not, for services rendered in or about the conduct of this Company's business,
25. To establish and support funds, or Institutions calculated to benefit employees of the Company or dependants or connections of such persons, and to grant pensions, gratuities,

Dhaka University Institutional Repository

allowances and to subscribe or guarantee money for charitable objects including the provident fund of the Company's employees.

26. To appear before any court or to appoint legal practitioners for the Company to appear before the Court aid conduct, defend, refer to arbitration for such case.
27. To distribute any of the assets, for the time being of the Company among the members in kind or specific and to stimulate for and obtain for members or any of them, and any property rights, privileges or options.
28. To give any person or Company special rights and privileges in connection with control over this Company and in particular the right to nominate one or more Directors of this Company.
29. To make such charities and endowments in cash or in kind as the Directors may deem fit.
30. To do all or any of the above things in any part of the world as Principals, agents, trustees, contractors or otherwise and either alone or in conjunction or by arrangement with others and the by or through agents, sub-contractors, trustees or otherwise and to de all such things as are incidental or conducive to the attainment of the above objects or any of them.

And it is declared that the word "Company" in this clause except where used in reference to this Company shall be deemed to include any partnership or other body of persons whether incorporated or not incorporated, and whether domiciled in Pakistan or elsewhere and that the object specified in each paragraph of this clause except where otherwise expressed in such paragraph shall be separate and independent objects of the Company and shall not be limit or restricted by reference to the terms of any other paragraph or the name of the Company.

4. The liability of the members is Limited.
5. The capital of the Company is Rs 10,00,000/- divided into 1000 shares of Rs. 100/- each with power to increase and reduce and to consolidate

Dhaka University Institutional Repository

and subdivide the shares in the capital for the time being into several classes and to attach there to any special rights, privileges and conditions as may be determined or in accordance with the regulations of the Company and to vary, modify or appropriate any such rights, privileges or conditions in such manner as may for the time being be provided by the regulations of the company.

We the several persons whose names and addresses are subscribed are desirous of being formed into a company in persuance of this Memorandum of Association and we respectively agree to take the number of shares in the capital of the company set opposite our respective names:-

Names, Addresses & Descriptions of Subscribers	**Number of Share taken by each**	**Names, Addresses Descriptions of witnesses**
1. Mr. A. Sobhan	250 Shares.	
2. Mr. A. Quorban	250 Shares	
3. Mr. M. Hassan	250 Shares	
4. Mr. A. Hassan	250 Shares	
Total	1000 Shares	

Dated, this the 145 day of April 1954.
উৎস : *B Proceedings*, B# 85, File no: 11-2 (XI) of 1953, Branch: Commerce, Department: Commerce, Labour & Industries, Government of East Bangal 1954, pp-1-7 (*NAB*)

End

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

ক. অপ্রকাশিত উৎসমূহ

১. সরকারি নথিপত্র

a. বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস, আগারগাঁও, ঢাকা

Proceedings of the Government of Bengal in the General Department especially the following Branches Commerce, Industry, Finance and Miscellaneous

A proceedings, Branch : Commerce : Department, Commerce, January 1921-1932

A proceedings, Branch : Commerce, Department : Commerce, July 1932-1942

A proceedings, Branch : Industries, Department : Commerce, January 1953-October 1955

A proceedings, Branch : Agricultural, Department : Revenue (1921- 1941)

A proceedings, Financial Department

B proceedings, Branch: Commerce, Department : Commerce, May 1922-1932

B proceedings, Branch : Commerce, Department : Commerce, January 1933-Sep 1956

B Proceedings, Branch : Industry, Department : Commerce, period June 1940-1956

Finance – 1911-1963

খ. প্রকাশিত উৎসসমূহ

১. সরকারি রিপোর্ট ও প্রকাশনা

Agricultural Marketing in India, Report on the Marketing of Skins in India And Burma, Government of India Press, New Delhi, 1943. (*DUL*)

Annual Statement of the Sea Borne Trade of British India with British Empire and Foreign Countries, Manager of publication, Delhi, 1932. (*DUL*)

Annual Report on the Working of Trade Union Act 1926 in East Pakistan, Labour section 11, Department : C.L & I, Govt of East Pakistan, East Pakistan, Govt Press, Dacca, 1963. (*DUL*)

Annual Report on the Administration of the Factories Act on East Bengal for the year 1951, Dept: Commerce, Labour and Industries 1951-1954, East Bengal Govt Press, 1955. (*DUL*)

Annual Report on the Working of the East Pakistan, Trade Unions Act, Health, Labour and Social Deltas Department, Government of East Pakistan, East Pakistan Govt Press, Dacca, 1966. (*DUL*)

Dhaka University Institutional Repository

Annual Report on the Working of the Indian Factories Act in Bengal and Assam for the year 1928, , Bengal Secretariat Book Depot, Government of Bengal, 1929. (*DUL*)

Annual Plan 1968-69, Government of East Pakistan, Public Sector Programme, Govt. of East Pakistan Press, 1969 (*DUL*)

Annual Administration Report of the Department of Industries, Bengal for the year 1944-46, Govt. of Bengal, 1946. (*DUL*)

Annual plan for East Pakistan 1969-76 Planning Department, Government of East Pakistan, East Pakistan Government press, Dacca, 1969. (*DUL*)

Banking Statistics of Pakistan, State Bank of Pakistan, Statistics Department 1948-57. (*DUL*)

Census of India 1921, V. 5, part : 1, Report by W.H Thompson, Bengal Secretariat Book Depo, Calcutta. (*DUL*)

Census of 1931 Vol. : 1&2, Manager publication, Delhi, 1933. (*DUL*)

Census of India 1941, Manager Publication, Delhi, 1942. (*DUL*)

Census of Pakistan 1969, Vol. 2, Manager Publication, Karachi, 1961. (*DUL*)

Census of Pakistan 1951, Vol. : 3, Karachi. (*DUL*)

Census of Manufacturing Industries- 1954, 1955, Manager of Publication, 1960. (*DUL*)

Census of Manufacturing Industries in Bangladesh 1969-70, Bangladesh Govt Press, Dacca, 1978. (*DUL*)

Cottage Industries – 1960, Office of the Censes Commission, Manager publication, Karachi 1963. (*DUL*)

Cotton Textile Industries, Indian Tariff Board, Manager of Publication, Delhi 1934. (*DUL*)

Dacca Muslins and Cotton Silk Manufacturing at Glasgow and paisley 1793, Scottish Record Office, Edinburgh. (*DUL*)

East Pakistan Factories Directorate, East Bengal Industries Statistics, 1954. (*DUL*)

East Pakistan Forges Ahead, Directorate of Public Sector, Dacca, 1961. (*DUL*)

Economic Survey of East Pakistan 1962-63

East Pakistan Govt. Press, Dacca. (*DUL*)

Economic Survey of East Pakistan, 1966-67

East Pakistan Govt. Press Dacca. (*DUL*)

Economic Survey of East Pakistan, 1963-64

East Pakistan Govt. Press, Dacca. (*DUL*)

Economic Survey of East Pakistan, 1965-66 (*DUL*)

East Pakistan Govt. Press, 1967. (*DUL*)

Economic Survey of East Pakistan, 1961-62, Manager Publication, Karachi. (*DUL*)

Dhaka University Institutional Repository

Economic of Pakistan 1950, Ministry of Economic Affairs, Karachi, 1951. (*DUL*)

Five years of Pakistan 1947-1952, Pakistan publication, Karachi, 1952. (*DUL*)

Monthly Survey of Economic Condition in East Bengal, January 1952, Dept : C, I. & I. Eden Building, Dacca. (*DUL*)

Pakistan Trade February- 1961. (*DUL*)

Pakistan Trade October- 1960. (*DUL*)

PakistanTrade 1961- May. (*DUL*)

Pakistan Trade April – 1961. (*DUL*)

Pakistan Trade June- 1961. (*DUL*)

Pakistan Trade March- 1961. (*DUL*)

Pakistan Planning Commission, *The first five year plan Karachi*, 1955-60. (*DUL*)

Pakistan Planning Commission, *The Second Five year plan* 1960-65, Karachi, 1960. (*DUL*)

Pakistan Planning Commission, *The Third Five year plan 1965-70*, Karachi, 1965. (*DUL*)

Pakistan Statistical Year Book, Government of Pakistan, Central Statistical Office, Karachi. (*DUL*)

Pakistan Exports, Karachi Exports Promotion Bureau, 1966-70 Government of Pakistan. (*DUL*)

Progress Report 1964-65, (*DUL*)

Report on the Administration of Bengal (1923-24) Government of Bengal, Bengal Secretariat Book Depot, 1925. (*NAB*)

Report on the Administration of Bengal (1922-23) Government of Bengal, Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1924. (*NAB*)

Report on the Administration of Bengal (1924-1925) Government of Bengal, Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1926. (*NAB*)

Report on the Administration of Bengal, (1928-29), Government of Bengal, Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1930. (*NAB*)

Report on the Administration of Bengal (1934-35), Government of Bengal, Bengal Government of Press, Alipore, 1936. (*NAB*)

Report on the Administration of Bengal, 1935-36, Government of Bengal, Bengal Government of Press, Alipore, 1937. (*NAB*)

Report on the Survey of Cottage Industries in Bengal, Second Edition, Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1929. (*NAB*)

Statistical Abstract for East Pakistan Vol : 4. Government of East Pakistan, Dacca, 1958. (*NAB*) (*DUL*)

Statistical Digest of East Pakistan, 1968, 1969

No : 5. No : 6, East Pakistan, Dacca. *(NAB) (DUL)*

State Bank of Pakistan, Annual Report 1970-71. (*DUL*)

Dhaka University Institutional Repository

State Bank of Pakistan, Printing Press, Karachi, 1971. (*DUL*)

State Bank of Pakistan. Balance Sheets of Joint Stock Companise having participation 1956-62, State Bank of Pakistan, Karachi, 1965. (*DUL*)

State Bank of Pakistan. Report on Currency and Finance. State Bank of Pakistan, Karachi, 1957-66. (*DUL*)

State Bank of Pakistan. Its Growth, Function and Organization. State Bank of Pakistan, 1961. (*DUL*)

State Bank of Pakistan, Marketing and Financing of Cotton in Pakistan, Karachi. (*DUL*)

Trade by Land of British India – February 1922 (*DUL*)

Trade by Land of British India – January 1922 (*DUL*)

Trade by Land of British India – November 1923 (*DUL*)

Trade by Land of British India – October 1923 (*DUL*)

Allen, B. C, *Eastern Bengal District Gazetteers, Dacca* Vol : V, Allahabad. 1912. (*NAB*)

Bolton, J. E., *Report of the Committee of Inquiry on Small Farms*. His Majesty's Stationary Office, London, 1972 (*BER*)

Ghosh, D. N, *Report on the Button Industry in Bengal*, Bulletin no : 93, Bengal Government press, Alipore, 1941. (*DUL*)

Bhattacharjee and A Khaled, *Marketing of Small Industries Prospects in East Pakistan*, Bureau of Economic Research, University of Dhaka, 1969. (*BER*)

Farouk, A and Safiullah M, *Retailing of Consumer Goods in East Pakistan*, Bureau of Economic Research, Dacca University, 1965. (*BER*)

Hunter, W. W, *A Statistical Account of Bengal Dacca*, Vol. V, London, 1875. (*DUL*)

Mitter, S. C., *The Conch Shell Industry in Bengal*, Industries Department, Bulletin No : 24, Calcutta, 1927. (*DUL*)

Rizvi, S. N. H, *East Pakistan District Gazetteers, Dacca*, 1969. (*DUL*)

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ সরকার

S. N. H Rizvi (ed), *Bangladesh District Gazetteers, Dacca*, Dhaka, 1975. (*DUL*)

শেখ মাকসুদ আলী, (সম্পাদক), *বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার*, বৃহত্তর ঢাকা, বাংলাদেশ মুদ্রণালয়, ঢাকা, ১৯৯৩।

২. সংবাদপত্র এবং গেজেট

দৈনিক আজাদ ১৯৫০, ১৯৬৩-১৯৭১ *(বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস)*

দৈনিক পাকিস্তান ১৯৬৪, ১৯৬৬-১৯৭১ *(বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস)*

দৈনিক সংবাদ ১৯৬৯-১৯৭১ *(বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস)*

দৈনিক পূর্বদেশ ১৯৬৯-১৯৭১ *(বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস)*

দৈনিক সংগ্রাম ১৯৭০-১৯৭১ *(বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস)*

দৈনিক ইত্তেফাক ১৯৬৩-১৯৭১ *(বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস)*

ঢাকা প্রকাশ, ঢাকা ১৯২২-১৯৫৯ *(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার)*

Pakistan Times 1969-1971 (*NAB*)

Pakistan Observer 1961-1971 (*NAB*)

The People 1972-1975 (*NAB*)

Dhaka Gazette- 1949 (*NAB*)

Dhaka Gazette- 1960 (*NAB*)

Dhaka Gazette- 1959 (*NAB*)

Pakistan Quarterly 1951-60 (*NAB*)

Pakistan Review 1953-54 (*NAB*)

The Dacca Gazette, August 1956-1967 August (*NAB*)

The Gazette of Pakistan, Dacca, Govt. of Pakistan, 1947 *(DUL)*

Dacca Gazette 1951-52 *(National Archives of Bangladesh)*

বাংলা গ্রন্থ

আউয়াল, ইফতিখার-উল, (সম্পাদিত), *ঐতিহাসিক ঢাকা মহানগরী : বিবর্তন ও সম্ভাবনা*, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা, ২০০৬।

আহমেদ, শরীফ উদ্দিন, *ঢাকার ইতিহাস ও নগরজীবন (১৮৪০-১৯২১)*, একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০৬।

আহমেদ, শরীফ উদ্দিন, *মিটফোর্ট হাসপাতাল ও ঢাকা মেডিকেল স্কুল ইতিহাস ও ঐতিহ্য ১৮৫৮-১৯৪৭*, একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবলিশার্স লাইব্রেরি, ঢাকা, ২০০৭।

আহমেদ, রাজিউদ্দিন, *পুরানো ঢাকার জীবনযাত্রা ও প্রাসঙ্গিক কথা*, ঢাকা, ১৯৮৫।

আহমেদ, তোফায়েল, *ঢাকার বাণিজ্যিক কারুকলা, পিতল : চামড়া : কাতান*, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯১।

Dhaka University Institutional Repository

আহমেদ, তোফায়েল, *আমাদের প্রাচীন শিল্প*, নওরোজ কিতাবিস্তান, বাংলাবাজার, ঢাকা, ১৯৬৪।

আহসান, আলী সৈয়দ, *ষাট বছরের আগের ঢাকা*, ঢাকা, ২০০৩।

আহসান, আলী সৈয়দ, *জিন্দাবাজারের গলি*, ঢাকা, ১৯৮৫।

আহমেদ, ওয়াকিল, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা* ১ম ও ২য় খণ্ড, ঢাকা, ১৯৮৩।

আহমেদ, মনোয়ারা, *ঢাকার পুরোনো কথা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৮।

আহমেদ, আবুজজোহা নুর, *উনিশ শতকের ঢাকার সমাজ জীবন*, ঢাকা, ১৯৭৫।

আহমেদ, মীর্জা খবীর, *শতবর্ষের ঢাকা*, ঢাকা, ১৯৯৫।

আহমেদ, শরীফ উদ্দিন, *ঢাকা কলেজ ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০২।

আর্থার, লয়েড ক্লে, *ঢাকা ক্লের ডায়েরি ১৮৬৬-১৮৬৭*, নগর জাদুঘর, ১৯৯০।

আনিসুজ্জামান (সম্পাদিত), *চোখের দেখা প্রাণের দেখা*, ঢাকা ইউনিভার্সিটি এলামনাই কনভেনশন, ১৯৯৮।

ইসলাম, রফিকুল, *ঢাকার কথা* (১৬১০-১৯৪৭), আহমদ পাবলিশিং হাউস, ২০০১।

ইসলাম, সিরাজুল (সম্পাদক), *বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস* (২য় খণ্ড) বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৭।

ওয়াইজ, জেমস, *পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও পেশার বিবরণ* (১ম ও ৩য় ভাগ) (ফওজুল করিম অনূদিত), আইসিবিএস : ১৯৯৯ ও ২০০২।

করিম, আব্দুল, *ঢাকাই মসলিন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৫।

করিম, আব্দুল, *মুঘল রাজধানী ঢাকা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪।

করিম, সরদার ফজলুর ও সেনগুপ্ত কিরণ শঙ্কর, *চল্লিশ দশকের ঢাকা*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০১।

গুপ্ত, নির্মল, *ঢাকার কথা*, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ লাইব্রেরি, কলকাতা, ১৯৬০

গুপ্ত, যোগেন্দ্রনাথ, *বিক্রমপুরের ইতিহাস*, কলকাতা, ১৯১০।

গেডেডস, প্যাট্রিক, *ঢাকা শহর উন্নয়ন পরিকল্পনা* (আব্দুল মোহাইমান অনূদিত), ঢাকা, ১৯৯০।

গ্রিনো, আর পল, *আধুনিক বাংলা সমৃদ্ধি ও দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ* ১৯৪৩-৪৪, (শুভেন্দু দাশগুপ্ত, সুপ্রিয় গুহ, রীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বরেণ ভট্টাচার্য অনূদিত), কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৯৭।

ঘোষ, বিনয় (সম্পাদিত), *সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র*, তত্ত্ববোধনী পত্রিকার রচনা সংকলন, ১৮৪০-১৯০৫, কলকাতা, ১৯৬৩ ।

ঘোষ, বিনয়, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা* ১৮০০-১৯০০ শেষ পঞ্চম খণ্ড, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, ২০০৭।

টেলর, জেমস, *কোম্পানি আমলে ঢাকা*, (মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৮।

তালুকদার, খগেশকিরণ, *বাংলাদেশের লোকায়েত শিল্পকলা*, ঢাকা, ১৯৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

দাশগুপ্ত, রণেশ, *সেদিন সকালে ঢাকায়*, খান ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৮৭

বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, *বাংলা সাময়িকপত্র*, কলকাতা, ১৯৩৮।

বসু, বুদ্ধদেব, *আমার ছেলেবেলা*, কলকাতা, ১৯৭৩।

বসু, বুদ্ধদেব, *আমার যৌবন*।

বসু, বুদ্ধদেব, *গোলাপ কেন কালো*, কলকাতা, ১৯৬৮।

বসু, হরিদাস, *ঢাকার কথা*, ঢাকা, ১৯২৪।

বৃহত্তর ঢাকা জেলা সমিতি, *বৃহত্তর ঢাকার ঐতিহ্য* (ঢাকা চেম্বার অব কমার্স লাইব্রেরি)।

বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয় কুমার, *বঙ্গলক্ষীর ঝাঁপি*, কলকাতা, ১৯৭৯।

পাল, সমর, *শিল্পের জয়চিহ্ন ঢাকার মসলিন*।

ফারুক, আব্দুল্লাহ, *বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস*, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪।

মামুন, মুনতাসীর, *ঢাকা স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী* ১ম খণ্ড, অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা ২০১০।

মামুন, মুনতাসীর, ঢাকা স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী ২য় খণ্ড, অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা ২০১০।

মামুন, মুনতাসীর, *উনিশ শতকের ঢাকা*, অনন্যা, ২০০১।

মামুন, মুনতাসীর, *সিভিলিয়ানদের চোখে ঢাকা*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৭।

মামুন, মুনতাসীর, *এই ঢাকায়*, ঢাকা, ২০০০।

মামুন, মুনতাসীর, *ঢাকার স্মৃতি*- ১ (সম্পাদনা) ঢাকা, ২০০১।

মামুন, মুনতাসীর, *ঢাকার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উপাদান*, পল্লব, ঢাকা, ১৯৯৮।

মামুন, মুনতাসীর, *হৃদয়নাথের ঢাকার শহর*, ঢাকা ১৯৮৫।

মামুন, মুনতাসীর, *ঢাকা সমগ্র*– ১, অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৭।

মামুন, মুনতাসীর, *ঢাকা সমগ্র*– ২, অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৭।

মামুন, মুনতাসীর, *ঢাকা সমগ্র*– ৩, অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৫।

মামুন, মুনতাসীর, *ঢাকা সমগ্র*– ৪, অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৬।

মামুন, মুনতাসীর, *ঢাকা সমগ্র*- ৫, অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৭।

মুখোপাধ্যায়, সুবোধ কুমার, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস* (১৯ ও ২০ শতক) ১৯০০-১৯৪৭, কলকাতা, ১৯৯১।

মামুন, মুনতাসীর, *চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাঙালী সমাজ*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০২।

মুখোপাধ্যায়, রাস বিহারী, *সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত*, ঢাকা, ১৮৭৫।

রায়, অজিত, *বাংলাদেশের অর্থনীতির অতীত ও বর্তমান*, ঢাকা, ১৯৭১।

রহিম, এম, এ, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, (১ম ও ২য় খণ্ড) ঢাকা, ১৯৮২।

Dhaka University Institutional Repository

রায়, নীহাররঞ্জন, *বাঙালীর ইতিহাস* (আদিপর্ব)।

রায়, যোতিন্দ্রমোহন ও কেদারনাথ মজুমদার, *বৃহত্তর ঢাকা জেলার বিবরণসহ : ঢাকার ইতিহাস* (২য় খণ্ড একত্রে) দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৩।

রহমান, হাকীম হাবিবুর, *ঢাকার পঞ্চাশ বছর আগে* (ঢাকা পাচাস বারাস পাহলে) ডি, এইচ, আর, সি, ১৯৯৫।

রায়, বঙ্গেশ্বর, *ঢাকা আমার ঢাকা*, কলকাতা, কালান্তর, ১৯৯০।

রমণী মোহন, দেবনাথ, *ব্যবসা বাণিজ্যে বাঙালি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৭।

রহমান, শামসুর, *স্মৃতির শহর ঢাকা*, ঢাকা নগর জাদুঘর, ঢাকা, ১৯৯০।

সাইদুর, মোহাম্মদ, *জামদানী*, ঢাকা, ১৯৯৩।

সেন, সত্যেন, *শহরের ইতিকথা*, ঢাকা, ১৯৭৪।

সেন, দীনেশচন্দ্র, *বৃহৎবঙ্গ* (২য় খণ্ড), কলিকাতা (প্রঃ প্রঃ ১৯৩৫) পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯৯।

শাস্ত্রী, শিবনাথ, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, কলকাতা, ১৯০৭।

হোসেন, নাজির, *কিংবদন্তির ঢাকা*, থ্রিস্টার কো-অপারেটিভ মালটিপারপাস সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৯৫।

হক, এম. এ, শিল্পপতি (The Industrialist), Second Edition, 1997.

হায়াৎ, অনুপম, *নওয়াব পরিবারের* ডায়রিতে *ঢাকার সমাজ ও সংস্কৃতি*, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি, চট্টগ্রাম-ঢাকা, ২০০১।

হোসেন, আনোয়ার, *আমার সাত দশক*, একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবলিশার্স লাইব্রেরি, ঢাকা, ২০০৮।

৩. ইংরেজিতে প্রকাশিত গ্রন্থ, পুস্তিকা ও প্রবন্ধ

Ahmed, Sharif Uddin (ed.), *Dacca, Past Present Future*, Asiatic Society of Bangladesh, Second Edition, 2009.

A, Karim, *Dacca, The Mugahal Capital*, Dacca, 1964.

Andrus. J. R and A. F Mohammed, *Trade, Finance and Development in Pakistan*, Standard, 1966.

Awwal, A.Z.M. Iftikher-Ul-, *The Industrial Development of Bengal* 1900-1939 Vikas Publishing House Pvt Ltd., New Delhi, 1982.

Arthur Balfour, *Final Report of the Committee on Industry and Trade*, London, 1929.

Banerjee, Anil, Chandra, *The Eastern Frontier of British India*, Calcutta, 1934.

Bagchi A. K. *Private Investment in India*, 1900-1939, Cambridge University Press, 1972.

Baumer, Rachel Van M. (ed), *Aspects of Bengali History and Society*, Vikas Publishing House Pvt Ltd., New Delhi 1976.

Chatterton, Sir Alfred, *Indian Industries*, Capital, 13 February 1929.

Chandra, Bipan, *The Rise and Growth of Economic Nationalism in India*, New Delhi.

Dhaka University Institutional Repository

Dani, Ahmed Hassan, *Dacca. A Record of Its Changing Fortunes* (Revised ed.), Dacca, 1962.

Das, M. M., *Studies in the Economic and Social Development of Modern India* 1848-56, Calcutta, 1959.

Doyly, Sir Charles, *Antiquities of Dacca* 1824-30, London.

Dutta, R. C, *The Economic History of India in the Victorian Age.*

Dutta, Sasanka Sekhar, *An Introduction to the Principles of Leather Manufacture* (Fourth edition), Indian Leather Technologist Association, 1985.

Gandhi, M, P., *The India cotton Textile Industry-* 1930

Gadgil, D, R., *The Industrial Evolution in Recent Times* 1860-1939.

Guha, A, *Installation of Small Weaving Factories*, The Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1927.

Gupta, G. N., *A Survey of the Industries and Resources of Eastern Bengal and Assam for 1907-08*, Shillong, 1908.

Griffin, K and A, R, Khan (ed.), *Growth and Inequality in Pakistan*, London, 1972.

Haider, A, Dacca, *History and Romance in Place Names*, (Dacca Municipality Record Room), Dacca, 1967.

Hassan, Delwar, *Commercial History of Dhaka*, Dhaka Chamber of Commerce and Industry, October, 2008.

Hornell, James, The Chank Bangle Industry, Its Antiquity and Present Condition, *Memories of Asiatic Society Journal*, (Vol : 3, Calcutta, 1912).

Hunter , W. W., *Statistical Account of Bengal*, Vol : v, Dacca, London, 1875.

Haq, M, *The Strategy of Economic Planning*, Karachi, 1963

Hasan, Sayid Aulad, *Notes on Antiquities of Dacca*, Dacca, 1912.

Kling, Blair. B, *Partner in Empire, Darkanath Tagore and the Age of Enterprise in Eastern India*, Firma KLM Private Ltd., Calcutta, 1981.

Kumar Dharma (ed), *The Cambridge Economic History of India*, Vol : 02, 1757-1970, Cambridge University Press, 1983.

Majumdar, R.C, (ed), *History of Bengal*, Vol : 1, Dacca, 1943.

Mukherjee, Radhakamal, *The Foundation of Indian Economies*, Long man's Green and Co, London, 1916.

Meenai, S. A., *Banks and Banking in Pakistan*, An Appraisal of the Credit and Moneytory Situation in Pakistan, Karachi, 1962.

Rahman, M. A. *Partition, Integration Economic Growth and Inter Regional Trade*, Karachi, 1963.

Dhaka University Institutional Repository

Robinson E. A., G, and M, Kidson (ed.), *Economic Development in South Asia*. London, 1970.

Rau, B. Ramachardran, *Present Day Banking in India*, (3rd ed) University of Calcutta, Calcutta, 1930.

Rungta, Radhe Shyam, *The Rise of Business Corporations in India, 1851-1900*, Cambridge University Press, 1970.

Sharphouse, J. H., *Leather Workers Handbooks*, Leather producers Association for England, Scotland and Wales, 1963.

Sarkar, Jodu nath, *The History of Bengal*, Vol ; 2, Dacca, University of Dacca, 1948.

Sinha, J. C, *Economic Annals of Bengal*, London 1927.

Sinha, N. K, *The Economic History of Bengal*, Vol 1& 2, Calcutta, 1985.

Shamuzzaman, A. F. M. (ed), Bangladesh, Trade and Industry Directory, Dhaka, 1985.

Symes-Scutt, G. P, The History of Bank of Bengal, Calcutta, 1904

Taifoor S. M, *Glimpses of old Dhaka*, A short historical narration of Bengal and Assam with special treatment Dhaka, 2nd ed (Revised) Dacca, 1956.

Tylor, James, *A Sketch of the Topography and Statistics of Dacca*, Calcutta, 1840.

Tylor, James, *A Descriptive and Historical Account of the Cotton Manufactures of Dacca*, London, 1851.

Tripathi, Amles, *Trade and Finance in the Bengal presidency* (1793-1833), Calcutta, 1956.

Tyson, Geoffrey, *Bengal Chamber of Commerce and Industry*, 1853-1953, A Centenary Survey, Calcutta, 1952.

Wise, James, *Notes on the Races, Castes and Tardes of Eastern Bengal*, London, 1883.

Weber, Max, *The protestant Ethics and the Spirit of Capitalism*, New York, 2007.

Weber, Max, *Essays in Sociology, Oxford University Press, New York, 1953*

Woodruff, D, *Handbook on chrome Tanning, Quality Books*, England, 1956.

৪. বিভিন্ন জার্নাল ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত ইংরেজি প্রবন্ধ

Ahmed, Nizam, "Background of Industry and Industrial Buildings in Bangladesh : A Historical Survey", *Journal of Asiatic Society of Bangladesh (Humanities)* Vol : 34, No: 2 (December 1989) pp.193-207.

Dhaka University Institutional Repository

Awwal, Iftikhar-ul, "Activities of the Bengal Home Industries Association 1917-1940", *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh (Humanities)* Vol : 24-26 (1979-1981) pp.179-188

Chowdhury, Hedayet Ullah, "An Analysis of Economic Efficiency of the Informal Sector Small-Scale Manufacturing Industries of Bangladesh", *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh (Humanities)* Vol : 48, No : 2 (December 2003), pp. 111-131.

Hossain, A. T. M. Tofazzel and Prasanta Kumar Banerjee, "Handloom Industry in Bangladesh : A Historical Study", *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh (Humanities)*, Vol : 41, No : 1 (June- 1996), pp. 151-160.

Hussain, Nazma Ara, "Some Thought on Promotion of Entrepreneurship in Small Business in Bangladesh", *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh (Humanities),* Vol : 39, No : 1, (June 1994), pp.135-149.

Murshid Kuli Khan, "The leather Industry in Bangladesh", cutting from the newspaper. *The people* 1973, ফাইল ৩৩৮, ৪৮ বিষয় : চামড়া শিল্প (বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস)।

পাল, লাল হীরা, "চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি করণে অত্যাবশকীয় তথ্য", *বাংলাদেশ ট্যানার্স এসোসিয়েশন* ২০০৯-২০১০।

হাই মো. আব্দুল, "চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের সমীক্ষা", *বাংলাদেশ ট্যানার্স এসোসিয়েশন*, ২০০৯-২০১০।

সরকার শিপ্রা, "ঢাকার শঙ্খ শিল্প : অতীত ও বর্তমান", *এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, ১৫ খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৭, পৃ. ৫২-৭৯।

ফাতেমা, নুসরত, "বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী জামদানি কারুশিল্প" *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, একবিংশ খণ্ড, প্রথমসংখ্যা জুন, ২০০৩, পৃ. ৬৩-৮৬।

৫. অভিসন্দর্ভ

১. কাদের, রোজিনা, 'ঢাকার সাংস্কৃতিক আন্দোলন ১৯৫৮-৭১' এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০।

২. কবির, দিনাক সোহানী, 'পূর্ববাংলার রেলওয়ে আগমন এবং এই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক জীবনের উপর-এর প্রভাব ১৮৬২-১৯৪৭', পি.এইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৫।

৩. ইসা, মোহাম্মদ, 'ঔপনিবেশিক বাজার অর্থনীতি এবং বাংলাদেশে বুর্জোয়া বিকাশের প্রকৃতি', পি.এইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৩।

৪. মামুন, মুনতাসীর উদ্দিন খান, 'পূর্ববঙ্গের সমাজ জীবনের কয়েকটি দিক : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা ১৮৫৭-১৯০৫', পি.এইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮২।

৫. Farouk, Abdullah, 'Marketing of Rice in East Pakistan', M. Phil. Thesis, University of Dhaka, 1953.

Dhaka University Institutional Repository

৬. সাক্ষাৎকার

১. আলহাজ ফয়েজুর রহমান (৬৫), আড়তদার : ফয়েজুর রহমান এন্ড সন্স (বর্তমান leather and source), ৭০/১ ওয়াটার ওয়ার্কস, তারিখ : ২৮.০৬.১১
২. আকবর হোসেন (৫৭) : হাজী আওলাদ হোসেন-এর পুত্র। হাজী আওলাদ স্বাধীনের আগে চামড়ার আড়তদার ছিলেন। তার পুত্র বর্তমান প্যারামাউন্ট ট্যানারির মালিক। Paramount Tannery, হাজারিবাগ, তারিখ : ০৩.০৭.১১
৩. আব্দুল হাই (৭০), সাধারণ সম্পাদক : বাংলাদেশ ট্যানার্স এসোসিয়েশন ১২৪/৩ হাজারিবাগ, ঢাকা, তারিখ : ২০.০৯.১১
৪. হারুন-অর-রশিদ, পিতা : আউয়ুব ব্রাদার্স-এর মালিক ছিলেন। পরবর্তীতে আবু মুসা ও আব্দুল মতিন দিলখুশা ট্যানারি কিনে নেন (স্বাধীনের (১৯৭১) পর,) লেসকো লিমিটেড, ১৪৬, হাজারিবাগ, তারিখ : ০৩.০৭.১১
৫. হামিদ উদ্দিন আহমেদ (৭২), সাবেক ব্যাংকার, হাবিব ব্যাংক লিঃ, তারিখ : ০৫.০৭.১১
৬. অনীল কুমার মুখার্জী (৭৭), সভাপতি, লোকনাথ আশ্রম ও মন্দির, ৮৪/১ স্বামীবাগ রোড দয়াগঞ্জ, ঢাকা, তারিখ : ২৫.০৯.১১
৭. সুশীল চন্দ্র মোহন্ত (৬২), ম্যানেজার, একাউন্ট ও ফিন্যান্স, সাধনা ঔষধালয়, গেন্ডারিয়া, ঢাকা, তারিখ : ২৫.০৯.১১
৮. নূর মোহাম্মদ (৬০), টেকনিশিয়ান, বাংলাদেশ কলেজ অব লেদার টেকনোলজি, হাজারিবাগ, ঢাকা ১২০, তারিখ : ১৭.০৯.১১
৯. আবুল বাশার (৫৫) কর্মচারী, লেসকো লিমিটেড, ১৪৬, হাজারিবাগ, ঢাকা, তারিখ : ০৩.০৭.১১
১০. মাহবুব রায়হান, টেকনোলজিস্ট, লেসকো লিমিটেড, ১৪৬, হাজারিবাগ, ঢাকা, তারিখ : ০৩.০৭.১১
১১. আতাহার আহমেদ তাহের (৭৫), কাপড় ব্যবসায়ী, তাহের এন্ড কোং, দোকান নং- ৩৭১, নিউ মার্কেট, ঢাকা, তারিখ : ১৪.০৫.১১।

— x —

Dhaka University Institutional Repository

পিরনি ট্রি বা ট্যানিং ট্রি, বাংলাদেশ কলেজ অব লেদার টেকনোলজি, হাজারিবাগ, ঢাকা

কলেজ অব লেদার টেকনোলজি, হাজারিবাগ, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

এইচ. বি ট্যানারি বা এইচ এন্ড এইচ লেদার ইন্ডাস্ট্রি লি., ১১৮ হাজারিবাগ, ঢাকা

তাজ ট্যানারি, ১৪৮ হাজারিবাগ, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

তাজ ট্যানারি (ভিতরের অবস্থান), ১৪৮ হাজারিবাগ, ঢাকা

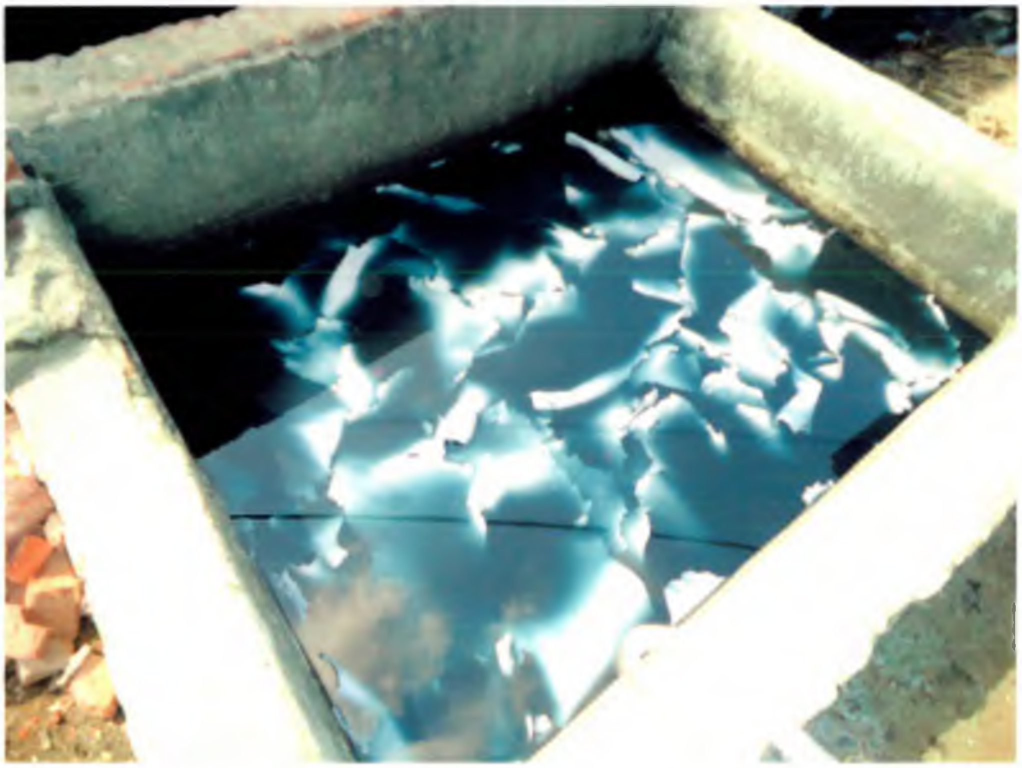

চৌবাচ্চার ভিতর চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ অবস্থায় আছে। তাজ ট্যানারি, ১৪৮ হাজারিবাগ, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

ওয়েট ব্লু চামড়া, তাজ ট্যানারি

মুজিবুর রহমান, তাজ ট্যানারির প্রতিষ্ঠাতা

Dhaka University Institutional Repository

আবু মুসা, আইয়ুব ব্রাদার্স-এর প্রতিষ্ঠাতা

চামড়া থেকে চর্বি ছাড়ানো হচ্ছে, ১৯৪০

Dhaka University Institutional Repository

বিবাণ শিল্প সমিতি, ১৯৩৯

শিংয়ের বোতামে ছিদ্র করণ

Dhaka University Institutional Repository

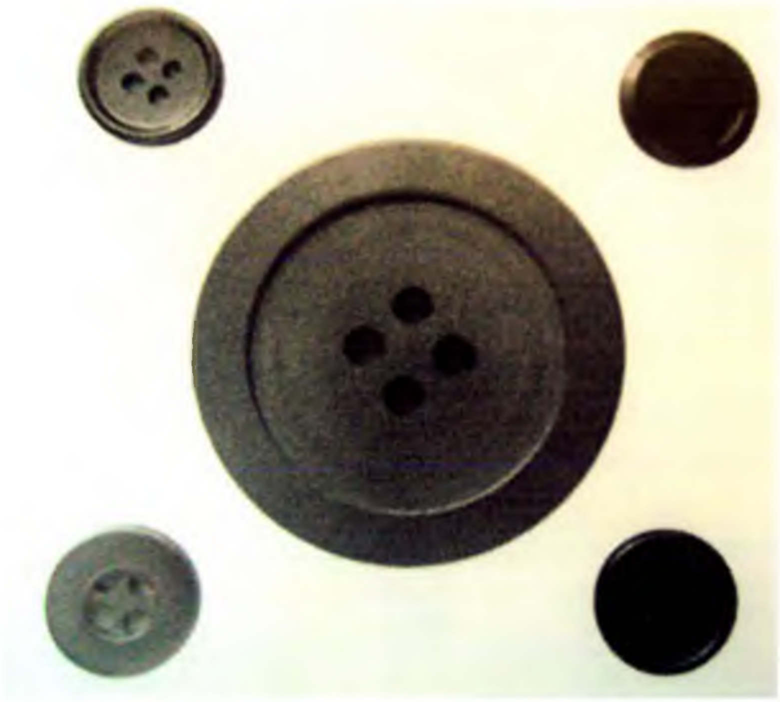

প্লাস্টিকের বোতাম (আধুনিক)

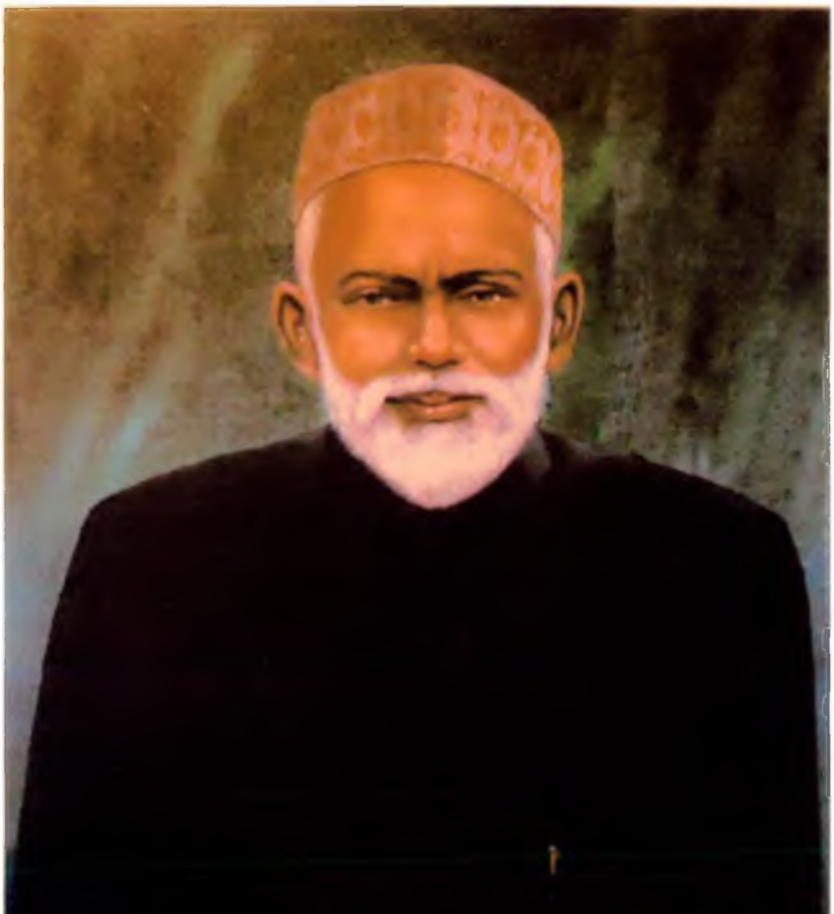

শিংয়ের বোতাম ও চিরুনি ব্যবসায়ী রহিম বখস, ১৯৩৪

Dhaka University Institutional Repository

শাঁখের করাত

কর্তিত শঙ্খ বলয়

Dhaka University Institutional Repository

শঙ্খবলয় মসৃণ করার প্রক্রিয়া 'কোল-ঘষা'

ডা. যোগেশ চন্দ্র ঘোষ (১৮৭৭-১৯৭১), সাধনা ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠাতা

Dhaka University Institutional Repository

স্বর্গীয় মথুরা মোহন মুখোপাধ্যায় (মৃত্যু ১৯৪২), শক্তি ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠাতা

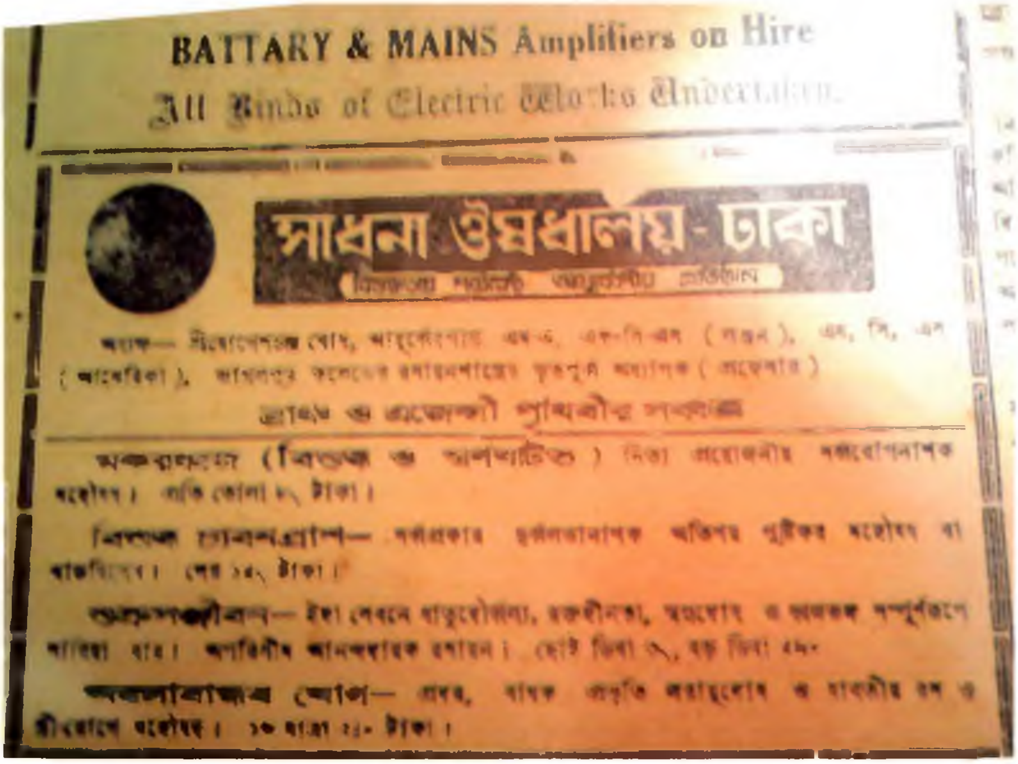
BATTARY & MAINS Amplifiers on Hire

All Kinds of Electric Works Undertaken.

সাধনা ঔষধালয় - ঢাকা

সাধনা ঔষধালয়, ১৯৫২, ঢাকা প্রকাশ

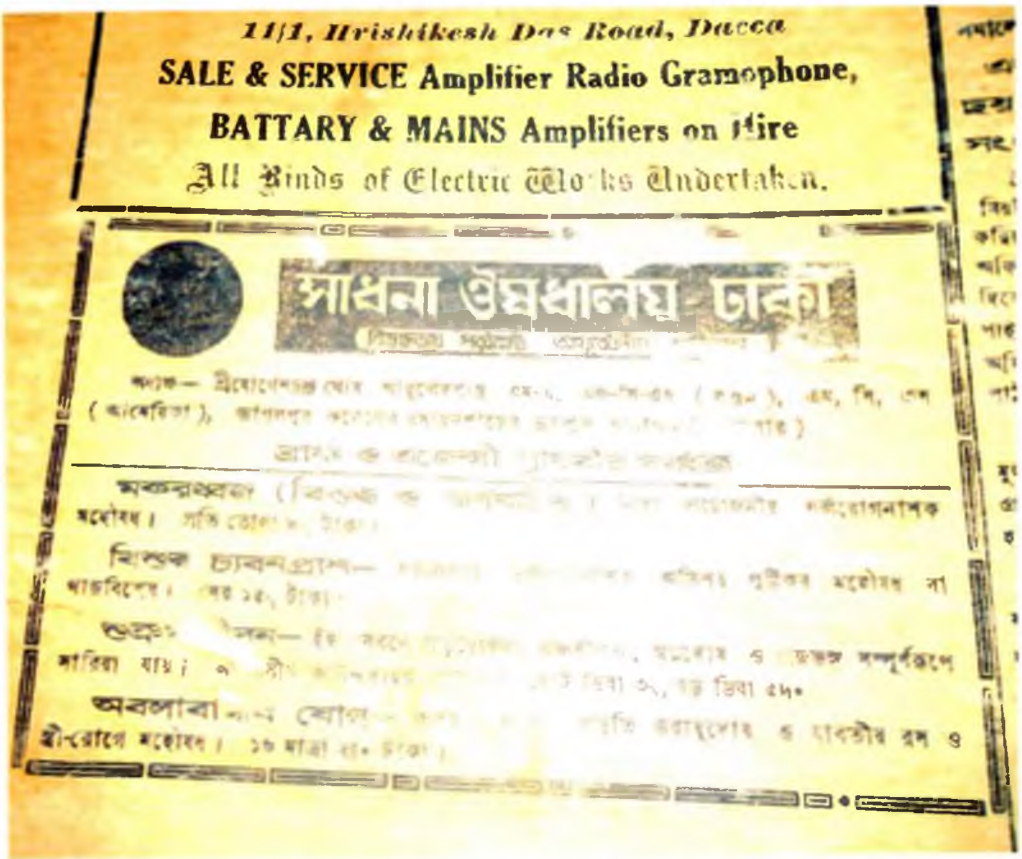

সাধনা ঔষধালয়, ১৯৫৩, ঢাকা প্রকাশ

সাধনা ঔষধালয় (১৯১৪- বর্তমান পর্যন্ত), গেন্ডারিয়া, ঢাকা